শ্রী শ্রী বন্ধু মন্দির

বর্ত্তিকা

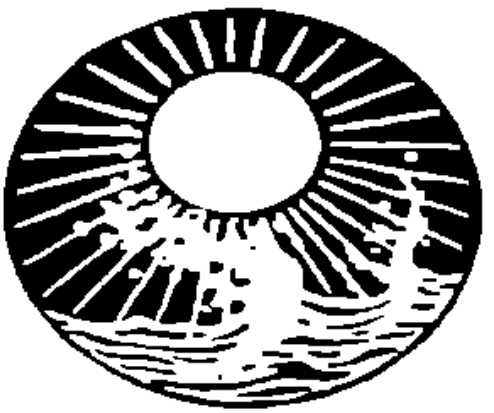

১১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি		১৬
মায়ের বড়দিনের বাণী		২০
মায়ের আলাপ	...	২২
শ্রীমৎ অনির্বাণ ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির	সত্য বসু	৪০
প্রতিদিনের দর্শন	সনীরকান্ত গুপ্ত	৪৮
প্লাবন-পথে নবদ্বীপ	রাণী মুখোপাধ্যায়	৫৪
ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান	অরবিন্দ বসু	৬৬

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

P. 7365

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

১৯৭৯

নববর্ষের বাণী

ভুলে যাও তোমার বাধা-বিঘ্নসব, মনে রাখ শুধু যে তুমি হলে ভগবানের ক্রম-অধিকতর সুষ্ঠু যন্ত্রমাত্র যাকে আশ্রয় করে তিনি তাঁর নিজের কাজ করে চলেছেন আর ভগবানই তোমার সকল বাধা-বিঘ্ন দূর করে দেবেন এবং তোমার রূপান্তর সাধন করবেন।

ভালবাসা আশীর্বাদ—

—শ্রীমা

a declaration

Some people looking at things superficially, might ask how is it that the Ashram exists in this town for so many years and is not liked by the population?

The first and immediate answer is that all those in this population who are of a higher standard in culture, intelligence, good will and education not only have welcomed the Ashram but have expressed their sympathy, admiration and good feeling. Sri Aurobindo Ashram has in Pondicherry many sincere and faithful followers and friends

This said, Our position is clear.

We do not fight against any creed, any religion

We do not fight against any form of government.

We do not fight against any social class.

We do not fight against any nation or civilisation.

We are fighting division, unconsciousness, ignorance, strife and falsehood.

We are endeavouring to establish upon earth union, knowledge, consciousness, Truth, and we fight whatever opposes the advent of this new creation of Light, Peace, Truth and Love

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

সপ্তম পর্ব

সপ্তম সর্গ

ক্ষুদ্র কুটির মাঝে মহারণ্যের হৃদিতলে,
সূর্যালোকে চন্দ্রলোকে অন্ধকারে
প্রতিদিনের মানুষী জীবন চলে ধীরে আপন ধারায়,
চলে যথাপূর্ব ক্ষুদ্র যত একই কর্মাবলী স্রোত
দৈনন্দিনের বাহ্যসূচীর ক্ষীণকায়া আশ্রয়ে
আর তাপসসুলভ শান্তির সুখ-স্নিগ্ধতা।
পার্থিব রূপাবলী তার পুরাতন সৌন্দর্যের সুখহাস্য ফেলে সেথা
আপনি নিজেও সে সকল মানুষের কাছে চিরদিনের মত স্বভাবসুন্দর।
সনাতনী জননী বুকে তুলে নিয়েছে আপন সন্তানে তার
দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরেছে বাহু মেলে চারিদিকে,
যেন চিরদিন পৃথিবী একই রূপে একই ভাবে ধরে রাখতে পারে
আলিঙ্গনে তার জীবন্ত সত্তা আর জীবন্ত দেহকে,
মৃত্যু যেন নাই হেথা কোথাও, নাই শেষ নাই পরিবর্তন।
বাহ্য চিহ্ন সবে অভ্যস্ত সকলে
চোখে কারও পড়ে না নূতন কি রয়েছে অন্তরে তার, বোঝে না আত্মস্থিতি তার ;
চোখে দেখে তারা ব্যক্তি এক, সেখানে রয়েছে শুধু ভগবানের বৃহৎ প্রসার,
স্তব্ধ সত্তা এক অথবা শূন্য মহাশক্তিময়।
সকলের দৃষ্টিতে সাবিত্রী সেই পুরাতন সর্বাঙ্গসুন্দর সাবিত্রী
মহিমা এক মাধুর্য এক জ্যোতি এক
নিঃসৃত হয় তার অন্তর থেকে তার ক্ষুদ্র জগতের পরে।
জীবন তার ধরে দেখায় সর্বত্র সেই একই পরিচিত মুখখানি,
কর্মাবলী তার চলে সেই একই পুরাতন পরিক্রমাপথে,
কথা বলে, চিরদিন যে-কথায় অভ্যস্ত সে
কর্ম করে, চিরদিন সে করে এসেছে যা।
দৃষ্টি তার চেয়ে দেখে পৃথিবীর সেই সনাতন মুখমণ্ডল,
তার মূক অন্তরাত্মার চারিদিকে সব চলেছে পুরাতন ধারায়,
শূন্য চেতনা এক দেখে সাক্ষীরূপে অন্তর হতে,
সর্বরিক্ত সে নির্বিশেষ বস্তুমাত্র সেখানে।
কোন সংকল্প নাই বাক্যের এবং কর্মের পিছনে,

চিন্তা হয় না রচিত মস্তিকে বাক্যের প্রেরণা তরে :
অপৌরুষেয় নিভৃতা চলে যেয়ে বলে কথা অন্তরে তার,
হয়তো-বা অননুভূত, অদৃষ্ট, অজ্ঞাত
কি যেন রক্ষা করে দেহকে তার ভবিষ্য কর্মের তরে
অথবা প্রকৃতি খেলে যায় তার মধ্যে পুরাতন শক্তিস্রোতের ধারায়।
হয়তো সে বহন করে আপন বক্ষতলে করে সচেতন
অপরূপ নাস্তিকে, আমাদের অন্তরাত্মার জন্মস্থান
উৎস এবং সমষ্টি বিশাল বিশ্বের ঘটনাবলীর,
চিন্তার ভাঁটার আর কবর, রিক্ত ভগবান
সত্তাসমষ্টির শূন্য মণ্ডল।
তার বাক্যের পরে ভর করে রয় তা, তার কর্মে করে কর্ম,
তার অন্তরাত্মির সৌন্দর্য তা, প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু ;
আদি রহস্য মানুষী মুখমণ্ডল ধারণ করেছে।
এই তো সে তবে হারিয়ে গিয়েছে অন্তরে পৃথক সত্তায় আপনার
মর্ত্য অহংকার লয় পেয়েছে ভাগবত রজনীর গর্ভে।
রয়েছে শুধু দেহ এক, অহং-এর খোলস
ভেসে চলেছে বিশ্ব-সাগরের ফেনোচ্ছল প্রবাহের কোলে,
স্বপ্নসাগর এক, সাক্ষীরূপে দেখে চলেছে তাকে নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম
অবাস্তব বাস্তবের আকারে।
অপৌরুষের দিব্যদৃষ্টি দেখে চলে সব,—
অন্তশ্চেতনার চিন্তাবর্জিত জ্ঞানে
মনে হয় সিদ্ধি প্রায় এসে গিয়েছে, অনিবার্য হয়েছে,—
ব্যক্তি মৃত্যুমুখে, বিশ্ব লয়মান ;
এসব অস্তি যখন বিশ্বাতীত তখন হয়ে উঠেছে একটা অপরূপ কল্পলোক,
রয়েছে মহাপ্রাণ শুধু পিতা ও পুত্রের বিহনে,
অথবা, নিভৃত প্রতিষ্ঠা এক ছিল যা একদিন,
সত্তা এক সংকল্প আসে নাই যার বিশ্ববহনে
ফিরে গিয়েছে তার আদি নিঃসঙ্গতা মাঝে,
অবিকারী, নিঃসঙ্গ, নীরব, স্পর্শাতীত।
তবুও একান্ত বিলীন হয় নাই সব এই গভীর ক্ষয়ের বশে ;
সত্তা চলে না তবু নাস্তির অভিমুখে।
রয়েছে কোথাও এক সমুচ্চ সর্বাতীত গুপ্ত রহস্য,
আর, যখন একাকী আসীন সে সত্যবান পাশে,
আপন মন তার নিস্পন্দ, সঙ্গে রয়েছে সত্যবানের সন্ধানী ও প্রয়াসী মন,
সেই গভীরতম অন্তরঙ্গ রাত্রির স্তব্ধতার কোলে
সে যেন রয়েছে ফিরে অবগুণ্ঠিত কণ্ঠহীন সত্যের মুখমণ্ডলের দিকে

তার হৃদয়ের নূক কম্পনের গর্ভে অন্তর্হিত
অথবা অপেক্ষায় রয়েছে যে চিন্তার অধিগত শেষ চূড়ার ওপারে,—
আপনি অদৃশ্য থেকে চলে প্রয়াসপর বিশ্বকে
অনুপ্রাণিত করে আমাদের সন্ধান, আপনাকে কিন্তু তবু ধরা দেবে না কখনও,—
সেই সুদূরের বিশাল ব্যোম হতে এল প্রত্যুত্তর এক।
অজ্ঞাত, অনধিগত, দুর্দর্শ
বিদেহী জ্যোতির বাণী প্রেরণ করে এই মর্ত্যভূমে,
তড়িতের স্ফুলিঙ্গ চিন্তা নেমে আসে, আমাদের নয় তারা,
তার মনের নিশ্চল নীরবতা পার হয়ে আসে:
নিরঙ্কুশ অধিকার নিয়ে সেই শক্তি ভর করে তার কণ্ঠে
রূপদান করে এই সব অগ্নিশিখারে,
একটি বাক্যে স্পন্দিত করে তোলে জ্ঞানদীপ্ত হৃৎপিণ্ড
উচ্চারণ করে অমর বাণী সব মর্ত্য জিহ্বার সহায়ে।
শ্রবণে পশে তার আরণ্যক তপস্বীদের কথা,
প্রশ্নোত্তরে উঠে আসে অন্তর হতে তার
মানুষের অসাধ্য সমুচ্চ অদ্ভুত দিব্য বার্তা সব,
কেহ বা কোন কিছু গোপন সুদূর
অধিকার করে আছে তার দেহ আপন প্রচ্ছন্ন ব্যবহার তরে,
কণ্ঠ তার দুয়ার হয়ে উঠেছে অনির্বচনীয় সত্যের তরে,
অচিন্ত্যনীয় অভিজ্ঞা কথায় ফুটে ওঠে।
চমৎকৃত অভিনব আলোক সম্পাতে,
আক্রান্ত অনির্দেশ্যের রেখাপাতে,
তারা বিস্ময়ে চেয়ে দেখে তারে, আছে তার সেই সব জ্ঞান যেন
আভাসে ইঙ্গিতে দূর হতে কখনও-বা তারা সন্ধান পায় যাদের।
এইসব চিন্তা শ্রুতিধর নস্তিক তার রচনা করে না,
শূন্য হৃদয় তার তন্ত্রীশূন্য বীণা যেন;
সংবেদনহারা দেহ তার নাহি মানে আপন বলে আপন কণ্ঠে,
পথ করে দেয় আপনার মাঝে জ্যোতির্ময় মহিমারে
দ্বিধাশক্তি তার সত্তার দুই প্রচ্ছন্ন প্রান্তে
কর্ম করে চলেছে, অনামা অগোচর:
তাদের বাহন হল তার দিব্য শূন্যতা।
নিশ্চেতন প্রকৃতি কাজ করে চলে আপনার রচিত বিশ্বে,
ব্যবহার করে চলে দেহের যন্ত্রাবলী
পার হয়ে যায় গোপনে সচেতন শূন্যতা বর্তমানে স্বরূপ তার
ঊর্ধ্বচেতন মহারহস্য সেই মহাশূন্য ভেদ করে
প্রেরণ করে বাণী তার স্পর্শ করে মানুষী চিন্তাধারা।

তবে এখনও বিরল অপৌরুষেয় এই মহাবাক।
এখন সেই নিশ্চল বিশাল আধ্যাত্মিক আকাশের গর্ভে
মন তার রয়েছে জীবন্ত প্রশান্ত নিরাবরণ,
স্বাগত করে এক পথিকে আগত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারপ্রান্ত হতে :
নেমে এল চিন্তা এক বহিরাগত কণ্ঠ আগ্রহ করে।
আহ্বান করে না সে মনকে সাক্ষীরূপে,
কহে না কোন কথা শুদ্ধ গ্রহিষ্ণু হৃদয়তলে :
নেমে এসেছে ঋজুপথে বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের আসনে,
চেতনার একমাত্র কেন্দ্র বর্তমানে,
কেন্দ্র যদি হতে পারে যেখানে সবই মনে হয় শুধু অবকাশ
দেহ তাকে রুদ্ধ করেনি প্রাচীর আর তোরণ তুলে দিয়ে,
তার সত্তা বৃত্ত এক পরিধিবিহীন
পার হয়ে চলে গিয়েছে সকল বিশ্বসীমানা
ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে অনন্তের মধ্যে।
এই সত্তা তার আপনার সীমানাবিহীন জগৎ,
সে জগতে নাই রূপ নাই উপাঙ্গ নাই উপাধি,
তার নাই ভিত্তি, নাই দেওয়াল, নাই কোন চিন্তার চন্দ্রাতপ,
তবু দেখে সে আপনাকে আপনি, দেখে চেয়ে চারিদিকে
নিশ্চল অসীম নীরবতার মধ্যে।
সেখানে নাই ব্যক্তিবিশেষ, নাই কেন্দ্রীভূত মন,
নাই অনুভবের আসন যার উপর ঘটনাবলী উছলে পড়ে
কিংবা বিষয় সব প্রতিক্রিয়ার বল সক্রিয় করে, রূপায়িত করে।
এই আন্তর বিশ্বে নাই কোন গতিধারা,
সবখানি এক প্রশান্ত সনরূপী আনন্ত্য।
সাবিত্রীর অন্তরে অদৃশ্য অজ্ঞাত তার কালের অপেক্ষায় রয়েছে।

বসে রয়েছে সে, পাশে সুপ্ত সত্যবান
অন্তরে জাগ্রত বিপুল রাত্রি
ঘিরে রয়েছে তারে অজ্ঞেয়ের বৈপুল্য মেলে দিয়ে।
কণ্ঠ এক ওঠে তার আপন হৃদিতল হতে
কিন্তু নহে তার আপনার, তবু পূর্ণ অধিকারী চিন্তার আর ইন্দ্রিয়গ্রামের।
কথা বলে চলে যেমন, সকলই পরিবর্তিত হয়ে যায় অন্তরে বাহিরে তার ;
সবই বর্তমান, সব জীবন্ত ; অনুভবে তার সব এক অভিন্ন ;
অবাস্তবের জগৎ মুছে গিয়েছে :
মনের সৃষ্ট বিশ্ব আর নেই সেথা,
এ কেবল বাধ্য গঠন, স্থূল চিহ্ন ;

চিন্ময় পুরুষ এক, সত্তা এক চেয়ে দেখে সৃষ্ট বস্তু যত
আপনাকে ঠেলে দিয়েছে সংখ্যাতীত রূপের মধ্যে সব
দেখে যা, গড়ে যা তাই সে নিজেই হয়ে উঠেছে ; সব হয়ে উঠেছে
এক বিরাট সত্যের জাগ্রত প্রমাণ,
মহাসত্য সে, নেতির স্থান নাই কোন সেখানে,
সত্তা সে, জীবন্ত চেতনা,
নিরালম্ব নির্বিশেষ সমস্ত।
অ-বস্তুর স্থান নাই সেখানে,
অবাস্তবের অনুভব নিহত সেখানে :
সবই সচেতন, অসীম দিয়ে গড়া,
শাশ্বতের বস্তু সকলেই।
তবু এ হল সেই একই অনির্দেশ্য ; যেন ঘুরে ছুঁড়ে ফেলেছে বিশ্বকে
আপনার ভিতর হতে স্বপ্নের মত
লোপ পেয়ে চলেছে সেই আদিম শূন্যের গর্ভে চিরতরে।
তবু এতো নয় ছায়াময় সর্বব্যাপী বিন্দুমাত্র
অথবা মহাশূন্য এক অবাস্তব রিক্ততার মাঝে।
সেই একই রয়ে গিয়েছে তবু নয় যেন সুদূরের
পুনর্জীবিত তার অন্তরাত্মার জীবন্ত আলিঙ্গনের কাছে।
এ হল আপনি নিজে সে, সকলেরই নিজস্ব আপন,
এই হল সকল অস্তিত্বের বস্তু-সত্য,
এই হল চেতনা সেই সকলের যা-কিছু জীবন্ত
যা-কিছু করে অনুভব, যা-কিছু দেখে ; কালাতীত আর কালগত,
সেই মহানন্দ সমানে নিরাকারের ও আকারের।
সর্বপ্রেমময়, একই প্রেমিকের বাহুযুগল,
দৃষ্টি তার চিন্তা তার একই সর্বচক্ষুষ্মান মানসের,
সত্তার মহানন্দ ভাগবত শিখরশীর্ষে।
চলে গিয়েছে সে কালের সীমা পার হয়ে শাশ্বতের মধ্যে,
আকাশের পরিধি পরিহার করে হয়ে উঠেছে এখন অসীম,
সত্তা তার উত্তীর্ণ হয়েছে অনধিগম্য শিখরে সব
তবু শেষ হয় নাই যাত্রা তার আপনার আত্মার মধ্যে।
ডুবে গেল সে অতল গভীরের কোলে
শেষ নাই সেই নীরব রহস্যের
যেখানে বিধৃত হয়েছে সমস্ত জগৎ একই নিঃসঙ্গ হৃদয়তলে,
আশ্রয় যে আবার বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির।
সমগ্র বৃহৎ সে এখন, অপরিমেয় বিন্দু সে,
তুঙ্গ হতে তুঙ্গতর, গভীর হতে গভীরতর,

জীবন তার শাশ্বতের মধ্যে, সর্বময় সে নিজে
যা-কিছু মৃত্যুকে বরণ করে, যা-কিছু ধারণ করে চক্রায়িত কালক্রম।
সকল বৈপরীত্যই সত্তা এক বৃহৎ অভিন্ন চেতনার মধ্যে
সকল পরিমাপ, পরিবর্তন এবং পরিবেশের বাহিরে।
ব্যষ্টি সে, বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে এক
স্থান তার বিশ্বাতীতের অপরূপ হৃদয়তলে,
সাক্ষীর বিশ্বপুরুষের রহস্যে
স্রষ্টা এবং অধীশ্বর সকলের।
মানস সত্তা হল অনন্তমুখী একদৃষ্টি
আপনার পরে এবং যা-কিছু সে হয়েছে তাদেরও পরে,
জীবনধারা তারই নাট্যলীলা, বৃহৎ ব্যোম রঙ্গমঞ্চ তার,
বিশ্ব তার দেহ, ভগবান তার অন্তঃপুরুষ।
সব নিয়ে এক অভিন্ন বিপুল সমস্ত,
সবই তার সংখ্যাতীত রূপায়ণ।
অন্তশ্চেতনা তার দেখল জগৎকে যেন জীবন্ত ভগবান
দেখল সেই এক অদ্বিতীয়কে, জানল সবই হলেন তিনি।
সাবিত্রী জানে তাঁকে পরাৎপরের আত্মপ্রসাররূপে,
তার আপন আত্মার সঙ্গে এক তিনি, এখানেই যাবতীয় বিশ্বের প্রতিষ্ঠা
তাঁরই মধ্যে বিশ্ব চলেছে সত্যের অন্বেষণে
অজ্ঞানের বাহ্যরূপ লুকায়ে রেখেছে তাকে পশ্চাতে:
সাবিত্রী অনুসরণ করে চলে তাকে অন্তহীন কালের পথ ধরে।
সকল প্রকৃতির ঘটনাবলী তার আপন অন্তরের বস্তু যত,
ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎস্পন্দন তারই আপনার,
যাবতীয় সত্তা চিন্তা করে অনুভব করে চলাফেরা করে তারই মধ্যে;
বিশ্বভূমা মাঝে নিবাস সাবিত্রীর,
সেখানকার দূরত্ব যত তার প্রকৃতির সীমানা সব,
সেখানকার নৈকট্য আপন জীবনের অন্তরঙ্গতা।
সেখানকার মনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয়েছে তার,
তথাকার দেহ হয়েছে তার আপন দেহের বৃহত্তর পরিসীমা
তারই মাঝে জীবন যাপন তার, জানে আপনাকে তার মধ্যে
সেই অদ্বিতীয় রূপে, বহুরূপ তার সেখানকার বহুলতা নিয়ে।
একই সত্তা সে, তবু সব বস্তুই সে;
বিশ্ব হল তার স্বরূপ চেতনার পরিধিপ্রসার,
অপরের চিন্তারাজি তার আপনার অন্তঃসঙ্গী,
তাদের অনুভব তার আপনার বিশ্বহৃদয়ের নিবিড় সামীপ্যে,
তাদের দেহ সব তারই সহজাত দেহ যত;

নিজে আর সে নিজে নয়, হয়েছে সকল বিশ্ব।
অসীমের গর্ভ হতে চলে আসে সকলে তার কাছে,
অসীমের অন্তরে চেতনা তার প্রসারিত,
অসীম এখন তার আপনার নিজের ভবন।
কোথাও বসবাস নাই তার, চেতনা তার সর্বত্র,
সুদূরের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী চলে আবর্তনে চারিদিকে তার ;
পৃথিবী দেখেছে তার জন্ম, যাবতীয় জগৎ হয়েছে তার উপনিবেশ,
প্রাণময় মনোময় বৃহত্তর জগৎ সব তার আপনার ;
বিশ্বপ্রকৃতি তার প্রতি রেখায় তারই প্রতিরূপ অঙ্কিত করে,
প্রকৃতির গতিবিধি তারই আপন গতিবিধির বৃহত্তর প্রতিরূপ।
এই সব সত্তার সেই হল একমাত্র স্বরূপসত্তা,
তাদের অন্তরে রয়েছে সে, তারাও রয়েছে অন্তরে তার।
তখন দেখা দিল প্রথমে বিপুল একাত্মতা এক
নিজের স্বরূপ আত্মা হারিয়ে নিয়েছে সেখানে :
যা দেখায় যেন সে নিজে তা হল সমগ্রের প্রতিচ্ছবি।
সে-ই ছিল তরুলতার ফুলরাজির অবচেতন প্রাণধারা,
সে-ই হল বসন্তের মধুময় কলির স্ফুরণ ;
প্রজ্বলিত সে গোলাপের আবেগ আর উদ্ভাসের অন্তরে,
রক্তিম হৃৎপিণ্ড সে রাগরঞ্জিত কুসুমের
স্বপ্নশুভ্র কমল তার সরোবরকোলে।
অবচেতন প্রাণধারা হতে উঠে দাঁড়িয়েছে মনোময় স্তরে,
হয়েছে চিন্তাধারা হয়েছে বিশ্বহৃদয়ের উদ্বেল আবেগ,
আপনি সে দেবসত্তা মানুষী হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন,
সে-ই হল ভগবৎ অভিমুখে মানুষী আত্মার ঊর্ধ্বায়ন।
ব্রহ্মাণ্ড মুখরিত তারই মধ্যে, তারই আশ্রয়-আধান সে।
মহাকাল সে, কালধারায় ভগবানের স্বপ্ন যত সে ;
মহাকাশ সে আর তারই দিনমানের উদার প্রসার সব।
এখান হতে উঠে গেল সে যেখানে দেশকাল নাই আর
উত্তরচেতনা তার স্বভাবজ অধিষ্ঠান,
অসীম তার গতিবিধির স্বাভাবিক অবকাশ ;
শাশ্বত কালের পরে দৃষ্টিপাত করে তারই অন্তর হতে।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত
সপ্তম পর্ব সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১২শ সূক্ত

১। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্।
অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥১॥

ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র হে অগ্নি
আ-গতম্—এসে উপস্থিত হও
সুতম্—শুদ্ধিকৃত সোমরসের কাছে
গীঃ-ভিঃ—বাক্যের বা মন্ত্রের সহায়ে
নভঃ—স্বর্গ
বরেণ্যম্—বরেণ্য
অস্য—একে
পাতম্—পান কর
ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা
ইষিতা—প্রেরিত হয়ে

হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, বিশুদ্ধ সোমরসের কাছে এস তুমি। আমাদের বাক্যে বরেণ্য হয়েছে যে স্বর্গ পান কর সেখান থেকে বুদ্ধি দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ॥১॥

২। ইন্দ্রাগ্নী অবিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ।
অস্যা পাতমিমং সুতম্ ॥২॥

ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র হে অগ্নি
অবিতুঃ—পূজকদের
সচা—সঙ্গে নিয়ে
যজ্ঞঃ—যজ্ঞ
জিগাতি—চলেছে
চেতনঃ—সচেতন
অস্যা—এর সহায়ে (এই বাক্যের সহায়ে)
পাতম্—পান কর
ইমম্—এই
সুতম্—অর্পিত সোমরস

হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, সচেতন যজ্ঞ-যাত্রা পূজককে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, এই মন্ত্রের সহায়ে পান কর তুমি এই অর্পিত সোমরস ॥২॥

৩। ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে।
তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্ ॥৩॥

ইন্দ্রম্—ইন্দ্রকে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
কবি-চ্ছদা—স্বাচ্ছন্দ্য যাদের দৃষ্টিমানের মধ্যে
যজ্ঞস্য—যজ্ঞের
তা—সেই তোমরা দুজনে
সোমস্য—সোমের
ইহ—এখানে
তৃম্পতাম্—তৃপ্তিলাভ কর
জূত্যা—প্রেরণাবেগে
বৃণে—বরণ করি

ইন্দ্র ও অগ্নির স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টিমানের মধ্যে, যজ্ঞের তীব্র প্রেরণায় তাদের আমি বরণ করি, তোমরা এখানে এসে সোমপানে তৃপ্তিলাভ কর ॥৩॥

৪। তোশা বৃত্রহণা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা।
ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥৪॥

তোশা—হর্তাদের
বৃত্র-হনা—বৃত্রহন্তাদের
হুবে—আমি আহ্বান করি
স জিত্বানা—বিজয়সঙ্গী
অপরাজিতা—অপরাজিত
ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র ও অগ্নি
বাজসাতমা—পূর্ণতার জয়ে পরমশক্তিমান

হর্তাদের, আচ্ছাদকের হন্তাদের আমি আহ্বান করি যারা বিজয়ের সঙ্গী অপরাজিত, সেই ইন্দ্র এবং অগ্নিকে পূর্ণতার জয়ে বলিষ্ঠতম যারা ॥৪॥

৫। প্র বামচন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো অরিত্তারঃ।
ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥৫॥

প্র (+অর্চন্তি)—অর্চনা করে
বাম্—তোমাদের
অর্চন্তি (প্র+)—অর্চনা করে
উক্থিনঃ—বাঙ্ময়েরা, বাক্‌সিদ্ধেরা
নীথ-বিদঃ—পথনির্দেশ-অভিজ্ঞেরা

ভবিতারঃ—পূজকেরা
ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র হে অগ্নি
ইষঃ—প্রেরণাসকল
আ-বৃণে—আমি বরণ করি

পূজকেরা বাক্‌সিদ্ধেরা যারা পথের নির্দেশ জানে তারা তোমাদের অর্চনা করে, হে ইন্দ্র হে অগ্নি, তোমাদের প্রেরণা সব আমি বরণ করি ॥৫॥

৬। ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধুনুতম্।
সাকমেকেন কর্মণা ॥৬॥

ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র আর অগ্নি
নবতিম্—নব্বইটি
পুরঃ—নগর
দাস-পত্নীঃ—দস্যুসরকারীদের দ্বারা অধিকৃত
অধুনুতম্—অধঃপতিত করেছে (ঝাঁকি দিয়ে)
সাকম্—একসঙ্গে
একেন—একমাত্র, একই
কর্মণা—কর্মে

দাসদের অধিকৃত নব্বইটি নগর ইন্দ্র ও অগ্নি ভূপাতিত করেছে একসঙ্গে মিলে একই কর্মে ॥৬॥

৭। ইন্দ্রাগ্নী অপসস্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ।
ঋতস্য পথ্যা অনু ॥৭॥

ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র, হে অগ্নি
অপসঃ—কর্মের
পরি—চারিদিকে
উপ—তোমাদের দিকে
প্র+যন্তি—অগ্রসর হয়ে চলেছে
ধীতয়ঃ—চিন্তারাজি
ঋতস্য—সত্যের
পথ্যাঃ—পন্থা সব
অনু—অনুসরণ করে

হে ইন্দ্র হে অগ্নি, আমাদের চিন্তারাজি আমাদের কর্মের চারিদিক ঘিরে চলেছে তোমাদেরই দিকে অগ্রসর হয়ে সত্যের পথ অনুসরণ করে ॥৭॥

৮। ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রয়াংসি চ।
যুবোরপ্তূর্যং হিতম্ ॥৮॥

ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র হে অগ্নি
তবিষাণি—বীর্যসব
বাম্—তোমাদের
সধস্থানি—একসঙ্গে স্থিত, সহচর
প্রয়াংসি—প্রেয় সব
যুবোঃ—তোমাদের
অপ্-তূর্যম্—কর্মবেগ
হিতম্—প্রতিষ্ঠিত

হে ইন্দ্র হে অগ্নি, তোমাদের বীর্য সব প্রেয় সব আমাদের সহচর, কর্মবেগ যত তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ॥৮॥

৯। ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ।
তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্ ॥৯॥

ইন্দ্রাগ্নী—হে ইন্দ্র হে অগ্নি
রোচনা—জ্যোতির্ময় লোক
দিবঃ—স্বর্গের
পরি (+ভূষথঃ)—চারিদিক ঘিরে রাখ
বাজেষু—যাবতীয় পূর্ণতার মধ্যে
ভূষথঃ (পরি+)—চারিদিক ঘিরে রাখ
তৎ—সেই
বাম্—তোমাদের
প্র+চেতি—প্রকাশিত হয়, জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়,
বীর্যম্—বীর্য

হে ইন্দ্র হে অগ্নি, দ্যুলোকের জ্যোতির্ময় লোক ঘিরে তোমরা রয়েছ পরিপূর্ণতা আশ্রয় করে, তোমাদেরই শক্তি প্রকটিত হয়ে উঠেছে সেখানে ॥৯॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্য সহ

২—অন্তঃপ্রেরণা হল বৃহৎ ও সনাতন জ্ঞান হতে উৎসারিত দীপ্তির এক ক্ষীণধারা। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে বুদ্ধি যতখানি না ছাড়িয়ে যায়, তার চেয়ে সুষ্ঠুতরভাবে বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় অন্তঃপ্রেরণা।

কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যা একই ধরনের: "শ্রীঅরবিন্দ এরকম বলেছেন কেন?"... এটি কিংবা ওটি।

আমি উত্তরে বলতে পারি "তিনি এরকম বলেছেন, কারণ তিনি এরকমই দেখেছেন!" কিন্তু, আরম্ভেই একটা জিনিস বুঝতে হবে; এগুলি হল শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া সংজ্ঞা—এমন সংজ্ঞা যা তিনি প্রায়ই দেন আপাতভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ রূপের আবরণে, যাতে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হই।

অভিধানে যেসব সংজ্ঞা রয়েছে তা হল শব্দগুলির সাধারণ ব্যাখ্যা, সাধারণভাবে যে অর্থ বোঝা যায়, তা তোমায় গভীরভাবে চিন্তা করায় না। শ্রীঅরবিন্দ যা বলেন তা বলা হয় অভ্যস্ত ধারণা ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে যাতে এক গভীরতর সত্যের সংস্পর্শে তোমরা আসতে পার। এইভাবে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন তাহলে বাদ দেওয়া যায়।

যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, যে গভীরতর জ্ঞান যে গভীরতর সত্য শ্রীঅরবিন্দ এই ভাবে প্রকাশ করেছেন তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করা, কারণ কোন শব্দের সংজ্ঞা দেবার প্রচলিত রীতি তা নয়।

আমি তাহলে কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নিলাম, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যেটি সেটি আমায় আগ্রহী করেছে কারণ তা এসেছে এক গভীর চিন্তাশীল মনের কাছ থেকে। প্রশ্নটি হল "জ্ঞান" শব্দটি নিয়ে এবং যে অর্থে শ্রীঅরবিন্দ শব্দটি এই সূত্রটিতে প্রয়োগ করেছেন, আর যেভাব তা করেছেন গত সপ্তাহে পঠিত সূত্রটিতে এই দুয়ের তুলনা ক'রে।

গত সপ্তাহে, শ্রীঅরবিন্দ প্রজ্ঞার বিপরীতে (যদি বলা যায়) যখন দাঁড় করালেন জ্ঞানকে, তখন যে জ্ঞানের কথা বললেন তাহল সাধারণভাবে মানুষী চেতনা যে জ্ঞান ব্যবহারে অভ্যস্ত—যে জ্ঞান সে লাভ করে মনের প্রচেষ্টা ও বিকাশের সহায়ে। কিন্তু, এখানে, বিপরীত পক্ষে, যে জ্ঞানের কথা তিনি বলছেন তা হল জ্ঞানের সারাৎসার, দিব্য অতিমানস জ্ঞান, একাগ্রতার সহায়ে জ্ঞান। তাছাড়া, এইজন্যেই এখানে তিনি সে-জ্ঞানকে অভিহিত করেছেন "বৃহৎ ও সনাতন" বলে; তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মানুষী জ্ঞান বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছ, কেন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে ধারাটি "ক্ষীণ"। এ হল এক চিত্রধর্মী প্রতীকরূপ, দিব্য অতিমানস জ্ঞানের বৈপুল্য—সেই অন্তঃপ্রেরণার উৎস, যা হল অনন্ত—আর মানুষী মনের গোচর ও গ্রহণ সাধ্য জ্ঞানের মধ্যে এক লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। সেই দিব্য জ্ঞানের রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটলেও, যতটুকু গোচর হয় তা স্বল্পতম, ক্ষীণ; তা যেন এক অতি ক্ষীণ ধারা, যা কয়েকটি বিন্দু যা তোমার

মধ্যে ঝরে পড়ে, আর সেই কয়েক ফোঁটা এত শুদ্ধ, এত উজ্জ্বল, এত স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তারা তোমায় দেয় এক অপরূপ অন্তঃপ্রেরণার অনুভব, এই ভাব এনে দেয় যেন তুমি অনন্তের লোক-রাজির সঙ্গে সংযোগ লাভ করেছ আর সাধারণ মানুষী অবস্থার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছ তুমি—অথচ যা গোচর করতে হবে তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

একথাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, চৈত্যসত্তা* বা চৈত্য চেতনা সেই মাধ্যম কিনা যার ভিতর দিয়ে অন্তঃপ্রেরণার সাক্ষাৎ মেলে।

সাধারণত, তাই। ঊর্ধ্বতন লোকরাজির সঙ্গে প্রথম সংযোগ যা ঘটে তা হল চৈত্য-সংযোগ। অন্তরে চৈত্য উন্মুক্তিলাভ করবার আগে অন্তঃপ্রেরণালাভ নিশ্চয়ই দুরূহ। অসাধারণ উপায়ে, অসাধারণ সব অবস্থার মধ্যে তা ঘটতেও পারে, যেমন কৃপার ফলে, কিন্তু সত্যকার সংযোগ সংঘটিত হয় চৈত্যের ভিতর দিয়ে, কারণ চৈত্য চেতনা নিশ্চিতই এমন মাধ্যম যা ভাগবত সত্যের সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধে যুক্ত।

পরে, যখন তুমি মানস চেতনা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছ গিয়ে এক উত্তর চেতনার মধ্যে মনের ঊর্ধ্বে, এমনকি উত্তর-মানসেরও ঊর্ধ্বে, খুলে ধরেছ নিজেকে অধিমানস লোকরাজির কাছে, তারপর অধিমানসের মধ্য দিয়ে অতিমানসের কাছে, তখন তুমি সাক্ষাৎভাবে অন্তঃ-প্রেরণা লাভ করতে পার আর স্বাভাবিকভাবেই, তখন থেকে তা হয়ে ওঠে আরো বেশি ঘন ঘন, বলা যায় আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়ে, হয়ে ওঠে পূর্ণতর। এমন এক মুহূর্ত আসে যখন ইচ্ছামাত্রই অন্তঃপ্রেরণা লাভ করা যায়, তবে স্পষ্টতই তার জন্য প্রয়োজন প্রভূত আন্তর বিকাশ।

অন্তঃপ্রেরণা, যে কথা এইমাত্র বলা হল, আসে মনের অনেক ঊর্ধ্বের লোকরাজি থেকে; বিচারবুদ্ধির মত উচ্চতম যা-কিছু মন সৃষ্টি করতে পারে সেসবকে কি মূল্যের দিক দিয়ে কি গুণের দিক দিয়ে তা ছাড়িয়ে যায়। বিচারবুদ্ধি নিশ্চিতই মানুষী মনের ক্রিয়াকলাপের শীর্ষস্থানে; তা ইন্দ্রিয়গ্রামের সহায়ে অর্জিত জ্ঞানের সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একথা বহুবার বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়রাজি জ্ঞানলাভের একেবারেই ত্রুটি-পূর্ণ উপায়, তারা জিনিসসব স্বরূপত যেমন ঠিক ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম, তাদের সংগৃহীত তথ্যসমূহও অত্যন্ত ভাসাভাসা ধরনের এবং প্রায় সময়েই ভ্রান্তিপূর্ণ। মানুষের বিচারবুদ্ধি, যখন তা হয়ে ওঠে পূর্ণ-বিকশিত, একথা জানে এবং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর আস্থা রাখে না যার বিচারবুদ্ধি এখনো জাগেনি, যদি একথা বলতে পারি, সে-ই কেবল বিশ্বাস করে যে যা-কিছু সে দেখে যা-কিছু শোনে, যা-কিছু স্পর্শ করে, সেসবই একান্ত সত্য। ঊর্ধ্বতন বিচার-বুদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নীত হলেই জানা যায় যে ওইসব ধারণা প্রায় মূলত ভ্রান্ত এবং তার উপর কোনরকমেই নির্ভর করা যায় না। কিন্তু অতিমানস বা ভাগবত লোক হতে লব্ধ জ্ঞান বিচারবুদ্ধি যা-কিছু ধারণা করতে ও বুঝতে পারে সে-সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়, অন্তত ততটা যতটা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যায় বিচারবুদ্ধি।

কতকগুলি প্রশ্ন আবার ব্যবহারিক দিকের উপর অন্তঃপ্রেরণা অর্জনের সামর্থ্য

---

* শ্রীঅরবিন্দের রচনায় "চৈত্যসত্তা" বা "চৈত্য" অন্তঃপুরুষের সমার্থক।

কি রকমে বিকশিত করা যায়? অন্তঃপ্রেরণালাভের শর্তগুলি কি? তা কি নিরন্তর পাওয়া সম্ভব?

আমি আগেই এর উত্তর দিয়েছি। অতিমানস লোকের কাছে নিজেকে খুলে ধরলে, নিরন্তর অন্তঃপ্রেরণা লাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থার মধ্যে স্থিতি ঘটে। তার আগে পর্যন্ত, সব থেকে ভাল উপায় হল মনকে যথাসম্ভব ঊর্ধ্বের দিকে ফিরিয়ে ধরা আর নীরব সতর্ক গ্রহিষ্ণুতার অবস্থায় থাকা। মনের মধ্যে যতই একটা নীরব পূর্ণ শান্তভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়, ততই অন্তঃপ্রেরণা লাভে অধিকতর সমর্থ হওয়া যায়।

একথাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে অন্তঃপ্রেরণা বিভিন্ন ধর্মের হতে পারে কি না। তাদের মূলে, না। তা সর্বদাই এমন কিছু যা বিশুদ্ধ চেতনার লোক থেকে নেমে আসে এবং মানুষী সত্তার সর্বাপেক্ষা গ্রহিষ্ণু অংশে অনুপ্রবিষ্ট হয়—কিন্তু এই অন্তঃপ্রেরণা-রাজি বিভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারে তা হতে পারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের মত অন্তঃপ্রেরণা, তা আবার হতে পারে প্রগতির প্রয়াসে সহায়ক মত অন্তঃপ্রেরণা, এবং তা আবার করণীয় ক্রিয়াবলীর বাস্তব ও বহিরঙ্গ সিদ্ধির সহায়ক সব অন্তঃপ্রেরণাও হতে পারে। কিন্তু, এখানে কথা হচ্ছে অন্তঃপ্রেরণার গুণাগুণের চাইতে বরং তাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় —অন্তঃপ্রেরণা সর্বদাই হল জ্যোতি ও সত্যের এক বিন্দু যা মানুষী চেতনার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে অনুপ্রবেশ করে।

এই বিন্দুটিকে নিয়ে মানুষী চেতনা কি করবে তা নির্ভর করে কি মনোভাব, কি প্রয়োজন, কি উপলব্ধি, কি পরিস্থিতি তার উপর—তা অন্তঃপ্রেরণার আসল প্রকৃতিকে পাল্টায় না কিন্তু তা পরিবর্তন আনে যেভাবে তাকে কাজে লাগান হয় তাতে—তার বাস্তব ব্যবহারে।

কতকগুলি প্রশ্নের বিষয় হল, অন্তঃপ্রেরণা আর বোধির মধ্যে কি পার্থক্য। তারা এক জিনিস নয় তবে আমার মনে হয় আমাদের এই পাঠকালেই আবার সে-প্রসঙ্গে ফিরে আসবার সুযোগ হবে। শ্রীঅরবিন্দ যখন আমাদের বলবেন বোধি বলতে তিনি কি বোঝান, তখন এ নিয়ে আবার বলব।

সাধারণভাবে এবং প্রায় অবিসম্বাদিতভাবে বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দের অন্য সব রচনার মত এই পাঠের বিষয় থেকেও সত্যকার লাভ কিছু করতে চাইলে সব থেকে ভাল পদ্ধতি হল এই : চেতনাকে সংহত করার পর পাঠের বিষয়টির উপর একাগ্র মনোনিবেশ করতে হবে, মনের কিছুটা প্রশান্ত ভাব আনতেই হবে—যদি পূর্ণ নীরবতা লাভ করা যায়, তা হল সর্বোত্তম—আর, এসে পৌঁছতে হবে মানস নিশ্চলতা, বলতে পারি মস্তিষ্কগত নিশ্চলতার অবস্থায় যাতে মনোযোগও হয়ে ওঠে প্রশান্ত ও নিশ্চল, যেন একখানি দর্পণ, পুরোপুরি স্থির শান্ত জলতলের মত। তখন পঠিত বিষয়টি সেই উপরকার স্তর পার হয়ে সত্তার গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানে সব থেকে কম বিকৃতির সঙ্গে গৃহীত হয়, এবং পরে—কখন কখন দীর্ঘকাল পরে—সেই গভীরতা সব হতে তা আবার জেগে ওঠে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় তার পূর্ণ অবধারণ সামর্থ্য নিয়ে—বাইরে থেকে অর্জিত কোন জ্ঞানের মত নয়, নিজের অন্তরে বিদ্যমান আলোর মত।

এইভাবে হলে, বোঝবার সামর্থ্য হয় সর্বাধিক, অন্যদিকে, পড়বার সময় যদি তোমার

মন চঞ্চল থাকে, যা পড়ছে তা যদি সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে তাহলে কথাগুলির মধ্যে বিধৃত রয়েছে যে শক্তি, যে জ্ঞান, যে সত্য তার বেশির ভাগই তুমি হারিয়ে ফেলবে। আর তুমি যদি ওই আন্তর গ্রহণ ও পুনর্জাগরণ পর্বের পরই শুধু তোমার প্রশ্ন সব জিজ্ঞাসা করতে পার তাহলে দেখবে যে জিজ্ঞাসা করবার মত খুব কম জিনিসই আছে, কারণ যা পড়েছ তা তুমি ভাল ভাবেই বুঝে থাকবে।* ১৯-৯-৫৮

---

* অনুবাদক : শঙ্করন

মায়ের বড়দিনের বাণী

১৯৬০ শুভ বড়দিন*

১৯৬১ শুভ বড়দিন
ভগবৎ-প্রসাদের আশীর্বাদ সকলের সঙ্গে রয় যেন।*

১৯৬২ নূতন আলো তোমাদের চিন্তাকে উদ্ভাসিত করে যেন, তোমাদের হৃদয়কে শাসন করে যেন, তোমাদের কর্মকে চালিত করে যেন।*

১৯৬৩ শুভ বড়দিন
এস, নবজ্যোতিকে সাদরে বরণ করি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দিয়ে।*

১৯৬৪ পৃথিবীতে শান্তি যদি চাও, তবে প্রথমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত কর তোমার হৃদয়ে। জগতে ঐক্য যদি চাও তবে প্রথমে এক করে ধর তোমার সত্তার বিভিন্ন অংশ সব।*

১৯৬৫ শুভ বড়দিন সকলের জন্য।*

১৯৬৬ শুভ বড়দিন সকলের জন্য
শান্তির মধ্যে আনন্দের মধ্যে।*

১৯৬৭ বাহ্য অনুষ্ঠানের ধূচ নিয়মাবলীর পিছনে রয়েছে একটা জীবন্ত প্রতীক—সেই বস্তুটিকে স্মরণে রাখতে হবে।
শান্তি, শুভেচ্ছা সকলের জন্য।**

১৯৬৮ নূতন জ্যোতি উদয় হোক তোমাদের চেতনায়।
আশীর্বাদ সকলের জন্য।*

১৯৬৯ নূতন জ্যোতিকে আমাদের প্রণতি। বৃদ্ধি পায় যেন সে সকলের হৃদয়ে।*

১৯৭০ শুভ বড়দিন
১৯৭১ সালের শুভ নববর্ষ।*

১৯৭১ সময় এসেছে, বিশ্বাস রাজত্ব শেষ হোক। একমাত্র সত্যেই পরিত্রাণ।***

১৯৭২ আমরা জগৎকে দেখাতে চাই মানুষ ভগবানের সত্যকার সেবক হয়ে উঠতে পারে। পূর্ণ অকপট হয়ে কে দিব্যকর্মে সঙ্গী হতে চায়?*

অনুবাদ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

---

* মূল ফরাসী
** মূল ইংরেজী
*** মূল ইংরেজী ও ফরাসী

P, 7365

মায়ের আলাপ

(গত নভেম্বর সংখ্যার বুলেটিনে, মায়ের আলাপ, ১৯৫৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। Bulletinএর অনুসরণে, ১৯৫৪ সালের বাকী অধিবেশনগুলি আর প্রকাশ না করে, ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করা হচ্ছে। ১৯৫৪ সালের সবগুলিই বই আকারে শীঘ্রই বেরুবে। —ব.স.)

জানুয়ারী ৫, ১৯৫৫

(গত বছর শ্রীমা Les Bases du Yoga বইটি পড়তে আরম্ভ করেন। এ বছরেও সেটির অনুবৃত্তি চলল। পড়লেন পৃ: ৭৭-৮২। প্রশ্নোত্তর সেইগুলিকে ধরেই।)

প্রশ্ন মা, কিভাবে আমাদের প্রকৃতিকে ভগবানের জ্যোতির এবং শক্তির কাজের সঙ্গে মিলিয়ে ধরা যায়?

শ্রীমা কি ভাবে? চেষ্টা করতে করতে।

কি ধরণের মিল তুমি উপলব্ধি করতে চাইছ প্রথমে তোমাকে সে-সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, আগে বুঝতে হবে কোন্ কোন্ জায়গায় মিল নেই। সেটা অনুভব করা চাই, তারপর বুঝতে পারা চাই তোমার অন্তরের সঙ্গে বাহ্যজীবনের কোন কোন কাজকর্মের বিরোধ বাধছে কেন। সে সম্বন্ধে প্রথমে সচেতন হতে হবে। তারপরে, অর্থাৎ একবার সে সম্বন্ধে সচেতন হতে পারলে তখন চেষ্টা করতে হবে—যাতে তোমার বাহ্য কাজকর্ম এবং বাহ্য গতিবৃত্তিগুলোকে অন্তরের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত করতে পার। কিন্তু সবার আগে গরমিলটা কী, তা বুঝতে হবে। কারণ এমন অনেক লোক আছে যাদের বিশ্বাস, জীবনে তাদের কোনই অসঙ্গতি নেই, সব কিছুই ঠিক ঠিক চলেছে। কেউ যদি তাদের বলে, "না, তোমার বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে তোমার অন্তরের হৃদয়াকাঙ্ক্ষার (aspiration) কোন মিল নেই," তাহলে তারা চটে যাবে, কারণ তারা ওটা বোঝেই না। তাই সবার আগে প্রথম কাজই হল, কোন্ জিনিসটা সুরে মিলছে না সেটা বুঝতে পারা চাই, সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই।

বেশীর ভাগ লোকের মুখে প্রথম কথাই হল, "অন্তরের চেতনা আবার কী? কি সম্বন্ধে বলছ? আমি তার কিছুই জানি না।" সুতরাং বুঝতেই পারছ, অন্তরে কিছু একটা আছে যা তাদের সাধারণ চেতনার চেয়েও অনেক বড়, এটাও যদি তারা না বোঝে তাহলে ত সঙ্গতি স্থাপনের কথাই উঠতে পারে না। তার মানেই হল, গোড়ায় অনেক কিছুই করবার আছে। আগে প্রারম্ভিক চেতনা লাভ করতে হবে, সমসুরে বাঁধা তারপরের কথা।

প্রথমে জানতে হবে মানুষটার সত্তার ভিতরকার লক্ষ্য কি, আস্পৃহা কি, যে শক্তি অবতরণ করছে তাকে গ্রহণ করছে কোন্ বস্তু? সব কিছুকেই সচেতন হয়ে উঠতে হবে। তারপরে ভিতরকার এই চেতনার আলোতে বাহ্যগতিবৃত্তিগুলোকে লক্ষ্য করতে

হবে, দেখতে হবে, কোন্‌গুলো অস্তুরের ছন্দের সঙ্গে ছন্দমিলিয়ে চলছে আর কোন্‌গুলো ছন্দভঙ্গ করছে। তারপর যখন দেখতে পেলে কোন্‌টা ছন্দ বেলাতে চায়না, তখন সেটাকে বদলাবার জন্যে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে এবং তোমার আত্মপ্রত্যয়কে একত্রিত করে, যে দিকটা সব চেয়ে সহজ সেইটিকে ধরে কাজ আরম্ভ করতে হবে। যেটা সবচেয়ে কঠিন সেটাকে ধরে শুরু করবে না, সেটা সবচেয়ে সহজ, যেটাকে সহজেই ভাল করে বুঝতে পার, যেটার অসঙ্গতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, সেটা দিয়ে আরম্ভ করবে। সেটার পরে, একটু একটু করে, যেগুলো বেশী কঠিন এবং বেশী কেন্দ্রগত সেগুলোর দিকে এগুবে...যেমন, তোমার পা-টা মচ্‌কায় কেন?...

(মা নীরব)

প্রশ্ন আচ্ছা মা, গতবারে তুমি বলেছিলে, বিরোধী শক্তিগুলো এ বছর ঘরিয়া হয়ে শেষবারের মতো আঘাত করবে। পৃথিবী যদি বিজয় লাভ করতে না পারে...

শ্রীমা পৃথিবী? আমি পৃথিবীর কথা বলেছিলাম?

প্রশ্ন পৃথিবী, ভারতবর্ষ এবং ব্যক্তিগতভাবে লোকেরা।

শ্রীমা বোধহয় তাই, হতে পারে। ও সব বলার একটা ধরন। যাক্‌, এখন তাহলে, আমরা যদি বিজয় লাভ করতে না পারি...?

প্রশ্ন তার মানে কি রূপান্তরের সম্ভাবনা পিছিয়ে যাবে?

শ্রীমা পিছিয়ে, হয়ত কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে। ঠিক সেটাই ত বিরোধী শক্তিরা ঘটাতে চেষ্টা করছে। আর এ পর্যন্ত তারা সফলকাম হয়েছে—সিদ্ধিকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং সর্বদা কৃতকার্য হয়েছে "ও এখন থাক, পরের বার হবে," আর সেই পরের বার...হয়ত আসে কয়েক শতাব্দী বা কয়েক হাজার বছর পরে, আর সেটাই তারা আবার করতে চাইছে।

হয়ত এ সবই কোথাও আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অসম্ভব নয়, তবে এও আবার সম্ভব যে যা কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাক, সেটা যে ভাবে ঘটবার কথা ঠিক সেইভাবেই যাতে ঘটে, সে জন্যে যেটা অবধারিত সেটাকে আগে থেকে ব্যক্ত না করাই ভাল। এমন অনেক কিছুই আছে। তার কারণ, লোকেদের যেটা করা উচিত এবং ঠিক সে ভাবে তা করা উচিত, তার ফল কি হবে তা যদি তারা আগে থেকে পুরোপুরি জানতে পারে, তাহলে সে কাজ করতে পারার মতন তারা যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনও নয়, বিশুদ্ধও নয়, তার কারণ, যে ফলটা তারা আশা করে, শতকরা নিরেনব্বুই বার সেটা হয় না, আর যদিবা সেটাই হয়, ত তার ধরণটা বদলে যায়, তাতে ভেজাল থেকে যায়, সেটা পাতলা হয়ে পড়ে, অনেক কিছু তফাৎ হয়ে যায় আর এতই বেশী রকমের তফাৎ হয় যে মানুষ তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই, কি ঘটবে তা যদি মানুষ আগে থেকে জানতে পারে তাহলে সে চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, কোন কিছুই আর করবে না। সে বলবে, "বেশত, তাই যদি হবার হয় ত হোক, আমার তাহলে আর কিছুই করবার নেই।" এই কারণেই মানুষ আগে থেকে জানে না। কিন্তু যে মানুষ সর্ব অবস্থাতেই কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারে, সেটা করবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এবং সে কাজের ফল কি হবে তা জেনে, এমন কি সে ফল কখন কখন

যা হওয়া উচিত তার বিপরীতই হবে। তা জেনেও যে সে কাজ করে যেতে পারে, সে-ই যথার্থ পূর্ণজ্ঞান লাভের অধিকারী। কিন্তু আমার ত মনে হয় না, তেমন লোক সংখ্যায় খুব বেশী আছে। সাধারণ জীবনে লোকদের আমি বলতে শুনেছি, কেউ যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে তার লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে বহুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। জীবনে যারাই কোন সিদ্ধিলাভ করেছে, স্বনামধন্য লোকেরা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা সর্বদাই ছিল—তাঁরা যা কিছু করে গেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ, বিশাল, পূর্ণাঙ্গ এবং সমগ্র। তাঁরা যতটা চেয়েছিলেন, যতটা আশা করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের নিচে ছিল তাঁদের সিদ্ধি। এ হল একটা দুর্বলতা, কিন্তু এর কারণ হল, যে কথা আগে বললাম, মানুষটার সামনে যদি একটা বিরাট আদর্শ না থাকে, এবং তাকে কাছে পরিণত করবার বড় রকমের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলে সে তাতে নিজের সমগ্র শক্তি উজাড় করে ঢেলে দেবেনা। আর তার ফলে, এমন কি তার লক্ষ্যের কাছাকাছি কোন সিদ্ধি লাভ করবার জন্যেও যেটা তার করা উচিত তা সে করবে না। কেবল, যেটা এইমাত্র বললাম, যার পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি আছে, অন্তর দিয়ে যে অনুভব করে "এই কাজটাই করতে হবে", এবং সেটা করার ফল বা পরিণাম কি হবে সে সম্বন্ধে এতটুকু ভ্রূক্ষেপও যে করে না, সে-ই যথার্থ কাজ করতে পারে। কিন্তু তা বড় শক্ত ব্যাপার।

প্রশ্ন "কুয়ের নতুন আশাবাদী"—এর মানে কি? (Coué)

শ্রীমা ও, কুয়ের কথা! কুয়ের গল্প তুমি জান না? তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার, মনের বল প্রয়োগ করে তিনি চিকিৎসা করতেন। তাকে বলে অটো-সাজেশন্। (বাংলায় "স্বাভিভাব")। তিনি বলতেন, সেটাই হল কল্পনার যথার্থ ক্রিয়া। অবশ্য তিনি যেটাকে "কল্পনা" বলে ব্যাখ্যা করতেন, আসলে তা ছিল "বিশ্বাস"। তাঁর সব রোগীদের তিনি এইভাবে চিকিৎসা করতেন। বলতেন, "তোমাদের কল্পনার দ্বারা একটা রূপ বা আকার সৃষ্টি করতে হবে, অর্থাৎ মনে মনে কল্পনা করতে হবে যে, তোমাদের অসুখ সেরে গেছে, অন্তত সারতে আরম্ভ করেছে। আর এই বিশ্বাস দিয়ে তৈরী রূপটিকে মনে মনে আওড়াতে হবে এবং খুব ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে, যাতে এল ফল হয়। আর সত্যিই এই ভাবে তিনি অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছিলেন, বহু লোককে সারিয়ে ছিলেন। তবে বিফল যে একেবারে হতেন না, তা নয়। আর বোধহয়, এই ভাবের রোগমুক্তিটা খুব স্থায়ী হোত না। অবশ্য সে কথা আমি জানি না। তবে, সে যাই হোক, এর দ্বারা অনেককে তিনি একটি বিষয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করেছেন, এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য ও অদ্ভুতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি এই যে, মানুষের মন হল একটি রূপ দেবার যন্ত্র, আর যে কেউই এ যন্ত্রটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে, সে খুব ভাল ফল পায়। মঁসিয় কুয়ে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন যে, মানুষ ভুল পথে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে। আমার বিশ্বাস সেটা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ সেটা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মিলে যায়। সর্বদাই মানুষের মনে প্রায় অর্ধেক চিন্তাই নৈরাশ্যময়, এমন কি ধ্বংসবাদী। সর্বক্ষণ তারা ভাবছে তারা কল্পনায় দেখছে, কত কি অমঙ্গল ঘটতে পারে, যে সব কাজ তারা করেছে সেগুলোর কি সাংঘাতিক পরিণামই না হতে পারে, আর প্রচণ্ড কল্পনার বেগে যত রকমের সম্ভাব্য

দুর্ঘটনাকে সে স্তূপাকারে জমা করে তোলে। স্বভাবতই সেগুলোকে যদি অন্যভাবে কাজে লাগাতে জানত, তাহলে ঠিক এগুলোর উল্টো ফল পেত এবং তা খুবই সন্তোষজনক হত।

যদি নিজেকে একটু লক্ষ্য কর, যদি...কি ভাবে বলি...তুমি চিন্তা করার অবস্থায় নিজেকে ধরে ফেল, হঠাৎ আচমকা ধরে ফেল, চিন্তান্বিত অবস্থায় নিজেকে চকিতে লক্ষ্য কর, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, কোন কিছু না ভেবেচিন্তে লক্ষ্য কর, তাহলে দেখতে পাবে দশবারের মধ্যে অন্তত ন-বার তুমি কোন বিরক্তিকর গণ্ডগোলের বিষয় ভাবছ। ক্বচিৎ কদাচিৎ সুন্দর সঙ্গতি-পূর্ণ অবস্থার বিষয় ভেবে থাক, কোন গঠনমূলক অনুকূল, আশায় ভরপুর, উচ্ছল, আনন্দময় অবস্থার কথা চিন্তা কর। তেমনটা খুবই বিরল। পরীক্ষা করে দেখ, স্পষ্ট চোখে পড়বে। যখন খুব চিন্তামগ্ন অবস্থায় রয়েছ, তখন হঠাৎ থেমে দিয়ে, নিজেকে লক্ষ্য কর, ঠিক এই ভাবে কর তোমার চিন্তার সামনে একটা পর্দার আড়াল দিয়ে দাও, আর তুমি যে চিন্তা করছ তা লক্ষ্য কর, খানিকা লক্ষ্য কর, দেখবে ঠিক ওই যেটা বললাম, অন্তত দশবারের মধ্যে ন-বার, হয়ত বা তার চেয়েও বেশী। এমনটা খুবই বিরল, প্রায়ই ঘটেনা বলতে গেলে, যখন দিনের মধ্যে কোন এক সময় হঠাৎ তোমার মনে খুবই উচ্ছল একটা চিন্তার উদয় হল, কি ঘটতে চলেছে সেই সম্বন্ধে, হয়ত বা যে অবস্থায় তুমি রয়েছ সেটার সম্বন্ধে, অথবা যে সব জিনিস তুমি করতে চাও সে সম্বন্ধে, বা তোমার জীবনের গতিপ্রবাহের বা পৃথিবীর নানা ঘটনার সম্বন্ধে বেশ উচ্ছল চিন্তার উদয় হল, এমনটা খুবই বিরল। অবশ্য সেটাও আবার নির্ভর করে তোমার মন তখন কি নিয়ে ব্যস্ত তার উপর। কিন্তু দেখবে, প্রায় সর্বদাই কোন একটা দুর্ঘটনার ছবি তোমার সামনে ভাসছে, হয়ত সেটা খুবই সাংঘাতিক নয়ত ছোট খাটো কিছু একটা।

মনে কর, একটা সামান্য কিছু তোমার যেন ঠিক হতেই লাগছে না। যদি তোমার দেহের কথা ভাব, তাহলে সর্বদাই একটা না একটা কিছু গণ্ডগোল বাধবার উপক্রম হচ্ছে —কারণ সব কিছুই যখন দিব্যি ভালভাবে চলছে তখন ত আর তুমি শরীরের কথা ভাবনা। এটা লক্ষ্য করে দেখবে সর্বদাই তুমি খাটাখাটুনি করে বেড়াও, যা যা করবার সবই কর, দেহের কথা তখন একবারও মনে হয় না। কিন্তু হঠাৎ যদি একবার মনে মনে বল, "তাই ত, যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে, কোথাও যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছে বা ওই ধরণের কিছু একটা, তখনই কেবল তুমি দেহের কথা ভাবতে শুরু কর, আর অমনি যত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা জাগতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন যত রকমের নাকাত্মক ভাবনাকে রূপ দিয়ে গড়তে আরম্ভ করে।

কিন্তু "কুয়ে" দিতেন ঠিক এর উল্টো পরামর্শ...আর সেটাই ছিল তাঁর রোগীদের সারাবার কৌশল। তিনি নিজে ছিলেন ডাক্তার। তাঁর রোগীদের বলতেন, "মনে মনে কেবল বলতে থাক, 'আমি সেরে উঠতে আরম্ভ করেছি, একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠছি, আর তারপরে, বুঝলে কি না, বলবে—আমার গায়ে এখন বেশ জোর পাচ্ছি, আমার শরীর খুব ভাল হয়ে গেছে, এখন আমি এইটা করতে পারি, আমি ওইটা করতে পারি।"...

এক ভদ্রমহিলাকে আমি জানতাম। তাঁর মাথার চুল সব উঠে যাচ্ছিল। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার, একেবারে মুঠোমুঠো করে চুল উঠতে আরম্ভ করল। ডাক্তার তাঁকে এই ভাবে চেষ্টা করে দেখতে পরামর্শ দিলেন। মহিলাটি যখন মাথা আঁচড়াতেন তখন জোর

করে মনে মনে বলতেন, "আমার চুল আর পড়বে না।" প্রথম বার কয়েক তাতে কোন ফল হল না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না, লেগে রইলেন, এবং প্রতিবার চুল আঁচড়াবার আগে মনে মনে জোর দিয়ে বলতেন, "আমি এখন চুল আঁচড়াব, কিন্তু আমার চুল পড়বে না।" এইভাবে বলতে বলতে এক মাসের মধ্যে তাঁর চুল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেও তিনি মনে মনে আবার বলতে থাকলেন, "এবার আমার চুল গজাবে।" আর তার ফল এতই অদ্ভুত হল যে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মহিলাটির মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। আমার এ গল্প তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা, যে এইভাবে তিনি আবৃত্তি করতেন। তার আগে ত তাঁর মাথায় টাক্ পড়বার উপক্রম হয়েছিল। পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রদ। কেবল ওইভাবে মনে মনে রূপ দেবার সময়, যেন মনের আর একটা দিক না বলে বসে, "তা আমি রূপ দিচ্ছি বটে, কিন্তু এর ফল কিছু হবে বলে বোধহয় না," কারণ তা হলে তোমার নিজের কাজকে তুমি নিজেই পণ্ড করবে।

কুয়ে বোধহয় এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন...(মা পবিত্রর দিকে চাইলেন)

পবিত্র : হাঁ, মা, আমি তাঁকে প্যারিসে দেখেছি, ১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে।

শ্রীমা ঠিকই, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বটে, একেবারে গোড়ার দশকে। তুমি তাঁকে জানতে?

পবিত্র আজ্ঞা হাঁ, প্যারিসে।

শ্রীমা তাই বুঝি? তাহলে সে গল্প কিছু বল, আমরা শুনি।

পবিত্র আমি দুএকবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। তিনি রোগীদের যে উপদেশ দিতেন তা হল, বারে বারে আবৃত্তি করা, প্রথমে রোজ সকালে এবং দিনের বেলায় বার কয়েক করে বলা, "আমি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছি, রোজ একটু একটু বেশী করে ভাল হচ্ছি, রোজ আমি সুস্থ হয়ে উঠছি।" সকালে বিকেলে রোজ অনেক বার করে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এটা আবৃত্তি করতে হবে, হাতের দুটি মুঠো এইভাবে শক্ত করে ধরে...

শ্রীমা : ও! তাহলে যে খুব রেগে গেছে, সে হাতের মুঠো শক্ত করে ধরে বলবে, "আমি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠছি, এখন আর আমি চটে উঠছি না।" (সকলের উচ্চহাস্য)

পবিত্র : রোজ আমি ক্রমশ বেশী করে বুদ্ধিমান হয়ে উঠছি।

শ্রীমা সেটা খুব ভাল কথা। ছোট শিশুকে যদি বারে বারে ওটা বলা হয়, যদি তাকে বারে বারে আবৃত্তি করতে শেখানো হয়, "আমি ক্রমশ বেশী করে বুদ্ধিমান হয়ে উঠছি।"

"আমার ক্রমশ বেশী করে বুদ্ধি হচ্ছে। আমি ক্রমশ বেশী করে কথার বাধ্য হচ্ছি।" বাঃ! এটা সত্যিই খুব চমৎকার। (একটি তরুণ শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে) সে দিন তুমি জানতে চাইছিলে না, যে সব বাচ্চারা বাগ মানে না, তাদের নিয়ে কি ভাবে কি করা যায়? বেশ ত, এই ভাবে চেষ্টা করে দেখতে পার..."আমি এখন স্কুলে রোজ ঠিক সময়ে যাচ্ছি, ঠিক ঠিক পড়াশুনো করছি।"

তারপর বলবে, "আমি আর মিথ্যা কথা বলি না। আর কখন মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা উচ্চারণ করি না।"

(পবিত্র) প্রথমে ভবিষ্যৎ কালে, "আর বলব না", তারপর ক্রমশ ভবিষ্যৎ থেকে এগিয়ে আসতে আসতে বর্তমানে পৌঁছে, "বলি না" দিয়ে শেষ করল।

শ্রীমা তাই বুঝি, বর্তমানে পৌঁছে শেষ করল? আর তা করতে কত দিন লেগেছিল?

পবিত্র সেটা নির্ভর করে, কে বলছে তার উপর।

শ্রীমা সেটা নির্ভর করে ক্ষেত্র বিশেষের উপর। "আমি আর মিথ্যা কথা বলব না, এই দল আমার শেষ মিথ্যা বলা।"

(সকলের হাস্যরোল)

বেশ, তাহলে এখানেই শেষ আজকের মতো!

* * *

জানুয়ারী ১২, ১৯৫৫

(আজ Les Bases du Yoga বইটির ৮২-৮৮ পৃ: পড়া হল।)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "তর্কের মনোভাব নিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় এবং সত্তার কোন অংশ যদি বিরোধিতা করে, তার দ্বারা বিশৃঙ্খলা এবং বাধাবিঘ্ন বেড়েই যায়।"

শ্রীমা যেমন ধর, গুরু যখন তোমায় একটা কিছু করতে বললেন, তখন তুমি যদি প্রশ্ন করতে থাক, "কেন এটা করতে হবে? প্রয়োজনটা কি? ঠিক কি করতে হবে আমায় বুঝিয়ে দিন। কেনই বা আমাকে এটা করতে হবে?"—একেই বলে তর্কের ভাবে প্রশ্ন করা।

বিরোধিতা করা বলতে বোঝায়, আদেশ এড়িয়ে যাওয়া, সেটা পালন না করা। তাহলে স্বভাবতই তার দ্বারা বাধাগুলো ঢের বেশী বেড়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ পরে ওটার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে সেই জন্যেই আগেকার কালে কোনরকম তর্ক না করে পূর্ণ সমর্পণ করাই ছিল আদেশ। কোন রকমের তর্ক করা নিষিদ্ধ ছিল। গুরু বলতেন, "এটা কর," তখনই তা করতে হত। যদি বলতেন, "ওটা কোর না", তাহলে সেটা করা নিষিদ্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কারুরই অধিকার ছিল না। কেউ যদি বুঝতে না পারে সেটা তার দুর্ভাগ্য।

এখানে সে রকমটা নয়। তোমার যা প্রাণ চায় জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছে। অবশ্য একথা সত্যি যে অনেক সময় তাতে কোন লাভ হয় না। যদি মনে মনে কেবল জল্পনা করতে থাক, "কেন আমাদের এটা করতে বলা হয়েছে? কেন ওটা করতে বারণ করা হয়েছে?" ইত্যাদি, তার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। ওতে কেবল বাধাগুলো ঢের বেশী বেড়ে যায়, চেতনা নমনীয়তা হারায়, যেন তার উপরে একটা কঠিন আবরণ পড়ে যায় এবং তার ফলে গ্রহণ করবার সামর্থ্য হারিয়ে যায়। এ যেন তুমি একটা জিনিসের উপর ভার্নিস লাগিয়ে দিচ্ছ, যাতে সংযোগ আর না হয়।

প্রশ্ন মন কি আশ্রয় করে?

শ্রীমা তার মানে? মন যখন আশ্রয় করতে চায় তখন করে।

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "মনের ইচ্ছা এবং চৈত্যপুরুষের আশ্রয় যেন হয় তোমার অবলম্বন।"

শ্রীমা ঠিক কথা, কিন্তু মনও আশ্রয় করতে পারে। তবে চৈত্যপুরুষের আশ্রয় তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী, আর মনের নিজের ইচ্ছা থাকা চাই। কেউ যদি মনের ইচ্ছাশক্তি আর চৈত্যপুরুষের আশ্রয়ের কথা বলে, তার মানে এ নয় যে তার মনের আশ্রয় নেই বা চৈত্যপুরুষের ইচ্ছাশক্তি নেই। ওর দ্বারা কেবল বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটি বস্তুর অন্তরে কোন্‌টা সব চেয়ে বেশী দরকারী। কিন্তু তার মানে নয় যে উক্ত বস্তুর মধ্যে ও ছাড়া আর কিছু নেই। অন্য আর সকল গতিবৃত্তিই তার থাকতে পারে।

প্রশ্ন কোন কোন সময় যখন আমি কিছু একটা জানতে চাই, তখন বোধহয় যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা দরজা বন্ধ রয়েছে। পরে সেটা খুলে যায় আর তখন সব কিছুই খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

শ্রীমা হাঁ, সেটা খুবই সত্যি।

প্রশ্ন এ ব্যাপারটা কি?

শ্রীমা অতি সহজ! যখন তোমার দরজা বন্ধ থাকে তখন চৈত্যপুরুষের সঙ্গে তোমার সংযোগ থাকে না। আর দরজা যদি খুলে যায়, তাহলে স্বভাবতই তুমি সমগ্র চৈত্য চেতনার দ্বারা লাভবান হবে এবং যা যা তুমি জানতে চাও তা জানতে পারবে।

প্রশ্ন মা, শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন, "কেউ যখন ভাল মনে বাধার সম্মুখীন হয় এবং তাকে জয় করে তখন দেখে যে, একটা বাধা অন্তর্ধান করেছে।" ভাল মনটা কি?

শ্রীমা বাঃ, ঠিক এই প্রশ্নটারই ত অপেক্ষায় ছিলাম। ভাল মন বলতে যা বোঝায় তা তিনি পরের বাক্যটিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বাসকে ধরে থাকা, খুব শান্ত অবিচলিত থাকা,—বোধ হয় আরও খানিকটা পরে তিনি ওগুলি বলেছেন—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা যাতে আক্রমণটা কেটে যায়, বিশ্বাস না হারানো। —ওখানে লেখা নেই? তা হলে ওটা আর এক জায়গায় হবে। সে যাই হোক, ভাল মন বলতে বোঝায়, সাহস না হারানো, বিশ্বাস না হারানো, ধৈর্য না হারানো, মনমরা না হওয়া, খুব ধীর স্থির শান্ত থাকা, যথাসাধ্য আশ্রয়পরায়ণ হওয়া, আর কি ঘটছে না-ঘটছে তা নিয়ে মাথা না ঘামানো। নিঃসন্দেহ হবে যে বিপদ কেটে যাবে এবং সব কিছু ভাল হবে। এই হল সব চেয়ে ভাল উপায়।

প্রশ্ন: মনমরা না হওয়া মানে কি?

শ্রীমা: মনমরা বা বিষণ্ণ না হওয়াটা সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ ও হল একেবারেই দুর্বলতার লক্ষণ, কোথাও একটা কুমনোভাব রয়েছে—এই অর্থে যে, মানুষটা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করছে। এ হল এমন এক রকমের দুর্বলতা, যাতে মানুষটার দুর্বল হওয়াতেই সন্তোষ।

সব কিছুই তার অগোছাল, ছন্নছাড়া। স্পষ্টই এ হল একটা দুষ্টমনোভাব, কারণ তোমার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যে সেই সময় তোমাকে বলে, "মনমরা ভাব মোটেই ভাল নয়।" তুমি বেশ জান যে ওই রকম গোমড়া মুখ করে থাকা মোটেই উচিত নয়। কিন্তু যে অংশটায় ওই রকম ভাব, প্রায়ই সে বলবে, "জ্বালাতন কোরনা, আমার খুশি আমি মনমরা হব।" লক্ষ্য করতে চেষ্টা কর, ঠিক দেখতে পাবে, ব্যাপারটা সর্বদাই ওই রকম। —কী? তাই নয়? এর পরে সে বলে, "বেশ, বেশ, পরে দেখা যাবে...এখন আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তাছাড়া আমারও বলবার কথা আছে!" এই ত ব্যাপার। এ হল এক রকমের বিদ্রোহ, দুর্বলের বিদ্রোহ, মানুষটার সত্তার মধ্যে একটা দুর্বল কিছুর বিদ্রোহ।

প্রশ্ন : মা, এইখানটাতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "...এই যে অবসাদ, বিষণ্ণভাব, এটা হল একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির বা পরিবর্তনের পর্যায়...।" সেটা কি রকম?

শ্রীমা ঃ হাঁ, কারুর যখন অবসাদের ভাব আর কুমনোভাবটা কেটে যায়, তখন স্পষ্টই সে দেখতে পায় যে কিছু একটা তার উপর ভর করে ছিল, এবং তার দিক থেকে কিছুটা উন্নতি লাভের দরকার ছিল এবং সকল কিছু সত্ত্বেও, তার ভিতরের কিছু একটা উন্নতি লাভ করেছে, সে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়েছে। সাধারণত খুব কম লোকেই সচেতন যে, তার কোন একটা অংশের উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার দরকার, সে জন্যে তার নিজের কোন মাথা-ব্যথা নেই, তাই সে তখন এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। যেমন একটা ছোট বাচ্চা মুখ গোমড়া করে থাকে, তার বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত মনমরা ভাব, কি যে তার হয়েছে বোঝা দায়, সবাই হাল ছেড়ে দেয়, কেউ তাকে সাহায্য করে না। তাছাড়া সে নিজেও সহযোগিতা করতে চায় না, আর যে কথা এই মাত্র বললাম, গোঁয়ারের মতো ওই মনমরা ভাবটাকেই মজা করে ধরে বসে থাকে, লোককে দেখাতে চায়, সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। বিশেষ করে সবাইকে দেখাতে চায় যে, সে খুশি নয় বলেই মনমরা ভাব করে। সেটা প্রকৃতির কাছে দেখাতে পারা যায়, আবার ভগবানকে দেখাতে পারা যায়, অবশ্য তা ক্ষেত্র বিশেষের উপর নির্ভর করে, আশপাশের লোকেদের দেখাতে পারা যায়, কিন্তু সর্বদাই ও হল নিজের অসন্তোষ প্রকাশের এক রকমের কায়দা। তুমি আমার কাছে যেটা চাইছ, তার জন্যে আমি সন্তুষ্ট নই", কিন্তু ওটার আসল মানে হল, "আমি সন্তুষ্ট নই এবং আমি তোমাকে দেখতে বাধ্য করে ছাড়বো যে আমি সন্তুষ্ট নই।" ব্যাপারটা এই।

কিন্তু যখন ঝড়টা কেটে যায় এবং যে কারণেই হোক, এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্যে মানুষটা যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, এবং সত্যিই সেটা কাটিয়ে উঠেছে, সাধারণত সে তখন লক্ষ্য করে যে তার সত্তার ভিতরে কিছু একটা বদলেছে, কারণ তোমার সব কিছু বিদ্রোহী মনোভাব সত্ত্বেও, প্রায়ই খানিকটা উন্নতি লাভ হয়ে থাকে—যদিও সেটা খুব তাড়াতাড়ি হয় না, বা খুব চমকপ্রদ ভাবে হয় না, অথবা তোমার সুমহান বিজয় লাভের জন্যে অবশ্যই হয় না, কিন্তু তা হলেও, খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিছু একটা বদলেছে।

যাক, আর কিছু জিজ্ঞাসা?

প্রশ্ন মা, এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "ব্যক্তিগত অহংয়ের আকারের" কথা। ব্যক্তিগত অহং মানে কি?

শ্রীমা অহং ব্যক্তিগত আছে, আবার সমষ্টিগত আছে। যেমন, দেশগত অহং হল সমষ্টির অহং। একটা দলের সমষ্টিগত অহং থাকতে পারে। মানবজাতির অহং সমষ্টিগত অহং। সেটা বড় রকমের হতে পারে আবার ছোট রকমেরও হতে পারে। ব্যক্তিগত অহং বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট একটি ব্যক্তির অহং। ও হল সব চেয়ে ছোট রকমের অহং। এ ছাড়া আবার প্রাণের অহংও আছে, মনের অহংও আছে এবং দেহের অহংও আছে। কিন্তু সেগুলো ব্যক্তিগত "নাবালক" অহং। কিন্তু তা হলেও তা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অহং।

মানুষের মধ্যে অনেক রকমের অহং আছে। সে যখন সেগুলোকে উচ্ছেদ করতে আরম্ভ করে তখনই তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়। যে অহংটা মানুষকে সব চেয়ে বেশী জ্বালাতন করেছে, সেটাকে যখন সে বিলুপ্ত করে, তখন সাধারণত তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় হয়। পরে যখন সেই ঝড়টা কেটে যায়, তখন সে খুব স্বস্তি বোধ করে, সে বলে, "আঃ! বাঁচা গেল, এতদিনে ওটাকে শেষ করা গেল। সব চুকে গেল। ভিতরকার শত্রুটাকে এবার নির্মূল করেছি, এখন সব শেষ।" কিন্তু কিছুকাল পরেই লক্ষ্য করে, আরও একটা রয়ে গেছে, তারপর আর একটা, তারপরেও আবার একটা। বাস্তবিকই মানুষ হল যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংএর একটি স্তূপ। সেগুলো ভীষণ জ্বালাতন করে। একে একে তাদের সবগুলোকে জয় করতে হবে।

প্রশ্ন অহং মানে কি?

শ্রীমা আবার ও মনে হয়, এই অহংই যত রকমে সম্ভব প্রত্যেক মানুষকে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি করে তোলে। একজন যে আর একজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি মানুষ, এই অহংই সেই বোধ দেয়। নিঃসন্দেহে অহংই তোমার মধ্যে এই ধারণা করায়, "আমি" "আমি রয়েছি," "আমি চাই" "আমি করি", "আমি বেঁচে আছি" এমন কি অতি কুখ্যাত সেই "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি," যেটা হল...আমি বলতে দুঃখিত হচ্ছি, কিন্তু আবার মনে হয়, ওটি একটি গাড়লের উক্তি—কিন্তু হলে কি হবে, ওটি একটি প্রসিদ্ধ নির্বোধের উক্তি—অথচ ওটাও একটা অহং। তুমি যে "মনোজ", এই ধারণা যে তোমাকে করায় সেটাই অহং, আবার তুমি অমুকের থেকে বা তমুকের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেটাও তাই। আর যেটা তোমার দেহকে গলে গিয়ে একটা সাধারণ দেহগত স্পন্দন সমষ্টির সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে দেয় না, সেটাও অহং। আবার যেটা তোমাকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেয়, একটা নির্দিষ্ট স্বভাব, সম্পূর্ণ পৃথক একটা চেতনা দেয়, সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তুমি তোমাতেই বিরাজ করছ, এই বোধ—বাস্তবিক এই ধরণের যা কিছু দেয়, সেটাই হল অহং। মানুষ যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা না করে তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ধারণা হবে, পৃথিবী যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবুও তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় থাকবে, সে যা তাই থাকবে। এ হল আর এক কাঠি উপরের অহং।

যখনা মানুষ যদি তার মনের এবং তার প্রাণের দিক থেকে অহংকে খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলত, তাহলে তার আর কোন আকার থাকত না, সে একটা সাধারণ স্তূপে পরিণত

হত। নিঃসন্দেহেই অহং হল ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার যন্ত্র। তার মানে হল, যতদিন পর্যন্ত না তুমি বিশেষভাবে একটি ব্যক্তি হয়ে উঠছ, নিজের মধ্য নিজে বিরাজ করছ, ততদিন অহং হল একটি অপরিহার্য উপাদান। কারুর যদি ক্ষমতা থাকত, সে যদি সময়ের আগেই তার অহংকে বিলুপ্ত করতে পারত, তাহলে সে তার ব্যক্তিত্বকে হারাত। কিন্তু একবার যেই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠল, তখন থেকে অহংয়ের অস্তিত্ব কেবল যে নিষ্প্রয়োজন তাই নয়, ওটা ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। আর কেবল তখনই হল সময়, যখন অহংকে অবলুপ্ত করা দরকার। কিন্তু স্বভাবতই, যেহেতু এই অহংই তোমাকে গড়ে তুলতে এত পরিশ্রম করেছে, সে অত সহজে তার কাজ ছাড়তে রাজী হয় না, বরং উল্টে সে তার এত প্রচেষ্টার প্রতিদান চায়, অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করতে চায়।

প্রশ্ন আমাদের এই যে বাহ্য দেহাকৃতি, এটাও কি অহং?

শ্রীমা অবশ্যই। সেই কথাই ত বললাম। আচ্ছা, বল দেখি, এই বাহ্য দেহটা কি করে গড়ে উঠতে পারত, যদি অহং না থাকত?

এইমাত্র তুমিই না আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যক্তিগত অহংয়ের প্রয়োজনটা কি?

একটা পারিবারিক অহং আছে, সেটা বড়ই মজার। তার কারণ এই পারিবারিক অহংয়ের দরুণই পরিবারের সবার মধ্যেই কোন না কোন ভাবে এক রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়। তারা সবাই ঠিক এক রকমের নয় বটে, কিন্তু সাদৃশ্য একটা আছেই। লোকে দেখে বুঝতে পারে ওরা এক পরিবারের। আবার যদি আরও পিছিয়ে পূর্বপুরুষদের থেকে আরম্ভ কর ত দেখতে পাবে, বরাবর একটা সাদৃশ্য চলে আসছে। একেই বলে পারিবারিক অহং। আর এ অহংটা ব্যক্তিগত অহংয়ের চেয়ে ঢের বেশী দীর্ঘস্থায়ী, ঠিক যেমন একটা জাতিগত অহংয়ের বেলাতেও তাই। যে সব পরিবারে খুব বেশী সংমিশ্রণ ঘটেনি, যারা নিজেদের মধ্যেই অনেকটা অমিশ্রভাবে রয়ে গেছে, যেমন আগেকার বনেদী আমলে দেখা যেত—বনেদী বংশের লোকেদের মধ্যে বেশী সংমিশ্রণ ছিল না, তাদের এক রকমের বংশগত ধারা বজায় থাকত—তাদের ক্ষেত্রে বংশগত অহংয়ের বৈশিষ্ট্য খুবই প্রত্যক্ষ। দৃষ্টান্ত যেমন, য়ুরোপের বুরবন (Bourbon) বংশীয়েরা, ফ্রান্সেও কতক বংশের ধারায় উর্ধ্ব থেকে অধঃপুরুষের মধ্যে পরম্পরাগত একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, এমন কি তাদের চেহারা দেখেও সেটা বোঝা যায়। স্বভাবতই যবে থেকে গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি, প্রভৃতির মধ্যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হল, তবে থেকে মিশ্র অহং গড়ে উঠতে থাকল, আর তার ফলে একটা দিগন্ত বিস্তারের শুরু হল। যেমন, মানুষ যখন নিজের মনের প্রসার চায়, বিভিন্ন রকমের বস্তুকে বুঝতে চায়, নানা ভাষা শিখতে আগ্রহশীল হয়, নানা দেশের, নানা যুগের জ্ঞান সঞ্চয় করতে চায়, তখন তার অহংটাও ব্যাপকতা লাভ করে, তার মনের সংকীর্ণতা তখন ঘুচতে আরম্ভ করে। অবশ্যই যোগের দ্বারা মানুষ এই সব কিছুকে সচেতনভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন সমষ্টিগত অহং কি, যে সব ব্যক্তির দ্বারা সমষ্টি গড়ে উঠেছে তাদের একত্র সংযোগের ফল?

শ্রীমা ঃ হাঁ, সাধারণত সমষ্টিগত অহংগুলো ব্যক্তিগত অহংয়ের চেয়ে গুণের দিক থেকে বেশ একটু নিম্ন স্তরের হয়ে থাকে। সাধারণত সমষ্টির যোগফল বা গুণফল না হয়ে ওটা বিয়োগ ফল হয়ে থাকে। অন্তর্মানসিকের দিক থেকে (psychological) ব্যাপারটা সর্বজন বিদিত। স্বতন্ত্র ভাবে লোকেদের দেখ, দেখবে তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে করলে দেখবে, তারা নির্বুদ্ধিতার একটি স্তূপ।

এই শেষ ?

প্রশ্ন ঃ উপলব্ধিকে কি ভাবে বিশুদ্ধ করা যায় ?

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ বইটির গোড়ার দিকেই বলেছেন, কি করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দাম্ভিকতা প্রভৃতির দ্বারা উপলব্ধির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ উপলব্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা মানে, তা হওয়া চাই সম্পূর্ণ অকপট, তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকবে না, কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দাম্ভিকতা, কামনা, শক্তিলাভের ইচ্ছা থাকবে না। কামনা বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে যদি না যায়, তবেই তা খাঁটি থাকে। আবার আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে, শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে বলেছেন, আর সেগুলোই হল সব চেয়ে বিপদজনক।

বেশ, তাহলে এই শেষ ?

প্রশ্ন মা, অনেকে জিজ্ঞাসা করে তুমি চমনলালকে ১৯৫৭ সালের যে দুর্যোগের কথা বলেছিলে, তা কি এ বছরের যে দুর্যোগের কথা বলেছ, সেই একই, না সেটা অন্য আর একটা ?

শ্রীমা ঃ কাকে ? (ছাত্রটি আবার তার প্রশ্ন করল)

আমি কোন দুর্যোগের কথাই ১৯৫৭ সালে বলিনি। ও হল একটা সিদ্ধি, কোন দুর্যোগ নয়। দুর্যোগ আগে, এ হল তার ফল। এ হল বিজয়, এ দুর্যোগ নয়। আমি জানিনা সে কি লিখেছে, এখন আমার আর মনে নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই আমি তাকে কোন দুর্যোগের কথা বলিনি।

প্রশ্ন "ভারতবর্ষের ব্যাপার নিয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে..."

(মা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে বললেন)

১৯৫৭ সালে ?

প্রশ্ন ঃ আজ্ঞা, হাঁ, মা।

শ্রীমা কস্মিনকালেও নয়। জীবনে কখন এমন কথা আমি বলিনি। আর সে যেটা লিখেছে তার মধ্যেও ও কথা নেই, কারণ থাকলে আমি কখন তাকে সেটা প্রকাশ করতে অনুমতি দিতাম না। যুদ্ধের সম্ভাবনা একটা আছে, কিন্তু আমি বলিনি ১৯৫৭ সালের কথা। (মা নীরব) হাঁ, যুদ্ধের সম্ভাবনা একটা আছে, তা সত্যি। গতবারে তোমাদের যে সব

বাধাবিঘ্নের কথা বললাম, হয়ত সেটা তারই অংশ। কিন্তু আমি সেটা একেবারেই ১৯৫৭ সাল বলে নির্দেশ করিনি।

(দীর্ঘকাল নীরব)

আর কিছু আছে? বেশ, শেষ তাহলে।

জানুয়ারী ১৯, ১৯৫৫

(Les Bases du Yoga, ed. 1954. Pp. 98-99, ed. Ashram)

প্রশ্ন মা, উর্ধ্বের মনের কাজটা কি?

শ্রীমা কাজটা? ঠিক কি জানতে চাইছ? তার কি করা উচিত? অথবা কোন্‌টা...

প্রশ্ন তার দায়িত্ব কোন বিষয়ে?

শ্রীমা উর্ধ্বের মনের দায়িত্ব? উর্ধ্ব থেকে যত প্রেরণাকে গ্রহণ করে সেগুলোকে ধারণা বা ভাবের আকারে স্থূলতর মনের কাছে ধরে দেবার দায়িত্ব তার, যাতে এই নিচের মন সেগুলোকে কাজে পরিণত করতে পারে, রূপ দিতে পারে। উর্ধ্বের শক্তি এবং সক্রিয় মনের মাঝে এই মন মাধ্যমের কাজ করে। উর্ধ্বের মন যত ভাবকে রূপদান করে এবং সেই সঙ্গে...(প্রচণ্ড বাতাসে মায়ের কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ শোনা গেল না)

এই হল উর্ধ্বের মনের উদ্দেশ্য, কিন্তু যে সব বস্তু অতি সাধারণ মনের নাগালের অতীত সে আবার, সেগুলোকে খানিকটা বোধগম্য করতে চেষ্টা করতে পারে। যেমন ধর, বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, সাধারণ যে সব ভাব এবং তত্ত্ব সাধারণ মনের ধারণার বাইরে সেগুলোকে আরও প্রাঞ্জল করে সামনে ধরা, ইত্যাদি।

প্রশ্ন মা, বিরোধী শক্তিগুলো যদি না থাকত, তাহলে কি আমরা উন্নতি লাভ করতে পারতাম না?

শ্রীমা যদি জগতটা না থাকত, তাহলে জগত বলে কিছু থাকত না, "যদি"। যে মুহূর্তে তুমি একটা "যদি" ছুড়ে দাও তোমার প্রশ্নের আর কোন অর্থ হয় না। সব কিছুই যেমনকার যা তেমনকার তাই, কারণ তারা যা, ঠিক তাই। তারা ওই রকম। কারণ তাদের ওই রকমটাই হওয়ার কথা। নইলে তারা ওরকমটা হতই না। সুতরাং ওকথা বলা চলবে না, "যদি এটা এরকম না হত, তাহলে কি রকম হত?" এ প্রশ্নের কোন মাথামুণ্ডু নেই। এটা এই, কারণ এটা এই রকমই।

তুমি যদি জগতের যে কোন একটা কিছুকে বদলে ফেল তাহলে আর একটা জগত হয়ে দাঁড়ায়। ধর, যদি বল, "আমরা জগত থেকে এই জিনিসটাকে বিলুপ্ত করব," যদি ওই জিনিসটা না থাকত তাহলে জগত অন্য রকম হত, কিন্তু জগত এখন যা, সেটা তখন আর তা থাকত না। এসব হল বাজে অনুমান, সম্পূর্ণ অনর্থক, তাই নয় কি? জগতের সব কিছু ওইরকমই। যা রয়েছে তাই থেকে শুরু করে, এগিয়ে অন্যত্র যেতে হবে।

কিন্তু বলা চলবে না, "যা রয়েছে তা যদি অন্য রকম হত..." তাতে লাভটা কি হয়? ওটা ওই রকমই।

বড় জোর বলতে পার, "যে হেতু বিরোধীশক্তিগুলো রয়েছে, ওগুলোকে কাজে লাগাবার, ওদের উপস্থিতির সদ্ব্যবহার করবার সব চেয়ে ভাল উপায় কী?"—সেভাবে বললে প্রশ্নটার একটা মানে হয়। কিন্তু তুমি বলছ, "যদি ওরা না থাকত?" কিন্তু রক্ষা কর। ওরা ত রয়েইছে। "যদি" আবার কি? ওরা যেমন, সেই ভাবেই ওদের নিতে হবে। তাই তুমি কেবল এই টুকুই বলতে পার, "আমি চাই, যেন ওরা না থাকে।" সেটা সম্পূর্ণ ন্যায্য। কিন্তু ওদের থাকাটাকে অকেজো করবার জন্যে তোমায় রীতিমতো খাটতে হবে, তবেই ওরা আর থাকবে না। ওদের থাকার যখন আর কোন দরকার হবে না, তখন ওরা জগত থেকে অন্তর্ধান করবে।

সব কিছু এখন যেমনটা রয়েছে সেই ভাবেই তাদের গ্রহণ করতে হবে, তারপর অন্য কিছু, যেটা ওর চেয়ে ভাল হবে বলে আশা করছ, তার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মাত্র এইটুকু ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

প্রশ্ন মা, এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "ভগবানের প্রকাশরূপ প্রশান্তি আর সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়েই ঘটে, প্রলয় কাণ্ডকে আশ্রয় করে নয়।"

শ্রীমা ইঁা, তা বলেছেন। এখন তোমার প্রশ্নটা কি? তুমি কি এটা জান না? জানা উচিত ছিল।

অনেকে আছে যারা সর্বদাই মনে করে, প্রলয় কাণ্ডগুলো ভগবানের ইচ্ছার ফল। আবার এমন সব লোকও আছে যারা একটা কোন শক্তিলাভ করেছে কি, অমনি তাদের সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটে, আর তারপর তারা বলে, "ভগবান যখন কাজ করেন তখন সব ওলটপালট করে দেন।" ওটা বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। ভগবান কখন ওলটপালট করেন না, তোমার নিজের পূর্ণতার অভাবই তোমার মধ্যে ওলটপালট ঘটায়। কিম্বা হয়ত ওটা ঠিক ওইসব বিরোধী শক্তিদের একটার আক্রমণ হতে পারে যাদের সম্বন্ধে তিনি পরে বলেছেন। কিন্তু তোমার ভিতরে যদি গলদ না থাকে, তাহলে কখনই তুমি বিপর্যস্ত বোধ করবে না। ঠিক যেমন এর পরের লেখাগুলিতে রয়েছে, "এ নয় যে মা তোমাকে পরীক্ষা করছেন, বাইরের যত ঘটনাচক্রই তোমার পরীক্ষা করে।" কিন্তু এমনটা বলা মোটেই প্রীতিকর নয়, তাই না? (মা হাসতে লাগলেন) বোধ হচ্ছে যেন এটা শুনে তোমার আফশোষ হচ্ছে যে, ভগবান বিপর্যয় ঘটান না।

বিপর্যয় সর্বদাই ঘটে একটা প্রতিবন্ধকতার দরুণ। যদি প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তাহলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হত না। তাই মহাপ্লাবন, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক ঝড়, কূলভাসানো তরঙ্গ, মহাদেশের ভূগর্ভে সমাধিলাভ, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রভৃতিও হয়ত প্রতিবন্ধকতার দরুণ ঘটতে পারে।

প্রশ্ন: আচ্ছা মা, বিরোধীশক্তিদের উপর যে কাজের ভার আছে, সে সম্বন্ধে তারা কি সচেতন, অর্থাৎ...

শ্রীমা না, শ্রীঅরবিন্দ বইটির মধ্যেই সে কথা বলেছেন যে তারা নিজেরাই নিজেদের সে ভার দিয়েছে। তাঁর নিজের কথা বইটিতে লেখা রয়েছে, "বিরোধী শক্তিরা নিজেরাই এ কাজের ভার নিয়েছে," তার মানে, তারা নিজেরাই স্থির করে নিয়েছে যে এ কাজ তারা করবে।

কিন্তু তুমি ঠিক কি জানতে চাইছিলে? কেন তাদের উপর এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন না, আমি জানতে চেয়েছিলাম, বিরোধী শক্তিদের যে সব কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে তারা সচেতন কি না, কারণ তা হলে বোঝায় যে তারা আধ্যাত্মিক কাজে সহায়তাই করছে।

শ্রীমা এমন কোন কিছুই নেই যা শেষ পর্যন্ত সহায়তা না করে। তারা যদি স্বেচ্ছায় সাহায্য করত, তাহলে ত আর তারা বিরোধী শক্তি থাকত না, তারা হয়ে উঠত সহযোগী। একটি বিষয় কিন্তু খুব সাবধান হতে হবে। যে সব শক্তি আমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বিরোধী শক্তি বলবে না। এ সব শক্তি মানুষের প্রতি শত্রুতা করে না, মানুষের সুখ শান্তি নষ্ট করে না, এরা হল সেই সব শক্তি যারা ভগবানের কাজে বিরোধিতা করে।

প্রায়ই আমি অনেককে বলতে শুনেছি, "বিরোধী শক্তির" কথা --দৃষ্টান্ত যেমন, "অসুখের বিরোধীশক্তি, সেগুলো আমাকে আক্রমণ করে।" এ হল বড় বেশী ব্যক্তিগত দৃষ্টি-ভঙ্গী। হয়ত ওটা বিরুদ্ধশক্তিদের দরুণ না হতেও পারে। তুমি ওদের বল বিরোধী, কারণ ওরা তোমাকে আক্রমণ করে। কিন্তু যথার্থত লোকে যখন বিরোধী শক্তিদের কথা বলে, তখন বুঝতে হবে, সে শক্তিগুলো দিব্যকর্মের অথবা দিব্যইচ্ছার বিরোধীতা করে। সুতরাং তারাই যদি এই দিব্যকর্মের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তা হলে ত আর তারা বিরোধী হবে না। তাই নয় কি? এ একেবারে অকাট্য যুক্তি।

অতএব এ কথাও বলা চলবে না যে, মানবজাতির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধির জন্যে, এ হল এক রকমের কাজ। কিন্তু এমন কোন কিছুই নেই, যাকে দিব্যকর্মের জন্যে ব্যবহার করা যেতে না পারে, এমন কি সব চেয়ে বিরোধী বস্তুগুলি পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্ভর করে, কিভাবে তাদের গ্রহণ করা হচ্ছে তার উপর। তবে এটা বলা দরকার যে লোকেদের সঙ্গে যখন বিরোধী শক্তিদের যোগাযোগ ঘটে, তখন তারা মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্যে ফাঁদে ফেলে অতি নিকৃষ্ট রকমের মজা দেখে। উদাহরণ স্বরূপ, তুমি যদি অতিমাত্রায় দৃঢ়চেতা এবং অতিমাত্রায় অকপট না হও, আর যদি মনে মনে বল, "আমার বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিত", এমন আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে বলতে পার, তার মধ্যে এটা একটা—দেখবে, তৎক্ষণাৎ এমন একটা কিছু ঘটে বসবে, যেটা তোমার বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ টলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। এ হল একটা অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। আমার মনে হয় এটা ওদের মজা করে আমোদ উপভোগ করবার কসরৎ।

এমন যে কত বারই ঘটে, কেউ যখন বুক ফুলিয়ে দেমাক করে...হয়ত সেটা খুবই ছেলেমানুষীর ভঙ্গিতেই করে...তা যাই হোক, যখন বলে, "এ ভুল আর আমি জীবনে

কখন করব না, এ বিষয়ে আমি একেবারে স্থির নিশ্চিত," তৎক্ষণাৎ আমি চোখের সামনে দেখতে পাই একটা বিরোধী "রূপ" সেখান দিয়ে, এইভাবে চলে যাচ্ছে, আর মানুষটার ওই দার্ঢ্যিকতার দ্বারা যে ছোট্ট ছিদ্রটা তৈরী হয়েছে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর একেবারে সোজা ভিতরে চলে গিয়ে, ঠিক যেটাই তুমি করতে চাও না সেটাই যাতে করতে বাধ্য হও তার জন্যে সকল ব্যবস্থা করে রাখে। কিন্তু এ হল ওদের মজার ব্যাপার, কখনই তোমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেবার জন্যে নয়। (বলে না হাসতে লাগলেন) কিন্তু যদি জানো, কি ভাবে ওটাকে নিতে হয় তা হলে ওটা তোমায় উন্নতি লাভ করতে সাহায্য করবে। তুমি বলবে, "আচ্ছা পরের বার আর আমি বড়াই করব না।"

আর মনের এবং প্রাণের স্তরে এই শক্তিগুলো অতি মাত্রায় সচেতন বলে, মুখ ফুটে তোমায় একটি কথাও প্রকাশ করবার দরকার হবে না। যদি তোমার চিন্তা...যেমন ধর, কোন একটা কিছু ত্রুটি সংশোধন করবার জন্যে, কিম্বা কোন একটা বদ অভ্যাসকে, বা স্থূল কোন দুর্বলতাকে জয় করবার জন্যে তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছ, এবং তোমার অকপট চেষ্টার ফলে কিছুটা পরিমাণে সাফল্যও লাভ করেছ, তখন শুধুমাত্র মনে মনেই যদি তুমি ভাব, এবার তুমি সত্যিই ওটা কাটিয়ে উঠেছ, দেখবে, পরক্ষণেই সেটা আবার শুরু হয়ে গেছে। এ হল...বুঝলে কিনা...চিন্তা পর্যন্ত করবে না, মুখ ফুটে বলার ত প্রশ্নই ওঠে না। নিছক মনে মনে যদি চিন্তার উদয় হয়, "ইস্, আগে কীই না ছিলাম, আর এখন দিব্যি কেমন হয়েছি! সব ভাল হয়ে গেছে, ব্যস্, তা হলেই সব মাটি। মিনিট খানেক পরেই আবার যে-কে সেই, শুরু হয়ে যাবে।

আর এ ত একেবারে জানা কথা, তার কারণ তোমার চারিদিকে যত চরেরা ঘোরা-ঘুরি করছে। মানুষের ক্ষতি করতে তাদের জুড়ি নেই, আর তা করে তাদের প্রচণ্ড উল্লাস। আমি ত এক এক সময় ওদের বিদ্রূপের হাসি স্পষ্ট শুনতে পাই। কেউ যখন বোকার মতন বেশ খোলাখুলি ভাবে কিছু একটা বলল, তখন আমি ওদের একটা চাপাহাসি শুনতে পাই। তাতে ওরা মজা করবার প্রচুর খোরাক পায়। আর তার পরক্ষণেই বা পরের দিনই চিৎপাটাং —সব নষ্ট হয়ে গেল।

প্রশ্ন এই সব শয়তানগুলোকে এড়ানো যায় কি করে?

শ্রীমা আঃ! কর্তব্যের দিক থেকে চাই, একটা নীরব অন্তর্মুখীনতার অবস্থায় থাকা। সেই সঙ্গে, তুমি যেটা করতে চাও, যে উন্নতি লাভ করতে চাও, সেই কাজে তোমার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে নিযুক্ত রাখবে, অর্থাৎ তোমার কাজের জন্যে তোমার মন দিয়ে গড়া যে রূপটি দরকার সেইটিতে। তারপর দরকার, তোমার যে পর্যবেক্ষণ করবার যে সব ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোকে তোমার কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, যেমন, কাজ করবার জন্যে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছ, সে সব থেকে কি ফল লাভ করেছ, যে অভিজ্ঞতা হল তার থেকে কি তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পার, কি জ্ঞান লাভ করতে পার, এক কথায় এই সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা উচিত—কিন্তু কখন নিজের দিকে ফিরে তাকাবে না, তুমি যে নিজে করছ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করতে যাবে না। নিজেকে লক্ষ্য করার এই যে প্রবৃত্তি এটাই হল বিপদজনক। এর থেকে সর্বদাই যত রকমের অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়,

এক এক সময় তা খুবই সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বেশীর ভাগ লোক এই করেই সময় কাটিয়ে দেয়, তারা লক্ষ্য করে যে তারা করছে, তারা বেঁচে রয়েছে, প্রভৃতি সব, আর তার ফলে তারা বড় বেশী..."আত্ম-সচেতন" হয়ে ওঠে, মানে, সেটা করছে তার মধ্যে নিজেকে অকপটে সমগ্রভাবে ঢেলে না দিয়ে, নিজেরা করছে এটাই লক্ষ্য করে এবং নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে, হয় সেটাকে বেশ তারিফ করে, নয়ত নিন্দা করে। এমন সব লোক আছে যারা কাজ করার সময় নিজেদের লক্ষ্য করে আর খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং প্রচুর পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়। তারা নিজেদের খুবই অসাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করে। আবার এমন লোকেরও অভাব নেই যাদের নিজের সম্বন্ধে মনটা বড় খুঁতখুঁতে। সারাক্ষণ তারা নিজেদের দোষত্রুটি দেখে সময় কাটায়। এখন এই দুপক্ষের কেউই অন্যটির চেয়ে ভাল নয়। দুই-ই সমান ক্ষতিকর। সব চেয়ে যেটা ভাল তা হচ্ছে, নিজের বিষয় একেবারেই মাথা না ঘামানো। যদি কিছু করবার থাকে ত সেই সম্বন্ধে মাথা ঘামানোই সব চাইতে ভাল, আর স্বভাবতই যতদূর সম্ভব ভাল করে সেটা করা। সর্বদা সেটাই ভাল কাজ কিন্তু অন্যটা নয়... ভাল করে কাজ করছ কি মন্দ করে করছ তা দেখা, কাজ করার সময় নিজের দিকে লক্ষ্য রাখা, নিজেকে তারিফ করা, প্রভৃতি হল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

কি ভাবে কাজটা করতে হবে এবং কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল উপায়, সেটা আবিষ্কার করাই হল সব চেয়ে বেশী দরকারী। কিন্তু কাজ করতে করতে নিজেকে লক্ষ্য করা, এবং হয় খুব খুশি নয়ত বিরক্ত হওয়া, কেবল যে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, তার দ্বারা যথেষ্ট ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে।

প্রশ্ন "পূর্ণপরিণত চৈত্যপুরুষ" বলতে কি বোঝায়?

শ্রীমা চৈত্যপুরুষ সুন্দরভাবে পরিণতি লাভ করেছে—বলতে কি বোঝায়? কিন্তু আমি ত তোমাদের এ সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। গত সপ্তাহে যদি না হয় ত, তার আগের সপ্তাহে, তাই না? অবশ্যই তাই। আমি বলেছিলাম প্রাথমিক দিব্য-স্ফুলিঙ্গ থেকে আরম্ভ করে, যতদিন না তা পূর্ণপরিণতি লাভ করে একটি পরিপুষ্ট সত্তার আকার নেয়, এবং সমগ্র ভাবে সচেতন এবং স্বাধীন হয়ে ওঠে ততদিন কি ভাবে চৈত্যপুরুষরা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। তাই কেউ যখন বলে, একটি পূর্ণ পরিণত সত্তা, একটি পূর্ণ বিকশিত চৈত্যপুরুষ, তার মানে, এমন একটি চৈত্যপুরুষ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, যে প্রায় তার পরিপূর্ণ বিকাশের অবস্থা লাভ করেছে।

প্রশ্ন আচ্ছা, মা, তাহলে অমন পূর্ণ বিকাশের অবস্থা লাভ করার পরেও কি করে আবার তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে?

শ্রীমা কি রকম অসম্পূর্ণতা?

প্রশ্ন: তুমি যে সে দিন বললে, কারুর যদি কোন বাধা বিঘ্ন থাকে, তার মানেই তার সত্তা সাধারণ স্তরের।

শ্রীমা অবাক কাণ্ড। চৈত্যসত্তা আর বাহ্য সত্তা যে এক নয়, তা কি ভুলে গেছ?

চৈত্যসত্তা হয়ত পূর্ণ পরিণত হতে পারে, কিন্তু তার বাহ্য সত্তা একেবারে ভাহা মূর্খ থাকতে পারে, এ দুটিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে কি করে? তাদের একের সঙ্গে অপরের কোন সম্বন্ধ নেই। দুঃখের বিষয়, বেশীর ভাগ সময়েই তাদের পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই যে নেই, তার কারণ বাহ্য সত্তা চৈত্যপুরুষ সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। কিন্তু যখন সচেতন হতে থাকে তখন বাহ্য সত্তা যে পরিমাণে সচেতন হয়, সেই পরিমাণে সে চৈত্যসত্তার পূর্ণতাকে প্রতিফলিত করে।

তুমি যদি চৈত্যপুরুষের স্বধর্ম বা তার গুণের সম্বন্ধে না বলে, এই পৃথিবীতে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে বল, তাহলে তার বাধাবিঘ্ন না থাকবার কারণ কি? জগত যদি পাকপূর্ণ চৈত্যচেতনাময় হত তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু তা ত নয়, জগত তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর আমার ত মনে হয়, যে যত বেশী চৈত্যচেতনাময় হয় সাধারণত তার তত বেশী বাধা বিঘ্ন হয়ে থাকে। কেবল সেক্ষেত্রে সেগুলোর সম্মুখীন হবার জন্যে সে তৈরী থাকে। কিন্তু মানুষ যত বেশী চৈত্যচেতনাময় হয় তত বেশী জগতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। আর কোন কিছুর সঙ্গে বিরোধ বাধার ফলই হল যত বাধা বিঘ্ন। আমি এটা লক্ষ্য করে দেখেছি, যাদের প্রচুর বাধাবিঘ্ন তারা তাদের চৈত্যপুরুষের সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। যদি বাহ্য ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে বলতে চাও...আমি মানুষের প্রকৃতির কথা বলছি না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যদি বাহ্য অবস্থাগুলোর সম্বন্ধে বল...যাদের সবচেয়ে বেশী লড়াই করতে হয়, আর যাদের কষ্টভোগের কারণগুলো সব চেয়ে বেশী, তাদের চৈত্যপুরুষ খুব বেশী পরিণত।

প্রথমত, চৈত্যপুরুষের পরিণত অবস্থার দরুণ দুরকমের ফল হয়ে থাকে, সেগুলো আবার সহগামী, তার মানে, চৈত্যপুরুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তিও বাড়ে। আর অনুভবশক্তি যত বাড়ে তত তার কষ্টভোগ করবার সামর্থ্যও বাড়ে। কিন্তু এর আবার একটা পরিপূরক অংশও আছে। তা হল এই যে, মানুষটা যে পরিমাণে তার চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেই পরিমাণে সে জীবনের যত রকমের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়; আর তখন তার আভ্যন্তরীণ একটা স্বাধীনতা থাকে, তার দরুণ কোন একটা ঘটনা থেকে সে সম্পূর্ণ অন্যভাবে নিজেকে প্রত্যাহার করতে, গুটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফলে, সাধারণভাবে সে যে আঘাতটা পেত তা আর পাবে না। তুমি তখন অন্তরের শান্তি বজায় রেখে অচঞ্চলভাবে, বাধা বিঘ্ন বা বাহ্য অন্য সব কিছুর সম্মুখীন হতে পারবে এবং এমন একটা আভ্যন্তরীণ জ্ঞান লাভ করবে যার দরুণ কোন কষ্টভোগই আর থাকবে না। তখন একদিকে যেমন তোমার অনুভব করবার শক্তি অনেক বেড়ে যাবে তেমনি আর একদিকে আবার তুমি ঢের বেশী শক্তিমান হয়ে সেই অনুভূত অবস্থার সম্মুখীন হতে পারবে।

আর কোন "জরুরী" প্রশ্ন নেই ত? (মা নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন) কাকে বলে জরুরী প্রশ্ন? কে বলতে পার?

ছাত্ররা তা এমন একটা প্রশ্ন, যার উত্তরটা খুব জরুরী। (সকলের হাস্য)

শ্রীমা আমি হলে বলতাম, যেটা এমন একটা প্রশ্ন যা আজকেই জিজ্ঞাসা না করলে, রাত্রে ঘুম হবে না। (সকলের উচ্চহাস্য)

সেটাই হল সত্যিকারের জরুরী প্রশ্ন। যাক্, তাহলে আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই, কি বল? এখন তাহলে সবাই গিয়ে আরামে ঘুমতে পারবে।

প্রশ্ন হয়ত সেটা এমন প্রশ্ন হতে পারে...যেটা জিজ্ঞাসা না করলে আর সে উন্নতি লাভ করতে পারবে না।

শ্রীমা ইঁ্যা, এটা একেবারে ঠিক কথা। কিন্তু যে প্রশ্নের দ্বারা তুমি উন্নতি লাভ করবে, সেটার সম্বন্ধে তুমি সচেতন কি? যদি সত্যিই সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাক, তাহলে সেটা মস্ত বড় কথা। তার মানে, তোমার অর্ধেকটা উন্নতি লাভ হয়ে রয়েছে। তেমন সব প্রশ্ন আছে কি? কেউ উন্নতির জন্যে আপাদমস্তক প্রস্তুত আছ কি?

বেশ, তাহলে ওটা আসছে বারের জন্যে তোলা থাক।

শ্রীমৎ অনির্বাণ ও শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

সত্য বসু

৩১শে মে ১৯৭৮—শ্রীমৎ অনির্বাণ ৮২ বছর বয়সে দেহ রাখলেন, তাঁর বাসভবনে, ৯।২ ফার্ণ রোডে। আজ ২৪শে জুন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার জন্য ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পাঠমন্দিরে এই অনুষ্ঠান।

ইতিমধ্যে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীমায়ের আশীর্বাদ পাঠাতে। তিনি চিঠিতে জানালেন—

"শ্রীসত্যকুমার সমীপে,

শ্রীমৎ অনির্বাণের স্মৃতি অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ জানবে ও আমার শুভেচ্ছা। —নলিনীকান্ত গুপ্ত"

অনির্বাণজীর কথা আমায় কিছু বলতে হবে। বলব—তবে তাঁর জীবনী নয়—সে স্পর্ধা আমার নেই। বলব—আমার চোখ দিয়ে তাঁকে যে ভাবে দেখেছি, তাঁর কাছ থেকে যেসব কথা শুনেছি, আর কিছু বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল ঘটনা। বহু বছর আগেকার কথা সব—এখন স্মৃতির অতল গহনে পড়ে আছে—সেখানে ডুব দিয়ে কিছু সম্পদ উদ্ধার করবার চেষ্টা করব।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। ভারতে একটা যুগের শেষ হল। আরম্ভ হল নতুন যুগ। নব ভারত গড়বে কোন উপাদানে? স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দ বাণী দিলেন, "...ভারতের অভ্যুত্থান তার নিজের স্থূল স্বার্থসেবার জন্য নয়, শক্তি সমৃদ্ধি লাভের জন্য নয়...। ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্ম জ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা।" এ বাণী ভারত-আত্মার বাণী—এ ডাক অন্তঃসলিলা। খুলে দিলেন নতুন দিগন্ত। মুষ্টিমেয় এই বাণী শুনতে পেল....আরো মুষ্টিমেয় এ বাণীর অর্থ বুঝলো। দেশের গতি একটা নতুন পথে মোড় নিল—অবশ্য টালমাটাল, যেমন বহির্জগতে, তেমনি অন্তর্জগতে। শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে হবে—দার্শনিক, পণ্ডিত মহল, সুধীসমাজে একটা আবেগ এলো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন বোঝা যায় না—Life Divine দুর্বোধ্য—আবার কেউ কেউ বললেন—তিনি নতুন কিছুই বলেন নি—এই সব নানা লোকের নানা কথা। মানুষের বুদ্ধি এখনো মন্থর, অভিমানে ভরা—এ রোগ সহজে যায় না।

ঠিক এই সময় হিমালয়ের একটা শিখর আলমোড়া থেকে নেমে এলো শ্রীঅরবিন্দের এই "দুর্বোধ্য" Life Divine-এর অনুবাদ 'দিব্য জীবন'—অনুবাদক শ্রীমৎ অনির্বাণ। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৮ সালে 'দিব্য-জীবনের' প্রথম প্রকাশ। Life Divine ১০৮৪ পাতার বই—তার বাংলা অনুবাদ। পড়লাম—যেন নুক্তাঝরা। মন-প্রাণকাড়া ভাষার কী বিদ্যোত। শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষা এবং ভাষা যত কঠিন, আপাতদৃষ্টিতে যত দুর্বোধ্যই হোক না কেন অনির্বাণজী ঠিক তার প্রতিধ্বনিটি খুঁজে বার করে জোড় মিলিয়ে দিয়েছেন। কী অপূর্ব অনুবাদ—এ যেন অরবিন্দ ভাষা এক মুহূর্তে ইংরাজী কঞ্চুক ছেড়ে ভারতীয় নীলাম্বর পরিধান করল।

সেই থেকে প্রাণে এক দুর্নিবার আগ্রহ জন্মাল—তাঁকে দর্শন করবার —সে সুযোগ আসতে দেরী হল না।

আজ থেকে ৩০ বছর আগেকার কথা—সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে অনির্বাণজীকে প্রথম দর্শন করলাম তাঁর ছোটভাই বিমলবাবুর বাড়ীতে—মাণিকতলায়। নিস্তব্ধ বাড়ী—ঘরে ঢুকে পড়লাম—দেখি খাটের উপর বসে আছেন—শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি—পরণে গুহ্যবেশ। চক্ষু দুটির কথা বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে একদিন বললেন "আচ্ছা, আমাকে সেই ছবি একদিন দেখাতে পার, পাখী ডিমে তা দিচ্ছে, ওপরে মাত্র ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। এই হল যোগীচক্ষু, এঁরা তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত।" তাই-ই দেখলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হুবহু মিলে যায়।

কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কাছে যেতে ভয় করে আবার গিয়ে পড়লে চিরকালের মত আপন করে নেন। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে সামনে চেয়ারে বসলাম। দুষ্টুমি বুদ্ধি ছিল আমার কিছুটা—আর কারও কাছে গিয়ে পড়লে খালি হাতে ফিরে আসার পাত্র নই আমি। সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম। আচ্ছা, আপনি যে Life Divine অনুবাদ করলেন, আপনি কি শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেয়েছেন? বললেন মধুর কণ্ঠে,—সহজভাবে—আজও সারা দেহে মনে সেই কণ্ঠস্বর যেন সঙ্গীতের মত বেজে ওঠে।

ধীরে ধীরে বললেন, "তোমরা যাকে দর্শন বল, এ সে দেখা নয়, এ হল অপরোক্ষ অনুভূতি। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নয়, বোধজ প্রত্যক্ষ। তা না হলে এই বইয়ের অনুবাদ করা তো সম্ভবই হত না। অনুবাদ করব এই সঙ্কল্প নিয়ে যেদিন প্রথম আলমোড়াতে আবার ঘরের জানলার ধারে কাগজ কলম নিয়ে বসেছি—সামনে Life Divine বইটি খোলা—তখন সবে ভোর হয়েছে. Life Divineএর শুরুতে "The human aspiration" —ভাবছি এর অনুবাদ কি হবে—সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ঝলমল করে ভেসে এলো, "নচিকেতার অভীপ্সা"—ঠিক পেয়ে গেলাম। তারপর আর থামা নয়, লিখেই চলেছি, লিখেই চলেছি। একটিও dictionary ছিল না, না বাংলা না ইংরেজি, যা consult করব। কী বলব! Words were supplied to me—অনেক কথার অর্থ নিজেও জানতাম না, পরে সে সব কথা বহু পুঁথি ঘেঁটে উদ্ধার করতে হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার—পরিভাষাগুলো ঠিক জায়গায় বসে গেছে।"

বলে চললেন, "একটি Chapter শেষ হলো—সন্ন্যাসিনী তাপস তার মুক্তার মত হস্তাক্ষরে সেটি copy করে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পাঠিয়ে দিল। তারপর, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, কোন উত্তর এল না। এমনি করে ছ'মাস কেটে গেল। তাপসকে বললাম—দেখলে তো, নিষেধ করেছিলাম।" তাপস কিন্তু নাছোড়বান্দা, আবার আর একটি copy করে পাঠিয়ে দিল। এবার পণ্ডিচেরী থেকে নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের উত্তর এল—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "It is a living translation"—চুপ করে গেলেন।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, এত শক্ত করে লিখলেন কেন? বড় শক্ত শক্ত কথা ব্যবহার করেছেন। পড়তে প্রচুর আনন্দ পাই—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ বুঝতে মেহনৎ

করতে হয়। বললেন, "বলুন তো words were supplied to me. শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী ভাষাকে দেবভাষা করে দিয়ে গেলেন, তার অনুবাদ সহজ আধুনিক ভাষায় হয় না, তাই বাংলা ভাষাকেও অনুরূপ দেবভাষায় আনতে হল।"

ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকবার আগে তাঁকে বলেছিলাম—আজকাল দেখি প্রচুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা আগ্রহ জেগেছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্বন্ধে জানবার—পড়বার। কিন্তু সেই একই নালিশ—অনেকেই বলছেন, শ্রীঅরবিন্দের লেখা সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন। উপরতলার লোক বলছেন—সহজভাবে, সহজভাষায় যাতে সাধারণ লোকের বুঝতে অসুবিধা না হয়—সেইভাবে আপনারা ছোট ছোট বই লিখুন—গ্রামে গঞ্জে বিলি করুন। উত্তরে অনির্বাণজী বললেন—শ্রীঅরবিন্দের লেখা গুরুগম্ভীর তারও একটা তাৎপর্যপূর্ণ সার্থকতা রয়েছে বিশ্বের দুয়ারে—চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে। অবশ্যই তাঁর লেখা সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন। যাদের শক্ত লাগে তারা শ্রীমায়ের লেখা পড়ুক। না তো কত সহজভাবে, সুন্দরভাবে, শ্রীঅরবিন্দের সব কথাই লিখে গেছেন। মায়ের লেখা পড়ুক—বুঝতে অসুবিধা নেই।

মনে পড়ে একবার তাঁকে একটু পণ্ডিতের মত প্রশ্ন করলাম। আচ্ছা, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিতর আপনি নতুন কি পেলেন? অনেক পণ্ডিতেরা বলেন শ্রীঅরবিন্দ নাকি নতুন কিছু বলেন নি। খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন "সব শাস্ত্র, দার্শনিকগ্রন্থের ভিতর একটা আপসা ভাব থেকে গেছে—শ্রীঅরবিন্দের দর্শন প্রথম সেই আপসা ভাব সরিয়ে দিল। শাশ্বত অবদান।" উত্তরটি ছোট্ট কিন্তু কি গভীর অর্থপূর্ণ। বুঝিয়ে দিলেন সাধনার জগতে এ এক বিস্ফোরণ। গভীরে না গিয়ে না বুঝে যদি কেউ বলেন শ্রীঅরবিন্দ নতুন কিছু বলেন নি, তাহলে মস্ত ভুল করবেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একজন বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথ আর নিজে কি লিখেছেন? সবই তো উপনিষদ থেকে চুরি"—মনে পড়ে গেল গৌরী ধর্মপালের কবিতায় উত্তরটি—

"মাটি চোর গাছগুলো, মাটিরাও গাছচোর
একে যদি চুরি বল, সকলেই জোচ্চোর।
পৃথিবীটা হল কিসে? সূর্যের গা চুরি না?
এটাকে বলছ চুরি? কথাগুলো গাছুরি না?"

এই ধরনের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, বহু বছর আগেকার কথা—১৯৫০ সাল হবে—যখন অনির্বাণজীকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক চলছিল বিভিন্ন কেন্দ্রে। সেদিন শিবপুর কেন্দ্রে প্রশ্নোত্তর চলেছে। একটি তরুণ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নানা প্রশ্ন করছেন। তরুণটি প্রশ্ন করে বসলেন, "আচ্ছা, আপনি কি শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের সাধক?" লক্ষ্য করলাম, এই প্রশ্নটি পাশে সরিয়ে অন্য সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন—বোধহয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলে। কিন্তু তরুণ অধ্যাপকের ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন। এবার ধীরে ধীরে অনির্বাণজী উত্তর দিলেন—বললেন—"সব যোগের পথ শেষ হয়েছে, একই জায়গায়। কিন্তু সেই সিদ্ধির ভূমিতে পৌঁছে যদি কোন সাধক এর পরেও এগোতে চান তাহলে তিনি শ্রীঅরবিন্দের যোগের পথে আপনা হতেই এসে যাবেন।" সহজভাবে কি অপূর্ব বোঝাবার ভঙ্গিমা—বুঝতে অসুবিধা হল না কি বলতে চান। তা হলো, সব

যোগের শেষ যেখানে, শ্রীঅরবিন্দের যোগের শুরু সেখান থেকে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই কথা বলেছেন। আর এও বুঝতে অসুবিধা নেই, যে-কোন সম্প্রদায়ের দীক্ষিত সাধক এপথে আসতে পারেন—বাধা নেই।

১৯৪৮ সাল। ওই বিমলবাবুর বাড়ীতেই অনির্বাণজীকে অনুরোধ করলাম কলেজ স্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে ভাষণ দেবার জন্য। ভাষণ দেবার কথা শুনে খুবই বিরক্ত হলেন—কিছুতেই রাজী নন। মহা মুস্কিল। বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। বললাম—আচ্ছা, ঘরোয়া বৈঠকে এসে যদি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন? রাজী হলেন। পরের বছর আলমোড়া থেকে আমায় চিঠি দিলেন। লিখলেন, "আমি কলকাতায় যাচ্ছি—কদিন থাকব। আমার programme করার ভার তোমার উপরে। সেই ১৯৪৯ সাল থেকে তাঁকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক শুরু হল—কলকাতায় যত কেন্দ্র আছে—সব জায়গায় গেছেন। নানা লোকের নানা প্রশ্ন—উত্তর দিতেন হাসিমুখে—কখনও বিরক্তির ভাব দেখিনি—বরং আমরাই বিরক্ত হতাম তাঁকে বিরক্ত করা দেখে।

মাঝে মাঝে অনির্বাণজী গেরুয়া পরতেন। Lansdownএ একটি কেন্দ্রে সেদিন গেরুয়া পরে এসেছেন। ঘরোয়া বৈঠকে প্রশ্ন-উত্তর চলেছে। আমার বন্ধু অজিত বসু, পাঠ-মন্দিরের সহ-সভাপতি প্রশ্ন করে বসলেন, "গেরুয়া বসনে আপনার attachment কেন? যতদূর জানি বৈরাগ্যের পথ তো আপনার নয়।" এই কথা শুনে তাঁর কি হাসি—যেন একমুঠো নুপুর মাটিতে গড়িয়ে গেল। বললেন, "খুব ভুল হয়ে গেছে, আর কোনদিন পরব না।" ঘরশুদ্ধ লোক হেসে উঠল।

এইভাবে তিন বছর কেটে গেল। ভাবলাম, এইভাবে তাঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এক সুযোগে তাঁকে বললাম—"এই রকম ঘোরাঘুরিতে আপনার যে বেশ পরিশ্রম হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। ভাবছিলাম—পাঠমন্দিরে আপনার ভাষণের ব্যবস্থা করলে এক জায়গায় সব কেন্দ্রের লোক জড়ো হবে, আপনাকে আর পরিশ্রম করে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে হবে না। রাজী হয়ে গেলেন। সেই থেকে পাঠমন্দিরে নিয়মিত ক্লাস নিতে শুরু করলেন। প্রতি বছর শীতের সময় আলমোড়া থেকে কলকাতায় আসতেন। প্রথম শুরু করলেন দিব্যজীবন—তার পর যোগসমন্বয়। সে যে কী অপূর্ব ভাষণ—মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হত তাঁর ভাষণের সময়।

ওদিকে তাঁর লেখা "দিব্য-জীবন প্রসঙ্গ" আর "যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ" ধারাবাহিকভাবে ত্রৈমাসিক পত্রিকা "বর্তিকা"য় ছাপা হত—নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায়। কোন এক সময় কথা প্রসঙ্গে 'বর্তিকা' সম্বন্ধে আমায় বলেছিলেন—"Best spiritual journal in India. বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এটা যাওয়া দরকার"। এই ধরণের কথা নলিনীদাও আমাকে একবার বলেছিলেন।

একটি কথা আমায় প্রায়ই বলতেন—"চাই linear movement, যেমে যাকে বলা হয়েছে অন্বয়গতি। একেবারে সোজাসুজি ঋজু পথে যাওয়া। কোথাও কোনও বৃত্তি বা বাঁক থাকলে চলবে না, বলতেন—আঁশ থাকলে তাঁকে পাওয়া হল না। চাই অব্যভিচারিণী ভক্তি, গোপীদের মত ভালবাসা।"

বহু বছর লেগে গেল দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ ও যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ শেষ হতে। শনিবার ক্লাসে ঠিক সময় পাঠমন্দিরে এসে যেতেন—কোনদিন কামাই নেই। জ্বর গায়ে এসেছেন,

ঝড়, জল, বোমাবৃষ্টিতে শহর অচল অবস্থা, তিনি ঠিক সময় এসে গেছেন। একদিন কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলে দারুণ বোমা, গুলি চলেছে, ট্রাম বাস সব বন্ধ—সেদিন শনিবার, অনির্বাণজীর ক্লাস—কোন লোক আসার প্রশ্ন ওঠে না। অনির্বাণজীকে ফোন করে এদিককার অবস্থা সব জানালাম—বললাম—"আজকে আপনার ক্লাসে কেউ আসতে পারবে বলে মনে হয় না—ক্লাস বন্ধ রাখলে কেমন হয়?" উত্তরে বললেন—"কেন? একজন থাকবে তো—তুমি? তাহলেই যথেষ্ট, ক্লাস কখন বন্ধ করতে নেই।" ঠিক সময়ে এসে গেলেন—ক্লাস নিলেন। একেই বলে সঙ্কল্প। সঙ্কল্প না থাকলে কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না।

এবার তাঁকে ধরলাম—শ্রীঅরবিন্দের "Savitri" পড়াবার জন্য। কিছুতেই রাজী নন। বললেন "ওটা এখন হবে না।"

আলমোড়া থেকে শিলং চলে এসেছেন। শিলংএ ঠিক রাজভবনের পাশেই বিরাট জমি নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। এটা ছিল স্বর্গীয় সোমনাথ মৈত্রের সম্পত্তি—শ্রীমায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রটি ভালভাবে চালান যাচ্ছে না। এটি চালাবার জন্য হিমাংশুবাবু—পাঠমন্দিরের সভাপতি—অনির্বাণজীকে অনুরোধ করলেন। কিছুতেই রাজী নন, অনেক ধরাধরির পর রাজী হলেন। শিলং-এর পাঠমন্দিরের পাশেই, নিজস্ব একটি ছোট বাড়ী তুললেন। পাঠমন্দির দেখাশুনার ভার নিয়েছেন। ফুল, ফল, সব্জীর সুন্দর বাগান করে ফেললেন—অল্প কয়েকমাসের মধ্যে। ফুলের বাগান বানাতে সিদ্ধহস্ত—প্রচুর culture করেছিলেন। তখন বেদমীমাংসা লিখছেন, পাঠমন্দিরে এবং নিজের বাড়ীতে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিলং পাঠমন্দির গমগম করে উঠলো। নিজে রান্না করে খান, মাঝে মাঝে অতিথিদের নিমন্ত্রণ করেও খাওয়াতেন। হিমাংশুবাবু ওখানে গেলে তাঁকে ডেকে বলতেন, "আপনি আমার কাছে খাবেন যে ক'দিন থাকবেন—তবে নিরামিষ, একটু অসুবিধা হবে।" কী সংবেদনশীল হৃদয়—জানতেন পাঠমন্দিরে খাবার ব্যবস্থা নেই, তাই তাঁর ভাবনা বেচারা খাবে কোথায়। শুনেছি তাঁর হাতের রান্না—স্বাদ অপূর্ব—অমৃত। আবার ভোরবেলা নিজের হাতে এক গ্লাস বেলের পানা হিমাংশুবাবুকে ডেকে দিয়ে যেতেন—নিজে খেতেন কিনা! এটা তাঁর চায়ের বিকল্প—হিমাংশুবাবুর নয়—তিনি তো চা-খোর—চাবাগানের মালিক।

একদিন ভোর বেলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হিমাংশুবাবু অনির্বাণজীকে বললেন "আমি তো শ্রীঅরবিন্দের সাধনা, ধ্যানধারণা কিছুই বুঝি না, করিও না, তাহলে...।" অনির্বাণজী বিদ্যুতের মত সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"এ কথা বলছেন কেন? আপনি তো মাকে ধরে আছেন—তাই যথেষ্ট।"

এত কাজের ভিতর ঠিক মাসের শেষে পাঠমন্দিরে আয়-ব্যয়ের হিসাব দিয়ে একটি ছোট্ট report পাঠাতেন এখানে—খুঁটিনাটিভাবে, guest charge কত আদায় হয়েছে, কটা কুমড়ো, লাউ, মায় ক'ঝুড়ি গোবর বিক্রী করে আয় হলো ইত্যাদি আয়-ব্যয়ের হিসাব। একবার তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, "আপনি যতো কাজকর্ম করবার সময় পান কি করে? লিখছেন, পড়ছেন, পড়াচ্ছেন, বাগান করছেন, রাঁধছেন—তাছাড়া এতো খুঁটিনাটি হিসেব।" লিখলেন, "গুরুমুখে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে

শিখেছি। আমার অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রকে জানলে পরিধি হাতের মুঠোয় আসে—ভাবকে চিনতে পারলে রূপ আপনি ধরা দেয়।" বেদ-মীমাংসা শেষ করলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাপালেন। রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন।

শিলংএ থাকতে তখন ওঁর বয়স বোধহয় ৬৮। Becoli হয়েছে—খুব ভুগছেন। আমায় লিখলেন—এবার ছুটি নেব। আমি সেই চিঠি পেয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। নলিনীদা আমায় লিখে জানালেন—মা বলেছেন "He is only 68, No, he cannot go now. He will have to do lots of work for me—অনির্বাণজীকে লিখলাম—আপনার ছুটি মা মঞ্জুর করলেন না।

কিছুদিন পরে জানালেন—ছুটি হল না যখন, এবার কলকাতায় গিয়ে সাবিত্রীর উপর ক্লাস নেব। কয়েক মাস পরে সব গুটিয়ে কলকাতায় চলে এলেন।

সেই থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে সাবিত্রী এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগের উপর alternate শনিবারে পাঠমন্দিরে ভাষণ দিয়ে গেছেন। সুধা বসু যোগের উপর তাঁর ভাষণ note করে নেতেন আর সাবিত্রী টেপ রেকর্ডে ধরা থাকতো। যোগের উপর সুধা বসুর লেখা বক্তিকাতে ধারাবাহিক ভাবে বেরুত। সেই লেখা থেকে "শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগ" বই ছাপান হল। বলতেন, সাবিত্রী বোঝা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এ হল আর একটি বেদ—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

আমরা তাঁকে অনেক আলাতন করেছি। যেখানে যখন সভা করেছি উৎসব করেছি সেখানেই হাসিমুখে যেতে রাজী হয়েছেন—ভাষণ দিয়েছেন। কোথায় বেনারস—সেখানে নতুন কেন্দ্র খোলা হবে—সেখানেও গিয়ে তিনি উদ্বোধন করলেন। সকলের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খাওয়া দাওয়া করেছেন কতদিন। এমন কি ভাল সিনেমা, সারকাস এলে তাঁকে যাবার জন্য অনুরোধ করেছি—কোনদিন আপত্তি করেননি। নিজেকে এমনিভাবে বিলিয়ে দিয়ে কতভাবে কত আনন্দ দিয়েছেন। তবে হঠাৎ কোথাও ভাষণ দিতে যাবার কথা বললে কিছুতেই রাজী হতেন না। বলতেন ১।২ দিনের notice-এ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলা অতোই কি সোজা। প্রস্তুতির জন্য অন্ততঃ সাতদিন দরকার। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন—ব্যক্তি এবং বিশ্ব, এ দুটো মিলিয়ে বলতে না পারলে কিছুই বলা হল না। আমাকে একবার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—তুমিও ভালভাবে প্রস্তুত না হয়ে কখনই কোথাও বলবে না।

পাঠমন্দিরকে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন—তা কি আর বলবো। ১৯৬৬ সালে পাঠমন্দিরের রজতজয়ন্তী—মহাজাতি সদনে সাতদিন ব্যাপী মহা উৎসব। এই উপলক্ষে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর ভাষণে বলে গেলেন পাঠমন্দির সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের কথা। ভাষণটি বড়—তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি— "...আজ যে (পাঠমন্দির) তারুণ্যে উপনীত হয়েছে, সে একদিন হবে প্রৌঢ়। কিন্তু কোনদিন সে মরবে না। অনন্ত জীবন তার সম্মুখে। তিলে তিলে এইখানে নরের তপস্যায় নারায়ণের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে। এটা হয়তো আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসকে যদি আমরা পালন না করি তাহলে ভগবানে বিশ্বাস একটা মিথ্যা কথা। এ বিশ্বাস আমার সুখ-সুবিধার জন্য বা ব্যক্তিগত ইষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁর পরম সত্যকে আমার

গভীরে উপলব্ধি করা এবং প্রতিমুহূর্তে সবার মধ্যে তাঁকে বিচ্ছুরিত করা এই জেনে "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"। এই হল নতুন যুগের বাণী। এই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ এই পাঠমন্দিরে যাকে বলতে পারি তাঁরই বাণীপীঠ। তার রজতজয়ন্তী হল তাঁরই দিব্যসঙ্কল্পের রজতজয়ন্তী।"

আমায় ডেকে পাঠালেন—বোধহয় ১৯৬৬ সাল হবে। তখন অনির্বাণজী গৌতম ধর্মপালের কেয়াতলার বাড়ীতে থাকেন, বেদ এবং উপনিষদের উপর নিয়মিত ক্লাস নিতেন। তাঁর কাছে গেলাম—ত ন সন্ধ্যা। ঘর ভর্তি লোক। দেখলাম অনির্বাণজী একটি মেয়েকে আলাপ, বোধহয় উপনিষদের উপর কিছু বোঝাচ্ছেন, পড়ান শেষ হল—মেয়েটি উঠে পড়ল—এবার চলে যাবে। অনির্বাণজী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কবে তোমার পরীক্ষা? মেয়েটি বলল—দু'দিন পরে। M.A. পরীক্ষা দিচ্ছে। অনির্বাণজী তাকে বললেন—আমি যা বলুম সে সব কথা পরীক্ষার খাতায় খবরদার লিখতে যেওনা—লিখলে নম্বর পাবে না। একটু চুপ করে থেকে বললেন—আমাদের সময় হলে এ কথা বলতাম না। ইংরেজ অধ্যাপকরা কিন্তু এদিক দিয়ে খুব উদার ছিলেন। একটা গল্প বলি শোন—আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের ইংরেজি পড়াতেন একজন ইংরেজ। একদিন ক্লাসের শেষে তিনি বলে গেলেন আমি যা তোমাদের বললাম, এর উপর তোমরা কাল একটা Essay লিখে আনবে। পরের দিন আমরা তাঁর হাতে আমাদের খাতা দিলাম। তার পরের দিন ইংরেজি ক্লাসে সাহেব সকলকে এক এক করে ডেকে খাতাগুলো ফেরৎ দিলেন—আমায় ডাকলেন না। ক্লাস শুদ্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম সাহেব আমার উপর নিশ্চয়ই রেগে গেছেন—রেগে যাবার কথাই, কারণ তিনি যা যা বলেছিলেন, সবটাই তার উল্টো লিখেছিলাম—একটা সত্যের ভিত্তিতে। ক্লাস শেষ হল—তিনি গটগট করে চলে যাবার সময়—আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "See me at my chamber." গেলাম তাঁর chamber-এ—বসতে বললেন। বললেন, "তুমি Sanskrit Hons. ছেড়ে দিয়ে English Hons. নাও—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি যা লিখেছ তা আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি English Hons. নিলে shine করবে।" আমি বললাম, "তা হয় না স্যার, সংস্কৃত আমার প্রাণ—আমি ছাড়তে পারব না।" খুব ঝুলোঝুলি করলেন। আমি রাজী হলাম না। এই হল আমাদের আমলের কথা। এখন Syllabus-এর বাইরে লিখলে নম্বর পাবে না।

এবার আমায় ডেকে বললেন—"আমি পণ্ডিচেরী যাব ঠিক করেছি শ্রীমায়ের দর্শন করতে। তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও।" আশ্রমে অল্প দিন ছিলেন—শ্রীমায়ের দর্শন হল।

কোন সম্প্রদায় বা dogma তাঁকে কখনই বাঁধতে পারেনি। মনে হতো সব সময় যেন খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। শয্যাগত অবস্থায় দেখেছি একটা তীর যেন পড়ে আছে। সত্যই তিনি কথা বলতেন এমন যা মর্মকেও বিদ্ধ করে যেন বোধে গিয়ে পৌঁছয়। সাত বছর শয্যাশায়ী—শুয়ে শুয়েও প্রচুর লিখতেন, পড়তেন। রোজ বিকেল-সন্ধ্যায় ভীড় জমতো—প্রশ্ন-উত্তর চলতো। ক্রমশই শরীর ভেঙে পড়ছে—কোন অভিযোগ নেই, নির্মম দর্শক। চিন্ময় দীপ্তির বীর্য ও আনন্দের পরম ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর নীরব নিত্য

অভিযান—কিন্তু বহুমুখী বৈচিত্র্যকেও তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে চলেছেন। কোন চাহিদা ছিল না—না বহির্জগতে না অন্তর্জগতে—মায়ের কোলে শিশুর মত।

একটি ছোট খাটে শুয়ে থাকতেন—ঘরের চতুর্দিকে কেবল বই আর বই। কত বিষয়ের বই, কত ভাষার বই। কত পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সারাজীবন নানা জায়গায় থেকেছেন। যেখানেই থেকেছেন নিজের প্ল্যানে ছোট্ট বাড়ী তুলে নিতেন—বাড়ীর নাম দিতেন 'দৈনবতী'—তাকে নিজের মনের মত সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে রূপসী করে তুলতেন। কিন্তু একটানা বেশিদিন কোথাও থাকতেন না—কয়েক বছরের মেয়াদ। তারপর অন্যত্র। সঙ্গে চলেছে কেবল তাঁর চলমান গ্রন্থাগার। বাউলের মত বাঁধব না, বাঁধতে দেব না। তাঁর সব বই—২৬০০ বই, শ্রীঅরবিন্দ ভবনকে দিয়ে গেলেন। অমূল্য সম্পদ।

অনির্বাণজীর অশীতিতম জন্মদিনে পাঠমন্দিরের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই লেখা কবিতার সংকলন—'কাবেরী'। যার ধারায় বিধৃত হয়েছে "কবির স্বপ্ন, কবির জীবন-দর্শন, জড় হতে চৈতন্যে, সুরতি হতে নিবৃতিতে, আধার কমল হতে সহস্রারে উত্তরণের লীলাবিলাস। যার চপল ছন্দে রণন কবির—

"মৃত্যুর পীতাভ সৈকতে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়ে চলেছে
নীলাঞ্জনার আকাঙ্ক্ষায় ভালবাসার উন্মীল নওরী ॥

যুগযুগান্তর ধরে যা রইবে অম্লান চেতনার দিব্যবসন্ত-লোকে।

তাঁকে দেখে মনে হত মূর্তিধরা ঘনীভূত ভাব। তাঁর মহাপ্রয়াণে তাই বাতাস মধুর বইছে—স্রোতস্বিনীরা মধু ক্ষরণ করছে। তাই বলি তাঁর আবির্ভাব মধুর, অবস্থান মধুর, তিরোধানও মধুর।

প্রতিদিনের দর্শন

সমীরকান্ত গুপ্ত

ফরাসীতে একটি সুন্দর কথা আছে—এগিয়ে যাবার জন্য পিছিয়ে আসা, reculer pour micux sauter. বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবচনটির বেশ সার্থকতা মনে হতে পারে।

তিন যুগ আগে পণ্ডিচেরী শহরের কি অবস্থা ছিল তা একবার বলেছি। বেশির ভাগ বাড়িই—বিশেষত: black town বা কালো পাড়ার—ছিল country tiles বা খোলার ছাতের নিচু নিচু বাড়ি। এখনকার মতো বহুতলা কংক্রিটের অট্টালিকা আদৌ চোখে পড়ত না। এখন কালো পাড়ায় নোটিভ অঞ্চলেও অগণিত তিন-চারতলা বাড়ি দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে সাততলা আধুনিকতম। বাড়ির সঙ্গে, রিক্স বা পুষ্পপুষ্প সরিয়ে দিয়ে, গাড়িও বহু ধরণের এবং অজস্র দেখা দিয়েছে। এত যানবাহনের দ্রুত প্রবাহে dust pollution এবং sound pollution প্রতিবেশির মতো সন্নিহিত হয়ে উঠেছে। এর পর আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে রকেটারি বিমানের আওয়াজ দিনে রাত্রে শোনা যাবে—ইতিমধ্যেই তার ভূমিকা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা সেই নিস্তব্ধ পণ্ডিচেরী বহু দূরে ফেলে এসেছি—রীতিমতো আধুনিক যুগের বাসিন্দাই হয়ে উঠেছি।

আজকের নয়, সেই স্বল্পালোকিত স্বল্পজনাশ্রিত অপেক্ষাকৃত গ্রাম্য পণ্ডিচেরীতে ১৯৪০-এ আশ্রমে আমাদের নিজস্ব কোনো গেষ্ট-হাউস বা হোটেল দেখা যায় নি—প্রাচীনতম গণপতরাম পর্যন্ত নয়। অতিথিদের জন্য হট্টমন্দির অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজনমতো সাদাসাটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হতো। ভোজনং যত্র-তত্র মোটেই চলত না—তার জন্য ছিল অনতিক্রমণীয় ডাইনিং রুম, আমাদের সমবেত ভোজনশালা। যুদ্ধের দুঃসময়েও আমাদের এখানকার আহার্য ছিল প্রচুর, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। আজ তো সর্বত্র শোনা যায় সুখাদ্যেও স্বাদ নেই—ভেজালের কল্যাণে, রাসায়নিক সারের উত্তেজনায় আর pesticide-এর ব্যাপক বর্ষণে কপি আর কচু একে অন্যের স্থান নিতে পারে। অত্যুক্তি হতে পারে, তবে একথা সর্বৈব মিথ্যা নয়। সেই যুগে আশ্রমিকদের দিনপঞ্জী কী ছিল? আশ্রমের জীবনধারার কী রূপ ছিল?

বলতে হয়, সে এক নির্ভেজাল জীবনধারা ছিল। সে-জীবন ছিল, এক কথায় বলতে পারি—মা'কে ঘিরে, মা'কে ধরে। কথাটি ফিগারেটিভ অর্থে বা অলংকার হিসাবে বলা হল না, তত্ত্বগতভাবেও নয়; বলা হল নিতান্ত বাস্তব সত্য হিসাবে। মা আশ্রমিকদের কাছে কতবার দেখা দিতেন, প্রণাম নিতেন এবং আশীর্বাদ দিতেন; আশ্রমিকরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কাছে মুহূর্তের জন্য ছুটে আসতেন। এক অন্তরে পাওয়া, আর এক বাহিরে পাওয়া—এক অন্তরে সিদ্ধি, আর এক স্থূল ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের মাহাত্ম্য—এই দুই রকমে এসেছে অমৃতবন্ধনের স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল। লৌহশৃঙ্খলও আমাদের কিরকম উপাদেয় হয়েছিল—শৃঙ্খল তা আমাদের আদৌ মনে হত না—সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

প্রথমে উল্লেখযোগ্য বছরের বিশেষ চারটি দিন—চারটি দর্শনের দিন—যখন মা

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাধক ও নির্বাচিত ভক্তদের সামনে দেখা দিতেন। এ ছাড়া রোজকার জীবনও ছিল মায়ের দর্শনে পরিপূর্ণ। সাধকদের দিন শুরু হতো ভোর সোয়া ছ'টায় ব্যালকনি (balcony) বা অলিন্দ-দর্শন দিয়ে। তখন মায়ের ঘর ছিল দোতলায় সাজিগাছের গায়ে। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে (এখন যার পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে তিনতলায়) একখানি ডিভান (divan) ছিল—যেখানে বসে তিনি কাজ করতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। প্রতিদিন ভোরে করিডর (couloir) পার হয়ে পবিত্রদার আপিস ও শয়নকক্ষের সংলগ্ন বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন—সদর রাস্তায় জনতার মেলা দেখা যেত বহুদূর অবধি। চারিদিকে ভক্তদের দেখে তিনি স্থির ধ্যাননগ্ন হয়ে দাঁড়াতেন একটুক্ষণ, তারপর অপরূপ উদার হাসি উপহার দিয়ে এক পা এক পা করে পিছন হটে ঘরে ঢুকে যেতেন। এই রকমে আরম্ভ হতো আমাদের কর্মসূচী।

ব্যালকনিতে আসা-যাওয়ার পথে কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন মা, তাদের প্রণাম নিতেন এবং কখনো কখনো আলাপও করতেন। এদের মধ্যে থাকতেন পৃথ্বী সিংহ মহাশয়ের ছেলেমেয়েরা—তাঁরা ছোটদের মধ্যে প্রায় প্রথম আগন্তুক, এবং কাজ করতেন পবিত্রদার সঙ্গে।

ব্যালকনি-দর্শনের ঘন্টা দেড়েক পরে মা একবার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেন দরজা খুলে—কিছু লোক প্রণামের সুযোগ পেতেন। অপেক্ষমাণদের মধ্যে সর্বাগ্রে থাকতেন ফুলের যতীনদা—তিনি ফুলবাগানের কর্তা এবং ফুলের ঘরেরও দায়িক। মাঝরাত্রি থেকে তাঁর কাজ শুরু হতো। তিনি যেরকম নিমগ্নভাবে বসতেন তাই দেখে চারুচন্দ্র দত্ত তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'দাই বৎস্য'—চীনাতে নাকি বুদ্ধের ঐ নাম। যতীনদার পরেই থাকতেন চারুদা এবং তার পরে আমরা কতিপয় অন্যরা। চারুচন্দ্র দত্ত সেকালের আই-সি-এস এবং শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবাত্মক কর্মধারার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি চমৎকার আলাপী—বিদগ্ধ তো বটেই। বোম্বাই প্রদেশে চাকুরী করে মারাঠিতে নির্দোষ অধিকার অর্জন করেছিলেন—তাঁর 'রামদাস ও শিবাজী' গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফল। তাঁর 'পুরানো কথা' ও 'পুরানো কথার উপসংহার' শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিতর্পণ। তিনি আমাদের পত্রিকা 'বার্তিকা'য় শ্রীঅরবিন্দের সমাজতত্ত্বের বিবর্তন সম্বন্ধে লেখার তর্জমা করছিলেন। তাঁর রচনার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল। সেটি ঋজুতা ও স্পষ্টতা। তাঁর প্রকৃতিতেও তা ফুটে উঠেছিল। কর্মজীবনে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে নেতৃত্বে বরণ করেছিলেন। রাজনৈতিক যজ্ঞে শ্রীঅরবিন্দের অভাবে তাঁর অভিমান জমেছিল—তাঁরা যেন অসহায় পরিত্যক্ত হলেন। যখন পরবর্তীকালে বুঝলেন গুরুর সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা তখন দূর হল তাঁর অনুযোগ অভিমান। তিনিও এসে পণ্ডিচেরীতে তাঁর শরণাপন্ন হতে চাইলেন। কিন্তু দত্ত সাহেব পাইপ চুরুটের অভিন্ন সঙ্গী—আর ও-বস্তু আশ্রমে অচল। মা ধূমপান একেবারে পছন্দ করতেন না, বলতেন—ওতে চেতনা আবিল আচ্ছন্ন করে দেয়, ও জিনিস তাঁকে একান্ত পীড়া দেয়, 'cela me dégoût le plus.' শ্রীঅরবিন্দ রহস্য করে তাঁর আবেদনের উত্তরে হেসে মন্তব্য করেছিলেন—চারু খাসতে চায়, তবে তার পাইপের কী হবে? কথাটা চারুদার মনে লেগেছিল। তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখলেন শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে যে তাঁর পাইপের মনিব তিনি, পাইপ তাঁর মনিব নয়। উত্তরটা মায়ের পছন্দ হয়ে-

ছিল এবং তিনি এখানে এসে আশ্রমবাসী হবার অনুমতি পেয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন চির-দিনের মতো পাইপও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনা করে-ছিলেন বহুকাল—ছাত্রদের তিনি হৃদয় জয় করেছিলেন পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে।

আমরা তরুণরা ঘুরে ফিরে গাড়ে আটটায় হাজির হতাম সাতিন গাছের তলায় ছোট বাগানটিতে। মা এসে খুলতেন তাঁর ঘরের দুটি জানালার খড়খড়ি—সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যেত তাঁর মুখখানি। একবার উঁকি দিয়ে তিনি চলে যেতেন তাঁর কাজে।

প্রায় দশটা নাগাদ আবার তাঁর দর্শন মিলত—যখন তিনি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার ছাদে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সঙ্গী থাকত চিন্ময়ী, হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন পবিত্রদার আপিসঘরের প্রান্ত পর্যন্ত—তাকিয়ে দেখতেন 'আশ্রম-প্রাঙ্গণে' (courtyard) অপেক্ষমাণদের, আর অসীম দূরান্তরকে। নীল আকাশের নিচে ফিকে রঙের ছাতা মাথায় তাঁকে মনে হোত ঐ আকাশলোকেরই দেবী—গ্রহ উপগ্রহদের সঙ্গে কানে কানে কথা বলছেন, তারাদের যেন হাত ধরে দুলিয়ে দিচ্ছেন, অনন্তের নিঃশ্বাস মলয়কে যেন অঙ্গ-স্পর্শে অনুগৃহীত করে প্রাণে প্রাণে ঢেলে দিচ্ছেন।

প্রখর দ্বিপ্রহরে মায়ের আর একটি দর্শন ছিল। এটির নাম হয়েছিল আনাজ-দর্শন (Vegetable darshan)। আশ্রমের যত বাগানের শাকসবজি ফলমূল ঝুড়িতে ঝুড়িতে ও ডালায় এনে সাজিয়ে রাখা হতো সমাধির পাশ দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ির সামনে বারান্দায়। বাগানের কর্তারা সকলে হাজির থাকতেন—যতীনদা, তাঁদের অগ্রগণ্য, লক্ষ্মী-বাই, নির্মল এবং অন্যান্য কর্মীরাও অনেকে উপস্থিত হতেন। সব খুঁটিয়ে দেখে কোনটি কোন হেঁসেলে যাবে কিম্বা ছিনঘরে, তার নির্দেশ দিতেন মা। মনমতো হলে কোনো জিনিস তিনি নিজেও স্বহস্তে তুলে নিয়ে যেতেন। তারপর উপস্থিত যাঁরা থাকতেন তাঁদের একটি করে আশীর্বাদী ফুল উপহার দিতেন। এ কাজের জন্য গাঁদাফুল ছিল তাঁর বেশি পছন্দ—তা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। গাঁদাফুলের অর্থ দিয়েছেন মা 'নমনীয়তা' (plasticity)। সাধনার ভিত্তিই হল এই নমনীয়তা। কঠিন আড়ষ্ট (rigid) আধার যাদের, নূতনকে গ্রহণের পক্ষে তাদের দারুণ অসুবিধা—নিজেকে ভেঙে গড়তে অনেক সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এই নমনীয়তা নূতনকে সাদরে বরণ ও গ্রহণ করতে পারে। এই যোগের পথে তাই তার এত সমাদর।

বেলা প্রায় দেড়টায় আর এক দর্শনের সভা বসত। এটা ছিল ছোটদের জন্য দর্শন। তারা সবাই সমবেত হত Meditation hall-এ। অন্যরাও যাঁরা পারতেন হাজির হতেন। মা নেমে আসতেন এক থালা টফি নিয়ে। সবাই যার যার জায়গায় বসে থাকত। মা প্রত্যেকের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতেন টফি—একটি, দুটি, কখনো একসঙ্গে তিনটি। লোফালুফির কসরত দেখে কৌতুকোদ্ভাসিত হয়ে উঠত তাঁর মুখ। তরুণদের কেউ সব কটি টফি লুফে নিতে পারলে তিনি তার রীতিমতো তারিফ করতেন। আমাদের ঐ দলের মধ্যে যিনি প্রায়ই একটিও ধরতে পারতেন না, এবং ফলতঃ করুণ বিস্তৃত মুখচোখে তাকিয়ে হেসে ফেলতেন তিনি অমৃতদা। মা সে-দৃশ্য স্নেহভরে দেখতেন, ভাবখানা—বেচারা অমৃত!

তখন বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) ডামাডোল শুরু হয়েছে। চতুর্দিকে দ্রুত দৈনন্দিন

কর্মসমাপ্তির তাগিদ। নিশ্ছিদ্রীপের কড়া ব্যবস্থা সর্বত্র। আমাদের ডাইনিংরুম তখন খোলা হতো বিকেলে একবার—সোয়া পাঁচটায়। এটাই ছিল নৈশভোজন বা ডিনার। যাঁরা অতিথি আসতেন তাঁদের অসুবিধা হতো নিশ্চয়—অনেকে রুটি কলা ঘরে রাখতেন, প্রয়োজনমতো রাত্তিরে সদ্ব্যবহারের জন্য। আমাদের ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ডাইনিং রুম থেকে ভোজনান্তে সবাই আশ্রমে আসতেন। সাড়ে ছটার ছিল সমবেত ধ্যান—ধ্যানঘরে—অমৃতলাল আপিসের সামনে 'মেডিটেশান হলে'। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় মা নেমে এসে সিঁড়ির মাঝখানে বড় ঘড়িটার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াতেন। খুব স্তিমিত আলোয় একটা অলৌকিক পরিবেশ রচনা হয়ে যেতো। মিনিট দশেক পরে মা উঠে যেতেন—দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আর এক দর্শনের জন্য। এবার সবাই তাঁকে প্রণাম করতে পারত। প্রত্যেকের বেলা নুয়ে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের পর মা তার হাতে একটি ফুল দিতেন। ক্রমে সাধকদের সংখ্যা বেড়ে ওঠাতে মেডিটেশান হলে আর স্থান সংকুলান হলো না। স্থান পরিবর্তিত হয়ে এই সান্ধ্য ধ্যান আরম্ভ হ'লো সাতিস গাছের তলায় চত্বরে, কোর্ট ইয়ার্ডে। মা এসে দাঁড়াতেন দ্যুমনভাইয়ের ঘরের ছাতে দক্ষিণ প্রান্তের প্যারাপেট ঘেঁসে। এই ধ্যান ও প্রণাম এসে পেছিয়ে মধ্যরাত্রে পৌঁছেছিল। মা কোন এক লোকে কী এক গভীর রহস্যে মগ্ন ছিলেন, মানুষী কাল সেখানে বোধ হয় থেমে গিয়েছিলো। কাউকে আশীর্বাদ দিতে দিতে ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন—কখনো কখনো এরকমে ঘন্টাখানেক কেটে যেত। কখনো এই রকম চলতে চলতে রাত বারোটা পার হয়ে যেত। মা তখন হেসে বলতেন, 'সুপ্রভাত'! রাত আর দিন অনিভাবে এক হতে পেরেছিল—শাস্ত্রে তো বলেছে, অন্য সকলে যখন ঘুমায় যোগী তখন জেগে থাকেন। সন্ধ্যায় অন্যদের যেখানে ঘুমের রাজত্ব ও দাপট, যোগী সেখানে অতন্দ্র জাগ্রতকে বসিয়েছেন—তাঁর দিনরাত্রির হিসাবই অন্যরকম। এই রাত্রির আশীর্বাদে মা মুঠো ভরে দিতেন জুঁই ফুল।

আরও দু'টি দিনে মায়ের বিশেষ দর্শন পাওয়া যেত। একটি, দর্শনের দিন কাক-ভোরে, অন্ধকার না কাটতেই। এতে অধিকার ছিল প্রধানত আশ্রমিকদের। দ্বিতীয়টি, ঠিক, দর্শনের পরের দিন। সকলেই সেদিন যেতে পারতেন—দর্শনে নিবেদিত ফুলের ও 'নবজন্মের' (new birth) মালাগুলি মা বিলি করে দিতেন সকলকে।

আর একটি দর্শন ছিল মায়ের—তার নাম হয়েছিল cow-darshan। আশ্রমের জন্য যে দুধ নেওয়া হতো তা কোন্ গোরুর—নিজে একবার তিনি দেখতেন। ক্রমে আশ্রমের ডেয়ারী আরম্ভ হল—১৯৪২এ যে প্রথম সাদা গোরুটি কিনে আনা হয় জলপনার ডেয়ারীর জন্য, তাকে ব্যালকনির তলায় আনা হতো প্রতি রবিবার এবং বারান্দার উপর থেকে মা তাকে দেখতেন। এই গোরুর সঙ্গে একটি লম্বকর্ণও উপস্থিত হতে থাকল। উদার এটি শহরে কারো কাছ থেকে মায়ের জন্য উপহার পেয়েছিলেন। নেহাৎই শিশু এসেছিল সে—কৃষ্ণলালের আঁকা পোস্টকার্ডে চিত্র আছে তার। বালক রিচার্ড ছিল তার তত্ত্বাবধায়ক। মা তার নামকরণ করেছিলেন 'বোদে' (Baudet)। ফরাসী বোদে কথাটির অর্থই গর্দভ। বড় হয়ে উঠতে তার জন্য জায়গা নির্বাচিত হলো নূতন-ডেয়ারীর (Nouvelle-baiterie) খোঁয়াড়ে। 'বোদে'র যেমন স্বাস্থ্য তেমনি দুরন্ত প্রাণশক্তি। সে মাঝে মাঝেই বেড়ার অনুচ্চ গেট টপকে দু'তিন দিনের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। আনর্কস

দোদে বর্ণিত মঁসির সেওয়্যার স্বাধীনচেতা ছাগলের মতো বোদেরও খুঁটিদড়ি হয়ত অপছন্দ ছিল। একদিন সে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে গেল—চিরদিনের মতো। অনেক চেষ্টারও তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

এ পর্যন্ত দর্শন ছিল সুনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট—আশ্রম সীমানার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যেত, দিনরাতের বিভিন্ন সময়ে। এবার সর্বাধুনিক কালে মা চলে এলেন খেলার মাঠে স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে, টেনিস মাঠে, খেলার মাঠে (play ground) সক্রিয় অংশ নিয়ে—খেলাধূলায়, উন্মুক্তপ্রাঙ্গণ-ক্লাসে, মাঠের ধারে ও সিনেমা দেখায় তিনি এসে দাঁড়ালেন জনতার মাঝখানে—এখানে তাঁকে দেখা যেত দীর্ঘ সময় ধরে, দর্শন যেন তিনি দিলেন অফুরন্ত সময় ধরে, একান্ত কাছে এসে। আশ্রম থেকে তিনি বের হতেন বিকেল সাড়ে চারটায়, ঘরে ফিরতে ফিরতে তাঁর রাত ন'টাও বেজে যেত।

তখন আশ্রমে কথিত ও লিখিত ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ছিল আর একটি বিস্ময়কর ভাষা—ফুলের ভাষা। এ-ভাষা মায়ের তৈরি। এ ভাষায় তিনি বেশ কথা বলতেন সাধকদের সঙ্গে। প্রত্যেক ফুলের তিনি দিয়েছিলেন আন্তর অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম (occult) অর্থ। মায়ের দেওয়া ফুলের তাৎপর্য ধরে বাক্যরচনা চলত, মা বুঝে নিতেন সেই অর্ঘ্য-নিবেদনের ভাষা,—তাঁর উত্তরও ছিল আশীর্বাদী একটি বা অনেকগুলি ফুলের মাধ্যমে। এই রকমে একটা নীরব ও অভ্রান্ত বোঝাবুঝির লোক রচিত হয়েছিল। ফুলের একটা নিহিতার্থই শুধু ছিল না, আবার দেখিয়েছেন তার ভূমিকা (role)—প্রকৃতিলোকে যে নিভৃত অভিযান চলেছে উর্ধ্বের ডাকে দিব্যের অভিমুখে তাতে তার আছে প্রেরণা দেবার, ইঙ্গিত দেবার আনুকূল্য করার। প্রকৃতির মধ্যেও যে অভীপ্সা চলেছে, মানুষী চেতনার মনান্তরাল ধারায়—ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ ফুলের আবির্ভাবে তারই ইঙ্গিত। একদা পণ্ডিচেরী ছিল অনুর্বর—তখন সাধারণ ফুলেরই কিছু পরিচয় পাওয়া যেত। মায়ের প্রয়োজনে ক্রমে দুর্লভ ফুলও ফুটতে লাগল। এখন এমন ফুল নেই যা এখানে জন্মানো যায় না। যা একটা সম্ভাবনা মাত্র তাই একটা বাস্তব সিদ্ধির মধ্যে এসে পৌঁছালো। যে ফুল তাঁর প্রয়োজনে ফোটে তা তাঁর অলৌকিক দৃষ্টির সামনে, যে অজানা ফুল তাঁর কোনো উদ্দেশ্যে চাই তারও রূপ তাঁর জানা। কোন্ বনজঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা অজ্ঞাত অখ্যাত ফুল দেখেই তিনি তার মর্মের বাণীটি উন্মোচিত করে দিতেন। আমাদের মালাকাররা এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারেন।

একটি সুন্দর কাহিনী দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করব।

আশ্রমের ফুলের বিভাগের প্রধান যতীনদা একদিন ভোরে মায়ের কাছে প্রণামে গিয়েছেন। মা তাঁকে দেখেই বললেন—যতীন, Realisation ফুলের একটি গুচ্ছ আমার চাই—জরুরী প্রয়োজন।

সে সময়টা এখানে শীতকাল—Realisation বা কৃষ্ণচূড়া এদিকে কোথাও দেখা যায়না। তবু যতীনদা ও তাঁর বন্ধু সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ-ছ' মাইল দূরে লেক অঞ্চলে কিছু এগাছ ছিল। তাঁরা একটি একটি করে প্রত্যেকটি গাছ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও এই ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। ক্লান্তদেহে হতাশ মনে ভরা-দুপুরে যতীনদা ফিরে এসে ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী মা'কে জানালেন। তবে আশ্বাস দিলেন,

আবার খেয়েদেয়ে যাচ্ছেন আরিগাকুপ্পমের দিকে আমাদের পরিচিত দ্বিতীয় নদীর (second river) আশেপাশে। মা দ্বিতীয় প্রস্তাবে যেন কর্ণপাতই করলেন না। একটু চিন্তিতভাবে মৃদুস্বরে বললেন, "লেকের ওদিকে তাহলে পেলেনা ? ভালো ক'রে খুঁজেছিলে তো !" যতীনদা মায়ের কাছ থেকে নেমে এলেন।

তাঁর কি রকম খটকা লাগলো মায়ের কথায়। দ্বিতীয় নদীর দিকে না গিয়ে কলকাতার বন্ধুকে নিয়ে আবার গেলেন লেক অঞ্চলে। আবার সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিক্রমা ও পর্যবেক্ষণ। হঠাৎ তাঁর চিৎকার শোনা গেল, "রাজেন, শিগ্‌গির এসো"। এ যেন বাঘ দেখে চিৎকার। আগে এই গাছেরই তলায় কতবার তিনি দাঁড়িয়ে উপরে খুঁজেছেন ফুলটি। এবার দেখা গেল সবুজ ঘন পাতার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণচূড়ার তিনটি গুচ্ছ তিনটি ডাঁটিতে। যতীনদা চটপট গাছে উঠে পড়লেন এবং দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে নামালেন ফুলটি। আশ্রমে এসে সোজা গিয়ে মাকে ফুলটি নিবেদন করে জানালেন সাফল্যের ইতিহাস। মা শুনে একগাল হেসে বললেন, "আমি তো বলেই ছিলাম" ('I told you!')

প্লাবন-পথে নবদ্বীপ

রাণী মুখোপাধ্যায়

রাণী মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপ বঙ্গবাণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং বঙ্গবাণী প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সদস্যা। সরকারী দপ্তর থেকে স্কুল-কর্মীদের বেতন আনবার জন্যে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। দুর্গাপূজার ছুটির পূর্বেই সকলের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দেওয়া তাঁর অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছানোর পরেই আরম্ভ হলো প্রবল বর্ষণ, প্রলয়-প্লাবন। ট্রেন-চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অভূতপূর্ব এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দুঃসাহসিক যাত্রা ক'রে কিরূপে তিনি যথাসময়ে নবদ্বীপে পৌঁছে কর্তব্যপালন করেছিলেন, তারই বিস্ময়কর বিবরণ।

—সম্পাদক

সেদিন মঙ্গলবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর। বেলা তিনটায় স্কুলের দরকারী কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে বঙ্গবাণী থেকে রওনা হলাম নবদ্বীপ ষ্টেশনে। পরদিন একটায় ট্রেনে কিংবা দুটো পঁচিশের জনতা একসপ্রেসে বিকেলে নিশ্চিত নবদ্বীপে ফেরবার কথা। সারাদিনই দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—ছাতাটা সঙ্গে নিলাম। চর্চ তো রাত্রের গাড়ীতে গেলে সঙ্গে থাকেই। প্রায় রাত নটায় পৌঁছলাম হাওড়ায়। কলকাতায় প্রতিবারই উঠি টালিগঞ্জের লক্ষ্মীহাউসে। লক্ষ্মীহাউসে সাড়ে নটার আগেই পৌঁছলাম। বৃষ্টিও সুরু হল।

সকালে উঠে দেখি লনে জল জমেছে। সারারাত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। প্রদ্যোত-দা জিজ্ঞাসা করলেন—কি, আজ যাবে কি করে? এখনও তো বৃষ্টি থামছে না।

স্কুলের কাজ সারতে গেলাম রাইটার্স বিল্ডিংএ। প্রধান কাজ সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন বাবদ চেক নেওয়া। দুটি ব্যাংকে বঙ্গবাণী স্কুলের টাকা থাকে—ষ্টেট ব্যাংক আর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন—কোন্ ব্যাংকের উপর চেক দেবো। প্রতিবারই ষ্টেট্ ব্যাংকের চেক নিই। এবারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক। চেক নিয়ে রওনা হলাম হাওড়া ষ্টেশনের অভিমুখে। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি—লোকে লোকারণ্য। সকাল থেকে কোনও ট্রেনই ছাড়েনি। শুনলাম জনতা একসপ্রেস ছাড়বে, যাবে আজিমগঞ্জ অবধি। উঠে বসলাম ট্রেনে।

বেলা পাঁচটা-ছটা বাজলো, ট্রেন আর ছাড়ে না। তারপর ঘোষণা শোনা গেল জনতা একসপ্রেস ছাড়বে না। লাইনের উপর তিন ফুট জল জমে আছে। তবে এক

নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে কাটোয়া স্পেশাল ছাড়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার ছুটলাম এক নম্বরে—ট্রেনে উঠলামও কোনও রকমে। আটটা, সাড়ে আটটা বাজলো, ট্রেন ছাড়ার কোনও লক্ষণ নেই, ইঞ্জিনই লাগেনা। এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে—ঝম্‌ঝম্। অন্ধকারও গাঢ় হয়ে আসছে।

তখন ভাবলাম আর ট্রেনে বসে থাকা উচিত নয়, রাত্রির মত একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্মী হাউসে যেতা যাবে না—রাস্তায় এত জল। ষ্টেশনের বাইরে এলাম। অন্ধকার আর বৃষ্টি। কেবলমাত্র একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তাও লোক ভরতি। জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছে ট্যাক্সি? ভেতরে দু'জন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা ও একটি বাচ্চা ছিল। তাঁরা বললেন—৩০টাকা দেবো বলেছি, যাবো বালীগঞ্জ। কিন্তু ড্রাইভার বলছে—রাস্তায় জল জমেছে, যেতে পারবে না। যতটা যাওয়া যায় তারপর যা হোক করে যেতে হবে। আর বলবেন না, ১৩ ঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে আছি করনওল এক্সপ্রেসে এসে। আমি বললাম—আমাকে পি, জি, হাসপাতালের কাছে একটু নামিয়ে দিয়ে যান ভাই, আমিও খুব বিপদে পড়েছি। ড্রাইভার তখন আমাকে বলল—আপনাকে ২৫ টাকা দিতে হবে। তাই দেবো বলে উঠে বসলাম। পি, জি, হাসপাতালের কাছেই নামলাম, মায়াদির (সেতারী মায়া মিত্র) বাড়ীতে যাব বলে। কাছেই মায়াদির বাড়ী। হাঁটুর উপর জল। রাত্রি সাড়ে নটায় গিয়ে হাজির হলাম মায়াদির কাছে। ওরা আমাকে দেখে বিস্মিত কিন্তু খুব খুসী ওদের বাড়ীতে গেছি বলে। মনে হচ্ছিল, নিজের বাড়ীতেই এসেছি। মা যেখানে আছেন সে তো নিজেরই বাড়ী। ভাবলাম ট্রেন নিশ্চয়ই চলবে কাল সকালে। নবদ্বীপ যেতেই হবে কাল। তারপর সে কি বৃষ্টি সারারাত্রি ধরে। সকালেও নেই তার বিরাম, কোথায় যে এত জল থাকে। বেলা দশটা নাগাদ ওদের কথা না শুনে প্রায় জোর করেই বের হলাম পথে এক হাঁটুর ওপর জল ভেঙে। রিক্সা একটা পেলাম তাতে উঠে বসলাম। যেদিকেই চাই শুধু জল আর জল। রবীন্দ্রসদনের দিকে যেন মনে হচ্ছে এক বিরাট নদী। কি ঢেউ রে বাবা! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাঁচিল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। জগুবাবুর বাজারের দিকে, লোয়ার সার্কুলারের দিকে—কোনদিকেই যাওয়ার উপায় নেই। হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে ঘন্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে রিক্সা চেপেই মায়াদির বাড়িতে ফিরে এলাম আবার কাকভেজা ভিজে। কোথাও নজরে এল না মিনিবাস বা ট্যাক্সি। ট্রাম আর বাস তো গতকাল থেকেই নেই। বিকেল পর্যন্ত চলল সেই একই পরিস্থিতি। সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি বেশ কমে এল—ঝিরঝির করে পড়ছে। ভাবলাম কাল সকালের ট্রেনে নবদ্বীপ চলে যেতে পারবো। এর মধ্যে সারাদিন ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছি নবদ্বীপের ট্রাঙ্কলাইন আর লক্ষ্মীহাউসের ফোনের জন্যে। সব বিফল। খুব অশান্তিও পাচ্ছি নবদ্বীপের জন্য। কেবল মনে হচ্ছে—বান এসে পড়ল না তো। আলমারীতে দরকারী ফাইল কাগজপত্র সব আছে, যদি জল আসে, ওগুলো কেউ সরাতে পারবে না, আলমারীই খুলতে পারবে না, চাবি আমার কাছে। স্কুলেরই বা কি হবে? অন্য সময় যদিও বা কিছু ব্যবস্থা করে আসি, এবার পরদিনই নিশ্চিত ছিদ্রর বলে তেমন কিছু বলেও আসিনি। মাকে ডাকছি কিন্তু ভেতরে অশান্ত ভাব আসছেই। শান্তি পাচ্ছি না কিছুতেই। এভাবে কাটলো আটাশ তারিখ রাত্তির। তারপর উনত্রিশে ভোর ৫টায় চা-বিস্কুট খেয়ে মায়াদির

শাড়ী পরে কেবলমাত্র দরকারী কাগজ ও চেক আর কাঁধের ব্যাগ নিয়ে বের হলাম বাড়ী থেকে হাওড়া ষ্টেশনে যাব বলে। কাঁধের ব্যাগে মায়ের Blessings ও ছবি ছাড়া ছিল শ'-খানেক টাকা, একটা টর্চ, একটা ছোট জলের বোতল আর টিফিন কৌটো। একহাঁটু জল তখনও রাস্তায়, তবে ট্যাক্সি পেলাম, চাইলো কুড়িটাকা ঘুরে ঘুরে যেতে হবে বলে। তাইতেই রাজী হয়ে উঠে বসলাম।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের জায়গা নেই। সব কাউন্টার বন্ধ—টিকিট কাউন্টার, এনকোয়ারী সব। সব প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে। একজন ভদ্রলোককে রেলের লোক মনে হতে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—কি ব্যাপার, ট্রেন চলছে না? বললেন—না, এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য ট্রেন-চলাচল বন্ধ হাওড়া ও শেয়ালদহ সেকশনে। একটু অপেক্ষা করুন ঘোষণা শুনতে পাবেন। এত জল জমেছে—ইয়ার্ডে সব এঞ্জিন জলের তলায়। লাইনে এত জল যে ট্রেন চালাবার কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না জল সরছে, লাইন পরীক্ষা করে এঞ্জিনে জল ঢুকছে কিনা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে তবেই ট্রেন চলতে পারবে।

ষ্টেশনেই একটা বেঞ্চে বসে মাকে ডাকছি আর জিজ্ঞাসা করছি—মা, এখন কি করব বলে দাও। নবদ্বীপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছনো দরকার, খুব মনে হচ্ছে। রাত্রের রেডিওর খবরে শুনেছি, নবদ্বীপে গঙ্গার জল খুব বাড়ছে। অভয়ের বাঁধ ভেঙেছে, বুঝতেই পারছি, ঘরেও জল এসে গেছে। মাসের উনত্রিশ তারিখ। পূজোর মাস। হাতে কারুর টাকা পয়সা নেই। খাবারও বড়ুত নেই, কি করবে সবাই, বুঝতেই পারছি না। আমার হাতে মাইনের চেক্, কোন রকমে গিয়ে পড়লে মাইনের টাকা সব হাতে পেয়ে যেত। নানা দুশ্চিন্তায় তোলপাড় হচ্ছে মন। এমন সময় একটি ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলে "দিদিমণি আপনি?" আমি তাকিয়ে দেখি, নবদ্বীপের হাটে কাপড় বেচে একটি তাঁতী ছেলে, সে আর তার ভাই। তারা মঙ্গলবার হাওড়া হাটে কাপড় বেচতে এসে তিনদিন ধরে হাওড়া ষ্টেশনে আটকে পড়েছে। আবার তখন মনে হলো হাওড়ায় বসে না থেকে এগিয়ে যাওয়ার কথা। ওদের জিজ্ঞেস করলাম—"আমার সঙ্গে যাবে? আমি ভাবছি যে ভাবে হোক ব্যাণ্ডেলে পৌঁছে গেলে ট্রেন পাবো নবদ্বীপ যাওয়ার। ওদিকে তো লাইন খুব উঁচু।" ওরা রাজী হল। আমরা বের হয়ে এলাম ষ্টেশন থেকে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। বাস নেই, দু'একটা ট্যাক্সি আছে। বালীখালের ৫৪নং বাস বন্ধ। রাস্তায় নাকি খুব জল। ইতিমধ্যে লোকও এসে গেছে অনেক—সকলেই ভাবছে বালী যাবার কথা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এল এক মিনিবাস—তাতে আমরা ৩০।৪০ জন উঠলাম বালী যাব বলে। তারপর সে কি ভিড়—ছাদে পর্যন্ত লোক বোঝাই। ওরা টাকার জন্য লোক নিয়েই চলেছে—চলতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত? অবশেষে অতি মন্থর গতিতে সুরু হল তার চলা। আমিও মাকে স্মরণ করতে করতে রওনা দিলাম, জানি না ভবিষ্যতে কি আছে। বেলা ১২টা নাগাদ পৌঁছলাম বালীখাল। ভাঙা রাস্তা, মাঝে মাঝে বেশ জল। বালী এলাম বটে কিন্তু শ্রীরামপুর যাবার বাস নেই। বাস টাণ্ডে লোক বোঝাই। শুনলাম রাস্তায় প্রচুর জল। হঠাৎ দেখি কিছু দূরে একটা বাস দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারে, মনে

হলো কিছু বেরামতের কাজ হচ্ছে। ছেলে দুটিকে বললাম "চল এগিয়ে যাই দেখি, এখানে দাঁড়িয়ে ভিজে কি করব?" সেখানে গিয়ে দেখি বাসটি ৩নং। জিজ্ঞেস করলাম—"ভাই বাস সারার পর কোথায় যাবে?" উত্তর এল "শ্রীরামপুর"। বললাম—"আমরাও শ্রীরামপুর যাবো। উঠে বসব?" "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" উঠে বসলাম তিনজনে। বাস বাস ছাড়লোও আধঘন্টার মধ্যে। পৌঁছলাম শ্রীরামপুর। ওখানে পৌঁছানোর পরই শুনি "চুঁচড়ো, চুঁচড়ো" হাঁক। ২নং বাস যাচ্ছে চুঁচড়ো। আবার উঠলাম তাতে। চুঁচুড়া থেকে কালনা পর্যন্ত বাস যায় আমি জানতাম। ভাবলাম, যদি দেখি ব্যাণ্ডেল থেকে ট্রেন চলছে না, তাহলে কালনা পর্যন্ত বাসে চলে যেতে পারি। তারপর কালনা থেকে নবদ্বীপ বাস আছে।

চুঁচড়ায় পৌঁছে শুনি ব্যাণ্ডেল থেকে কোনও ট্রেন তিনদিন চলছে না। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পর্যন্ত যাওয়ারও কোনও উপায় নেই—ষ্টেশনের নীচেই মানুষ-সমান জল। তবে ব্যাণ্ডেল মোড় পর্যন্ত বাস যাবে। জি. টি. রোডেও প্রচুর জল হয়েছে। তখন ছেলে-দুটিকে নিয়ে একটা মিনি বাসে উঠলাম ব্যাণ্ডেল যাব বলে। ওখানে ডানলপ এস্টেটে আমার এক বোন থাকে। ভাবলাম, ওর কাছে যাই, তারপর ঠিক করি, কি করব।

ব্যাণ্ডেল মোড়ে নামলাম এক হাঁটু জলে। সারা জি. টি রোড জলে ডুবে আছে। কোথাও হাঁটুর নীচে জল নেই। দুটো রিকশা ৬টাকা দিয়ে ভাড়া করে গেলাম ডানলপে বোনের বাড়িতে। বেলা তখন ৫টা হয়ে গেছে। ওরা তো অবাক। বললাম সব ব্যাপার। বোন আগে ছেলে দুটির হাত মুখ ধোওয়ার ও খাবার ব্যবস্থা করলো। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর ও দুজনে চুঁচড়া থানার সঙ্গে কথা বলার জন্য বের হলাম। তখন মনে হল, ট্রেন যদি না চলে, একমাত্র থানাই সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া নবদ্বীপের পরিস্থিতিও জানা দরকার। থানা থেকেই খবর পেলাম, বলাগড় থেকে ভীষণ রকম বন্যা। নবদ্বীপের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। ভীষণ বন্যা হয়েছে ওদিকে। লাইনের অবস্থাও ভাল নয়—জায়গায় জায়গায় খুবই ক্ষতি হয়েছে, কোনও রকম যোগাযোগ নেই। তারপর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন—"আজ রাত্তিরে কোনও ঝুঁকি আপনি নেবেন না। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনেও যাবেন না—ডানলপেই থাকুন। কাল ভোরে বরং ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌঁছবার চেষ্টা করবেন। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আপনাদের ওদিকের হাজার হাজার যাত্রী আটকে রয়েছে, কিছু ব্যবস্থা হতেও পারে—রিলিফ্ ট্রেন বা ওরকম কিছু; আর তা ছাড়া সঙ্গীও পাবেন।" মনে হোল এটাই ঠিক। দেখছি মা যেমনটি দরকার, ব্যবস্থাও করছেন। ফিরে ছেলে-দুটিকে সব বললাম। ওরা ত্রিবেণী পর্যন্ত চলে যেতে চাইল, ওদের আত্মীয় থাকে সেখানে। বাসও চলছে ত্রিবেণী পর্যন্ত। ওদের ছেড়ে দিলাম, তবে বলেও দিলাম, অসুবিধে বুঝলে ফিরে আসবে।

রাত্তিরে রইলাম ব্যাণ্ডেলে। ভোর চারটেয় উঠলাম। বোন গরম জল দিল, চান করলাম খুব ভালো করে। কাপড়ও দিল। তারপর লুচি বেগুনভাজা খেয়ে, জলের বোতলে জল ভরে রওনা দিলাম পাঁচটার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের দিকে। সঙ্গে রইল

ওর বড় ছেলে। উদ্দেশ্য—ট্রেন না চললে আমাকে ফিরিয়ে আনা। তখনও রাস্তায় জল আছে। ষ্টেশনের নীচে তখন প্রায় মানুষ সমান জল। কোনও রকমে লাইনের ওপর দিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলাম। ট্রেনের কোনও খবরই নেই। রেলওয়ের কোনও লোকই দেখলাম না, কেবলমাত্র দুজন রেলওয়ে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করা হোল ট্রেনের কথা। কোনও খবর নেই, ট্রেন চলবে না। ইতিমধ্যে বহু লোক চেঁচামেচি করছে, অধৈর্য হয়ে পড়েছে সব, কদিন ধরে আটকে আছে। এমন সময় দুটি ছেলে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি নবদ্বীপ যাবেন?" আমি তো অবাক, বললাম, "হাঁ ভাই, আমি আজ তিনদিন ধরে নবদ্বীপ যাব বলে এইখানে এসে পৌঁছেছি।" শুনলাম, ওরাও তিনজন নবদ্বীপ যেতে চায়। বুধবার অফিসের জন্য ভোরবেলা বের হয়েছে নবদ্বীপ থেকে—কলকাতায় পৌঁছেছিল কিন্তু আর ফিরতে পারে নি। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছে নবদ্বীপে জল খুব বাড়ছে। বাড়ীর জন্য ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাকে ওরা বলল, "আপনার যদি সাহস থাকে, তাহলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। আজ আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেভাবে হোক, নবদ্বীপে যাব, হেঁটে হলেও। আমরা যদি পৌঁছাই আপনিই পৌঁছাবেন, তবে অনেক risk আছে। আমি মাকে ডাকছিলুম। মা একবার আমায় লিখেছিলেন মনে পড়ল, "Whatever you do, offer in your heart to the Divine." মনে মনে মাকে জানালাম—"মা, আমার খুব মনে হচ্ছে আমারও নবদ্বীপ যাওয়া উচিত। তাই আমি ওদের সঙ্গে adventure-এ ঝাঁপ দিচ্ছি, তুমি সঙ্গে থেকো।" বললাম ওদের—"আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। সাহস আছে, আমাকেও যেতেই হবে।"

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা কয়েকজন। আরও কিছু লোক এসে গেল, তারা কেউ সবডুগড়, কেউ পূর্বস্থলী, কেউ কেউ কাটোয়া, বহরমপুর, এমন কি জঙ্গীপুর পর্যন্ত যাবে। আমরা একটা মিনিবাস রিজার্ভ করলাম। নবদ্বীপ পৌঁছে দেবে, চারশো টাকা নেবে। এত ভালো ড্রাইভার যে কী বলব! রওনা হলাম তখন প্রায় সাতটা। ঠিক হোল, সোজা হাইওয়ে দিয়ে নবদ্বীপের রাস্তায় যাওয়া। রাস্তায় মাঝে মাঝে জল পার হতে হল, তবে কোথাও হাঁটুর উপর নয়। কিন্তু সোনড়াবাজার পর্যন্ত এসে আর এগোবার কোনও উপায়ই নেই। আদিগন্ত জলরাশি। আশেপাশের গ্রামের লোক ভয়ার্ত চাহনি নিয়ে বারবার বারণ করতে লাগল—আর এগোবেন না। সাঁতার জল, তেমনি স্রোত। কিছুক্ষণ আগেই একটা ট্রাক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ কেউ মিনিবাস থেকে নামলো। তারপর আলোচনা করা হোল—কি করা যায়। আমার তখন মনে হল, বর্ধমান কালনা রুটে নবদ্বীপ যাওয়া যায় তারা ধাত্রীগ্রাম। তখনো তো বন্যার ভয়াল পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুরো ধারণা নেই। তাই ঠিক হল। আমরা ফিরে চললাম ব্যাণ্ডেলের দিকে। মগরা দিয়ে মেনারী হয়ে আমরা এগোলাম সাঁতগাছিয়া পর্যন্ত। তারপর নাকি এগোনো যাবে না, এই কথা শোনা গেল। আমরা তবুও এগোতে চেষ্টা করতে লাগলাম যতটুকু যাওয়া যায়, দেখা যাক্। জল পার হতে হতে কেষ্টপুর পর্যন্ত এগোনো গেল। সে জায়গাটা বাদনাপাড়া ষ্টেশন থেকে মাইল চার দূরে। কিন্তু সে কী জল! রাস্তা, দুপাশের মাঠ থৈ থৈ করছে শুধু জলরাশি। ষ্টেশন তো দূরস্থান, লাইনের ওপর উঠতে পারলেও হত।

কিন্তু কোথায় লাইন। গ্রামের যারা বেঁচে আছে যেটুকু ডাঙা পেয়েছে, সেখানেই আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু সে জায়গাটুকুও যে থাকবে—এ ভরসাও তখন তাদের নেই। তারা ব্যাকুল হয়ে আমাদের কাছে ছুটে এল আমরা রিলিফের লোক কি না, রাস্তায় কি রকম পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। তারা জানালো —তারা বুঝতে পারছে না, এ জল কোথা থেকে আসছে —তারা কোনও দিন এ জিনিস দেখেনি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছিল, কিছুটা যদি সাঁতার দিয়ে তারা রেললাইন পায়, তাহলে নবদ্বীপ হেঁটে অন্ততঃ পৌঁছাতে পারবে। লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনওভাবে নবদ্বীপ পৌঁছানো সম্ভব হবে না। এটা তখন আমারও মনে হচ্ছে। তবে আমি তো সাঁতার জানি না, হাঁটা এক কথা কিন্তু সাঁতার দিয়ে যাওয়া—এটা অবাস্তব চিন্তা। তাই চুপ করেই রইলুম। তখন ছেলেদুটি আমায় জিজ্ঞেস করছে—দিদি, আপনি কি বলেন? আমি বললুম—তোমরা এত risk নিয়ো না, সামনে জল উঁচু হয়ে রয়েছে। শুনছি এত স্রোত যে নৌকোও যেতে পারছে না—সেখানে জলে নেমো না। চল ফিরে দেখি—রেললাইন কোথায় কাছে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আর একটি নবদ্বীপের ছেলে আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। নাম দিলীপ কাঞ্জিলাল—M. Com. পরীক্ষা দিতে কোলকাতায় গিয়েছিল, বয়স বছর একুশ, স্কাউটের ছেলে যাবার পর্বত-আরোহণের শিক্ষানবিস। আমাদের অ্যাকাউন্টান্টের ছেলের বন্ধু। যেমন সাহসী, তেমনি ভদ্র। ও আমার সঙ্গে গায় দিল। আবার ফেরার পালা। গাড়ী আবার ফিরে চলল ব্যাণ্ডেল। পথে সাতগেছিয়ায় কয়েকজন নেমে গেল বর্ধমান বা দুর্গাপুর যাবে বলে। আমরা ত্রিবেণীর কাছাকাছি এসে গেছি—এমন সময় একজন বাস কণ্ডাক্টারের সঙ্গে দেখা হল আমাদের ড্রাইভারের। তিনি সব শুনে বললেন, ব্যাণ্ডেলে ফিরবেন কেন? কালনা পর্যন্ত যেতে পারবেন বদ্যিপুর দিয়ে যাবার পথ আছে। আমাদের ছেলেরাও উৎসাহিত হয়ে উঠল। যতটা এগোনো যায় চলুন। বেশ কিছু টাকা আমরা দেবো। তখন আমাদের মনে হচ্ছে—কালনা পর্যন্ত যেভাবে হোক্ পৌঁছাতে হবে। আমরা ত্রিবেণীতে চা বিস্কুট খেলাম। আমার জলের বোতলে জল ভরে নিলাম কল থেকে। আর কটা বিস্কুটও নিয়ে নিলাম। তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। গাড়ী কয়েক মাইল যাওয়ার পরই মাঝে মাঝেই জল পার হতে হচ্ছে, তবে বেশী নয়। এভাবে বদ্যিপুর কোল্ড্ ষ্টোরেজ পার হয়েই গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার জল। এবার জল বেশ বেশী বলে মনে হচ্ছে। এবার আমরা সবাই নামলাম। আবার খোঁজখবর, কথাবার্তা হল। গ্রামবাসীরা জানালেন, জল চুকছে সকাল থেকে। নদীর জল তো নিশ্চয়ই, তবে কোন নদীর বলতে পারব না। দুপুরের দিকে একহাঁটু মত ছিল, এখন বাড়ছে, কতটা বেড়েছে তাও বলতে পারব না। তবে এক কোমর—বেশী হলে একবুক জলের বেশী হবে না। সাঁতার জল নয়, আপনারা পার হতে পারেন, তবে হেঁটে। গাড়ী আর কোনও মতেই যাবে না। আরও একটা কথা, তারা জানালো—এই জল সাড়ে তিনমাইল মত চলবে, মাঝখানে কোনও ফাঁক নেই। তারপর কালনা গেট পাওয়া যাবে, যেখানে রেল লাইন। তার পরেই কালনা ষ্টেশন। সবাই ঠিক করল—গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হবে এখানেই। তবে যারা জল পার হতে পারবে না, ব্যাণ্ডেলে ফেরত নিয়ে যাবে। টাকা পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হোল ড্রাইভারকে। ১০০টাকা

বেশী আসনা তাকে তুলে দিলাম। এত ভালো লোক সচরাচর দেখা যায় না। তখন দুজন নয়, আমার সঙ্গী তিনজন। আমাকে জিজ্ঞেস করল—দিদি, এবার আপনাকে ঠিক করতে হবে—কি করবেন? আমি বললুম—ভাই, আমার নবদ্বীপে যাওয়া খুবই দরকার। বুধবারে পৌঁছবার কথা। আজ শনিবার হয়ে গেল। কাজেই আমি ভাই যাব, আর তোমরা যদি সঙ্গে থাকো। তখন ওরা বলল, আজ আমরা যে কোনো রিস্ক নিয়ে কালনা অবধি পৌঁছবই তারপর কোনও উপায় না থাকলে কাল, হেঁটে হলেও, নবদ্বীপে পৌঁছবো। দিদি, আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে। আমরা পৌঁছলে আপনিও পৌঁছবেন। আপনাকে ফেলে তো আমরা যাব না। তখন আমি বললুম, ভাই আমার সাহস আছে। কিন্তু আমি সাঁতার জানি না। মনে মনে মাকে সমানে ডাকছি, আর যে মন্ত্র মা আমাকে একবার লিখে দিয়েছিলেন অসুবিধের সময় বলতে, মনে মনে তা উচ্চারণ করেই চলেছি, মা তোমার সাহসেই তো আমার সাহস। মা সঙ্গে আছেন, এ অনুভব সব সময়েই রয়েছে, সেজন্য ভয় একটুও করছে না। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না গাড়ী ছেড়ে দিলাম। অনেকেই আনশ্চিত ও দুর্গম অবস্থাকে ভয় পেয়ে ফিরে গেল ব্যাণ্ডেলে। আমি মাকে স্মরণ করে তৈরী হলুম জলে হাঁটতে। প্রথম দিকে জল এক কোমর, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্রোত—পায়ে কি থাকা। চটি পরে যাওয়া যাবে না, মনে হোল। তখন ছেলে তিনটির একজন আমাকে বলল, তাকে ধরে হাঁটতে। একজনকে আমি ডানহাত দিয়ে ধরলুম, আর একজন আমার বাঁদিকে হাঁটতে লাগল, যাতে দরকার হলে সাহায্য করতে পারে। আমি বাঁহাতে আমার কাপড় ধরে আছি তা না হলে প্রচণ্ড স্রোতে ও ভিজে কাপড়ে পা আটকে যাচ্ছে। আর তৃতীয়জন আমার ফাইল, ব্যাগ এমন কি চটিজোড়া পর্যন্ত নিয়ে সামনে সামনে যেতে লাগলো, বলতে লাগলো—ঠিক তার পিছন পিছন যেতে। এইভাবে সাড়ে তিনমাইল, চার মাইল হাঁটা। মাঝে মাঝে যখনই মনে হচ্ছে—মা, আর পারছি না বোধহয়, পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তিন-জনের কেউ বলছে—দিদি, পারছি না বলবেন না কিন্তু। পারতেই হবে আমাদের।

তিনঘন্টা এইভাবে হেঁটে আমরা অবশেষে কালনা গেট পৌঁছে রেললাইন পেলাম। মাঝে মাঝে বুক পর্যন্ত জল হয়েছিল। ঐ ভিজে পোষাকে তিনজন লাইন ধরে আর একটু হেঁটে পৌঁছলাম কালনা ষ্টেশনে। পৌঁছে ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করার আগে সকলেরই মনে হয়েছে চায়ের কথা। আমরা ষ্টেশনের বাইরে এসে চায়ের দোকান পেলুম। নিজেই নিজেকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি—গায়ে ভিজে কাপড়জামা নিঙড়ে দিব্যি হাঁটছি তো।

হঠাৎ "দিদিমণি আপনি এখানে এইভাবে?" দেখি মাখনবাবু—নবদ্বীপের একজন বাস ড্রাইভার। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাস ভাড়া নিতাম মেয়েদের জন্যে; তারপরও জানা গেল, আমাদের সঙ্গের একটি ছেলের শ্বশুরমশাইয়ের তিনি ড্রাইভার। গাড়ী নিয়ে কালনা এসে আটকে পড়েছেন। কালনা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত ভয়াবহ বন্যা। কোনও উপায় নেই যাবার। তিনি আমাদের জন্য গরম ভাত ও মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করলেন ওরই মধ্যে। সারাদিন না খাওয়ার পর খেতে ভালই লাগলো কিন্তু এত ক্লান্ত লাগছিল তবু এবার পরের চিন্তা। তখন রাত্রি ৮টা। ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে দেখা হল। ত্রিলোচন-বাবু খুবই খাতির যত্ন করতে সুরু করলেন। আমি নবদ্বীপের সঙ্গে কোনো যোগা-

যোগের চেষ্টা করে অতিকষ্টে বিধানসভার সদস্য দেবীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। ওঁর মুখে শুনলাম—এরকম বন্যা কখনও কেউ শোনেনি। নবদ্বীপে পাঁচইঞ্চি জায়গাও খালি নেই যেখানে জল নেই। যেখানে আমাদের স্কুল, পোড়ামাতলা, নবদ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গা সেখানেই এক কোমর জল। ২-৩ ঘন্টার মধ্যে জল খুব বেড়ে গেছে। বঙ্গবাণীর খবর কিছু দিতে পারলেন না। আর বললেন রিলিফএর চেষ্টা করছেন কিন্তু যোগাযোগ সব বিচ্ছিন্ন। নৌকোও নেই। আমি কী ভাবে কালনা এসেছি জিজ্ঞেস করলেন। আমি যে ভাবে পৌঁছেছি সেটা জানালাম। বঙ্গবাণীতে খবরটা দিতে বললাম যে আমি কালনা অবধি পৌঁছেছি, সেভাবেই হোক নবদ্বীপ পৌঁছাবো আর আমি গেলেই বেতনাদি দেওয়া হবে।

কালনা ষ্টেশনেও অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে, তাহলেও আমি একটা আরামকেদারা পেলাম রাত্রের জন্য। ষ্টেশন মাষ্টারমশাই একটা বিছানার চাদর দিলেন গায়ে জড়ানোর জন্যে আর দুঃখপ্রকাশ করলেন তাঁর পরিবারবর্গ এখনও এখানে আসেনি, তিনি কয়েকদিন হল মাত্র কাজে যোগ দিয়েছেন। তা না হলে আমাকে ভিজে কাপড়ে থাকতে হত না। আমি চাদরটি দুটি ছেলেকে দিলাম মেজের পাতার জন্য—বাকী একজন বেঞ্চে একটু জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু তখন আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম—কোনও রিলিফ-ট্রেন একটি বগিই হোক—নবদ্বীপ পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে পাওয়া যায় কিনা।

বেশ কিছুক্ষণ পর জানতে পারলাম যে গুপ্তিপাড়া ও কালনার মাঝখানে একটি ছোট রেলওয়ে সেতু ভেঙে গেছে এবং প্রবলবেগে জল বইছে সেখানে, কাজেই ট্রেন চলাচল মাসখানেকের জন্য শেষ। আমরা এই পথ দিয়েই এই সব সেতু পার হয়ে কালনায় পৌঁছেছি। আমি ভাবলুম, মার কি করুণা, ঐ সেতু যদি আগে ভাঙত, আমরা পার হতে পারতুম না, ভেসে যেতাম ঐ হাঁটার সময়ই। তখন আমরা ঠিকই করে ফেললুম—কাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়ে চারটা ৫টার মধ্যে রওনা হতে হবে নবদ্বীপের উদ্দেশে লাইনের ওপর দিয়ে। এছাড়া আর পথ নেই। আমি চেয়ারে আধশোয়া বসে আছি ভিজে কাপড়টা তখনো ভাল শুকোয়নি, গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। মাকে ডাকছি, মার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর ভেতরের উদ্বিগ্নতা অনেক শান্ত হয়ে গেছে—নিজেই অবাক্ হয়ে যাচ্ছি কি রকম করে চলেছি। যে-আমি এক মাইল হাঁটতে পারি না, ভাঙা পা ফুলে যায়। আমি হাঁ বললাম কিন্তু পারবো তো? তখনই অন্তর বলছে—পারবো নিশ্চয়ই, নবদ্বীপ পৌঁছোতেই হবে। রাস্তায় তো থাকতে পারি না, এগিয়ে যেতেই হবে। রাত্রি সাড়ে তিনটা নাগাদ ছেলে তিনটি উঠে পড়ল, যাবার জন্যে প্রস্তুত হবে বলে। আমি মেয়ে বলে আমার প্রস্তুত হওয়ার সমস্যাও বেশী। জলের কোনও ব্যবস্থা নেই আর এত নোংরা ওয়েটিং রুমের অবস্থা। হঠাৎ দেখি, ষ্টেশনের এক কুলী জল নিয়ে এসেছে। বলল, সব পরিষ্কার করে দিয়েছি আর আপনার জন্য এক বালতি জল দিয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়ল।

ছেলেরাও এসে পড়ল। যাবার চা বিস্কুট খেয়ে জল ও বিস্কুট সঙ্গে নিয়ে মায়ের নাম করে রওনা দিলাম লাইনের ওপর দিয়ে ভয়াবহ বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার পথে। তখন পৌনে ৫টা। রবিবার ১লা অক্টোবর। ছেলেরা বলল, প্রথমে থামবো বাঘনাপাড়া

ষ্টেশনে। কালনা থেকে শুনছি পাঁচ মাইল হবে। কখনও তো ভাবিনি আরও পাঁচ মাইল হাঁটতে পারবো। তাও ভালো রাস্তায় নয়, লাইনের ওপর পাথর। জয় মা বলে যাত্রা শুরু করলাম। ঠিক হল আমরা ঘন্টায় তিন মাইল চলতে চেষ্টা করবো।

দুপাশে অথৈ জল, কত কি ভেসে যাচ্ছে। শুধু রেলের লাইন দেখা যাচ্ছে। আর অজস্র লোক ও গরু আশ্রয় নিয়েছে লাইনের উপর। জল লাইনের সমান সমান—তলায় খোয়াও ভেজা ভেজা। দিলীপ বলল, দিদি, স্লিপারে পা দিয়ে দিয়ে আসবেন, নইলে পা বসে যেতে পারে। ওদের একজন এগিয়ে চলেছে, একজন প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ঠিক আমার পিছনে পিছনে। যখনই একটু বসব কি দাঁড়াবো ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে—"দিদি, পরের ষ্টেশন না আসা পর্যন্ত থামা চলবে না। আজ আমাদের নবদ্বীপ পৌঁছতেই হবে। পারছি না বলবেন না।"

এগোচ্ছি আর মাকে ডাকছি—"মা শক্তি দাও।" মা বলতেন, সব সময় বিশ্বাস রেখো ভগবানের ওপর। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটা ঘাসও গজায় না। তাই মনে মনে বলছি, মা তোমার কি ইচ্ছা জানি না; তোমাকে ভুলে যেতে দিও না। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, যাই ঘটুক সব আমি যেন তোমার ইচ্ছা বলে শান্ত হয়ে হাসি মুখে সহ্য করতে পারি। এইভাবে চলতে চলতে এসে গেলাম ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশন অর্থাৎ বারো মাইল হাঁটা হয়ে গেল। রোদ বেশী নেই মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও আছে, তবে কম। চা বিস্কুট খাওয়া গেল আর সেই গলাডোবানোর জল। তখন দশটা বেজেছে প্রায়। বহুলোক দেখছি হাঁটছে আগে। যত লোক লাইনের উপর, তাদের হতাশার কান্না, হারানোর ব্যথা, ভবিষ্যতের চিন্তা আর যেটুকু আছে তার জন্য ভগবানের করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা—সব দেখছি। যারা হাঁটছে তাদের এক কথা—যেতেই হবে। নবদ্বীপ তো কাছে। ধাঁইহাট, কাটোয়া, জঙ্গীপুর সালার বহরমপুর কত দূর। তখন মনে হচ্ছে হয়তো আমি নবদ্বীপ যেতে পারবো না। আমরা আড়ার নৌকার চেষ্টা করলাম কিন্তু নৌকো সম্ভবই নয়। কী স্রোত যেন নদী ছুটে চলেছে। তার মধ্যেই শুনছি কেউ কেউ বলছে—"নবদ্বীপ তো যেতে পারবেন না, লাইন ভেঙে গেছে কয়েক জায়গায় লাইনের ওপর দিয়ে হু হু শব্দে জল ছুটছে, আমরা ফিরে এলাম।" আমরা যেন শুনেও শুনছি না। রওনা হয়েছি তখন চলতেই থাকবো, এই পণ। নিরুৎসাহিত করবার এত বড় খবরেও নিরাশ হচ্ছি না তবে ক্লান্তি আছে, গতি হচ্ছে মন্থর। তখনই শুনছি "দিদি, একটু জল। না না, বসা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিন।"

দুঃখ কষ্ট বেদনা বিপর্যয়ের মধ্যে কি রকম যেন হয়ে গেছি। তখন অনুভব শক্তি কবে গেছে। দেখছি এক মা ১০।১২ বছরের ছেলের হাত ধরে দুজনে ভেসে চলেছে—মৃত। বড় বড় খাট আলমারী ভেসে চলেছে। আর মোষ গরু জীবন্ত মৃত কত যে ভেসে চলেছে তার আর সংখ্যা নেই। কখনও দেখছি লাইনের ধারে সাদা ধবধবে একটা দেহ এক মহিলা উপুড় হয়ে মারা গেছে। এগিয়েই চলেছি পৌঁছোতে হবে। আবার শুনছি—আর এগোতে পারবেন না, লাইন ভেঙে গেছে। তাও এগোচ্ছি।

অতঃপরই সে যে কী ভয়াবহ দৃশ্য—একটা কালভার্ট ভেঙে গেছে, দুপাশে শুধু দুটি লাইন। মাঝখানে যে স্লিপারগুলি ছিল, তার অস্তিত্ব নাই; নেই মাটি-পাথরের একটি

টুকরোও। কেবল দুদিকে দুটি লাইন, তার ঠিক নীচেই প্রবল জলস্রোত। পুপাতের মত জলের তোড়। এখন উপায়! লাইনের ওপর বসে বাকে ডাকতে লাগলাম। তিন-জনের মধ্যে দুজন বেশ একটু নার্ভাস হয়েছে বলে মনে হল। আমি যে কী করব—এরকম ভীষণ দৃশ্য কখনও দেখিনি। পর্বতারোহণের শিক্ষানবিস ছেলেটি, আবার চটি ব্যাগ ফাইল সব নিল। তারপর আমায় বলল, "ভগবান তো আছেন। চলুন থাকবো না। এগোই। আমি একটা লাইনের উপর এক পা করে এগোবো আর ঐ লাইনের উপর দিয়ে আপনি আসবেন ঠিক সেইভাবে। নীচে দেখবেন না—সোজা স্থির পদক্ষেপ যেন হয়। আমি আপনার ডানহাত শক্ত করে ধরবো, বাঁ হাতটা আপনি আপনার পায়ের সঙ্গে right angle করে পা ফেলবেন।"

মা শ্রীঅরবিন্দ নাম জপ করতে করতে এগোলাম। জীবনে কখনও এ অবস্থা দেখা দূরের কথা—ভাবাও অসম্ভব। কি করে পার হোলাম—চিন্তা করলেই বিস্ময় লাগছে। পার হয়ে এসে লাইনের উপর বসে পড়লাম পাঁচ মিনিট। বাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। জানি না এর পরেও কি আছে। তারপরেও দু-তিন জায়গায় লাইন ভাঙা ছিল, তবে কম। লাইনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড স্রোতে জল ছুটছে, এও অন্ততঃ ৮।১০ জায়-গায়। সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থায় সমুদ্রগড়ের সেতুও পার হলাম। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমার পক্ষে অসম্ভব সম্ভব হল। শেষের সময়টা যেন পা আর চলতেই চাইছে না। তবু যেতে হবে, থামা চলবে না। ছেলেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু আমাকে যথাসম্ভব সাহায্যও করে চলেছে, নিজের ব্যাগটুকুও বইতে দিচ্ছে না। ভীড়ের মধ্যে দেখছি যাদের যথাসর্বস্ব গেছে, লাইনের ওপর বসে আছে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে। তারাও দেখছি, এগিয়ে আসছে সাহায্য করতে। কী বিস্ময়কর পরিস্থিতি! অবাক হয়ে যাচ্ছি আর সব কিছুর মধ্যেই বাকে দেখে যাচ্ছি।

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ নবদ্বীপ ষ্টেশনে এসে গেলাম। নবদ্বীপে একমাত্র ষ্টেশন-টুকু জেগে আছে, বাকী সব জলে একাকার। পরিচিত জায়গা, কিন্তু সাহায্য পাওয়া গেল না, টেলিফোন নেই, নৌকো নেই। আবার তিনজনেই একটু এগিয়ে ওদিকে ঘরের দরজার কাছে এলাম যথারীতি লাইন ধরেই। তখন আর যেন দাঁড়াতেও পারছি না ছেলেরাও বাড়ীর কাছে এসে আর দেরী করতে পারছে না। নৌকা ছাড়া আমি তো পোড়ামা-তলায় আমার স্কুলে বা নিমাইঘাটের বঙ্গবাণী কোয়ার্টারে, কোথাও যেতে পারবো না, এখন উপায়? অথচ আমি ছেলে তিনটিকে ছেড়ে দিতে চাই। নবদ্বীপে যখন এসে গেছি, এবার নিজেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে পৌঁছনোর। ওখানেই দেখলাম, অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। আবার সুরু হয়েছে বৃষ্টি। একই জামা কাপড়ে ৩।৪ দিন চলছি। ভিজেছি আবার। এবার শীত শীত লাগছে। হঠাৎ মনে হল গীতার কথা। ও আমাদের নার্সারী স্কুলের শিক্ষিকা। ওর শ্বশুর বাড়ী লাইনের কাছেই। দেখলুম সেদিকেও থৈ থৈ জল। নিশ্চয়ই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই, ঐ যে ডাক্তারবাবুর (ওর শ্বশুর ডাক্তার) বাড়ী দেখা যাচ্ছে—ওঁর বাড়ীর লোকেরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে, বলতে পারো?"—"হ্যাঁ, এই তো কাছেই একবাড়ীতে। কিন্তু এক কোমর জল পার হতে হবে।" তখন আমার আর এক কোমর জলে ভয় কি? দিলীপদের বললাম—

"আমাকে ওঁদের আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিয়ে তোমরা বাড়ী যাও, তোমরা হয়ত সাঁতার দিয়েও যাবে। আমার জন্য আর ঝাটকাবোনা তোমাদের।" ওরা তাই করল। কাছেই সে বাড়ী। গীতা তো জলের ভেতর নেমে এল উত্তেজনায়, জিজ্ঞেস করল, কি করে এলাম। ছেলেরা বিদায় নিল, ওদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে পারলাম না। মার কাছে প্রার্থনা জানালাম ওদের জন্য। আমাদের দেশে এইরকম সব ছেলেও তো আছে। আমার তখন অচল অবস্থা, আর বারান্দাতেও উঠতে পারছি না। গীতা তাড়াতাড়ি একটু গরম জল বসালো হাত মুখ ধোওয়ার জন্য, কাপড় জামা দিল বদলানোর জন্য। বলল, "তুমি হাত-পা ধুয়ে নাও, আমি চা করে দিই।" আমি তখন ওকে বলছি, একটা ফ্লাট্ ওয়াটার ব্যাগ থাকলে খুব ভালো হত। কিন্তু কোথায় তা সম্ভব? ওরা এ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে মাত্র। আমি বাথরুম থেকে বের হয়েই গীতাকে ডাকলাম—কি অদ্ভুত ঘটনা—পাশের একটা কুঠরীর সামনেই পাশাপাশি একটা ফ্লাট্ ওয়াটার ব্যাগ আর একটা প্লাষ্টিকের চৌকো বালতি। অন্য একটি পরিবারও আশ্রয় নিয়েছিল, এই বাড়িতে। তাদেরই এই ব্যাগ আর বালতি; চোখে জল হুহু করে এসে পড়ল দুজনেরই। এত ছোটখাট জিনিসগুলো পর্যন্ত না ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রাত্রিরটা বিশ্রাম আর তার সঙ্গে গীতার সেবাশুশ্রূষা কোনও দিন ভোলার নয়। ওর দেওর কালো বলল, আজ আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন, কাল সকালে যেভাবে হোক আপনাকে স্কুলে পৌঁছে দেবো।

পরদিন সকালে স্নানাহার সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে কালো খবর এনেছে—জল অনেকটা পার হতে হবে, তারপর নৌকো পাওয়া যাবে।

খুব ভাবছিলাম সনরদার কথা। সনরদা আমাদের আর্ট এর শিক্ষক, থাকেন লাইনের ওপারে শ্রীরামপুরে। দাদা খুবই অসুস্থ। বাবা বৃদ্ধ, প্রায় নব্বই বছর বয়স। ভাবছি তিনটি মেয়ে নিয়ে কি করছেন, একতলা বাড়ী তো ডুবেই গেছে। আশ্চর্য ঘটনা—সামনেই দেখি সনরদা নিজে। আমি সনরদাকে দেখে খুশী আর সনরদা খুশী আমাকে সুস্থ দেখে আর টাকাটা সেদিনই পাবেন বলে। শুনলাম—নইএ করে সনরদা তাঁর দাদাকে ছাদে তুলেছেন। একতলার ছাদ, সিঁড়ি নেই—ফাঁকা। উনি আর ওঁর স্ত্রী দাদাকে নিয়ে আছেন, একটা স্টোভ আর কিছু ডাল চাল। হাসছেন তাও। বলছেন, "বাবাকে আর মেয়েদের শহরের মধ্যে দিদির কাছে রেখেছি। আমরা আছি এখানে। চার আঙুল নীচে জল। তবে জল খুব ধীর গতিতে কমতে সুরু করেছে। কিন্তু স্রোত কমছে না।

আমরা দুজন—আমি আর কালো—রওনা হলাম। নবদ্বীপে গঙ্গাপাণিতলা অবধি গেলাম। তারপর সাঁতার জল, ভীষণ স্রোত। কিন্তু নৌকো কই? দাঁড়িয়েই রইলাম ২।৩ ঘন্টা, তাও কোনও কিছু হল না। তখন পিছন দিকে এরকম একটা জায়গায় গেলাম, যেখানে নৌকো আসতে পারে। দেখাও যাচ্ছে দূরে দূরে ক'টা নৌকো। হঠাৎ দূরে লাল ফেট্টুন। মনে হল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ। কালোকে বললাম চীৎকার করে ডাকতে। ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না। একটু কাছে আসতেই বুঝতে পারলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের নৌকোই। তখন আমি স্বামীজিকেও দেখেছি। আমিই চীৎকার করে ডাকলাম। নৌকো করেই স্বামীজি একটু এগিয়ে এলেন। বললেন—দিদি একটু অপেক্ষা করুন আমি রিলিফ নিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আসছি।

একটা বাড়ীর দাওয়ায় উঠে অপেক্ষা করলাম। স্বামীজী এসে আমাকে ও কালোকে তাঁর নৌকোয় তুললেন। তারপর তাঁকে সব বললাম। অনুরোধ করলাম—একটা নৌকা জোগাড় করে দিতে হবে। কাজ হল—ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হবে। ১২।১৪ জন লোকের অন্ততঃ ১০।১২ দিনের মত বাজার করে বঙ্গবাণীতে ফিরবো। আমি তখন ঠিক করলাম সকলেরই মাইনের টাকা তো আমার কাছে, সবাইকার জন্য কদিনের বাজার করে নিয়ে যাব। আর এখানে যাদের দেওয়া সম্ভব টাকা দিয়ে যাব।

স্বামীজী নৌকো ঠিক করে সঙ্গে একটি আশ্রমের ছেলে দিলেন। কালো আর সেই ছেলেটি দুজনে আমার সঙ্গে বঙ্গবাণী অবধি যাবে। আর বাজারের সব জিনিস কিনে দেবে। আমি ওদের দুজনকে নিয়ে নৌকো করে প্রথম স্কুলে গেলাম। শুনলাম ২৮ তারিখ রাত্রি ১টার সময় দরজা ভেঙে জলস্রোত স্কুলে ঢুকেছে—অফিস ছাড়া সব ঘর তারা অধিকার করেছে তালা ভেঙে, লাইব্রেরী, মিউজিক, টিচার্স রুম সব। আমি অফিস ঢুকলাম অতি কষ্টে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এবারে চেক ভাঙানোর জন্যে ব্যাংকের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেদিন ২রা অক্টোবর। ভাবছি মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে হয়তো ব্যাঙ্ক বন্ধ। গিয়ে দেখি ষ্টেট ব্যাংক বন্ধ কিন্তু ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক খোলা। আমি প্রতি বারই ষ্টেট ব্যাংকের চেক নিয়ে আসি আর এইবারেই এনেছি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেক।

ব্যাংক থেকে টাকা তুলে কিছু জিনিসপত্র কেনবার জন্যে দোকানের উদ্দেশে রওনা হলাম। সব দোকানই জলের তলায়। অগত্যা দোকানদারদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে শ'চারেক টাকার চাল ডাল নুন তেল চা চিনি হরলিক্স আলু পেঁয়াজ বিস্কুট রুটি চিড়ে আর কিছু ওষুধপত্র কিনে চললাম নিলয়ার বঙ্গবাণীর অভিমুখে। যাঁরা শহরে থাকেন, তাঁদের বেতনের টাকা দেবার ব্যবস্থা করে গেলাম। যখন বঙ্গবাণীতে পৌঁছলাম তখন বেলা পাঁচটা। নৌকোর উপরে আমাকে দেখে অন্নপূর্ণা সাধনা প্রভৃতি শিক্ষিকারা সকলেই চীৎকার শুরু করলো। টাকার বাণ্ডিল আর জিনিসপত্র সাধনার জিম্মায় রেখে, গেলাম আমার কোয়ার্টারে। সঙ্গে আমার বোন অন্নপূর্ণা আর সঙ্গীতশিক্ষক অচিন্ত্য। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত বাড়ি। নৌকো দরজার কাছে ভিড়লো। কিন্তু ভিতরে নামতে হলো অচিন্ত্যর দুই হাতের উপর পা রেখে। ঘরের মধ্যে এক বুক জল। আলমারির চাবি ছিল আমার কাছেই। খোলা হলো। দরকারী কাগজপত্র ও শ্রীমার জিনিসগুলি যে থাকে ছিল ঠিক তার নীচের থাক পর্যন্ত উঠে জল দাঁড়িয়ে আছে।

সারা নবদ্বীপ সহর জলবন্দী; আর আমার আলমারিতে শ্রীমায়ের চরণের নীচে বন্দী হয়ে আছে দুর্দমনীয় জলস্রোত।

চোখে জল এল।

ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান

অরবিন্দ বসু

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাদ্বৈত দর্শনে অতিমানস পরম তত্ত্ব, এই ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। তাঁর লেখায় বারবারই এই কথা বলা হয়েছে যে মানুষকে অতিমানস চেতনা, জ্ঞান ও সামর্থ্য লাভ করতে হবে, আর আধ্যাত্মিক সাধনা বিনা তা পাওয়া যাবে না। অতিমানস জ্ঞান ও বল মানুষের সাধারণ মন, প্রাণ ও দেহের প্রকৃতিতে নামিয়ে এনে, তার সামর্থ্য দিয়ে সেই প্রকৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করা যায়। সেই রূপান্তরের ফল হবে দিব্য-জীবন। মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত দিব্যজীবন স্থাপন করা। এই সব উক্তি থেকে এই ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে অতিমানসই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ও পরমার্থ।

এই ভাবনা কিন্তু ভ্রান্ত। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব এবং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভবই চরম পুরুষার্থ। তবে তাঁর পূর্ণযোগ অভ্যাস করলে ব্রহ্মের অনুভব সম্পূর্ণ ও অখণ্ড হয়, এই কথা তিনি বলেন। তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রহ্মের অসম্পূর্ণ ও অখণ্ড অনুভবও হতে পারে। এখন এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে ব্রহ্মের অখণ্ড ও সামগ্রিক অনুভব পেতে হলে অতিমানস চেতনা লাভ করা অনিবার্যভাবে আবশ্যক।

অতিমানসের তত্ত্ব বুঝতে হলে ব্রহ্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, তাই দিয়ে বোঝার চেষ্টা করাই উচিত। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ, এ তত্ত্ব প্রসিদ্ধ। সৎ মানে যা আর কিছুর ওপর নির্ভর করে থাকে না, চিৎ হল সেই 'আলো' যাকে জানার জন্য আর কোনও আলোর প্রয়োজন হয় না, বরং যার আলোতে সব কিছু আলোকিত, প্রকাশমান। চিৎ স্বয়ং-প্রকাশ। আনন্দ ও সৎ ও চিৎ একই বস্তু। সৎ-চিৎ এক, দুই হতে পারে না। আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু না থাকাতে সচ্চিৎ-এর নেই কোন উদ্বেগ, অশান্তি, নিরানন্দ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।

স্বয়ং-প্রকাশ কথাটির মূল অর্থ হল যা পরের দ্বারা প্রকাশিত নয়। তার দ্বিতীয় অর্থ হল স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু নিজেকে নিজে প্রকাশ করে। সুতরাং বলতে হয় যে সচ্চিদানন্দ নিজের স্বরূপ জানেন। ব্রহ্মের নিজের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান হ'ল বিজ্ঞান, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন 'সুপার-মাইণ্ড' ও বাংলায় যার অনুবাদ হয়েছে অতিমানস এই শব্দে। বলাই বাহুল্য সচ্চিদানন্দের নিজের স্বরূপের জ্ঞান অখণ্ড ও সম্পূর্ণ। যা বলা হল তার থেকে এ কথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে অতিমানস পরম তত্ত্ব নয়, বরং সেই তত্ত্বের নিজের স্বরূপের বোধ যা সামগ্রিক ও যার মধ্যে অবোধ বা অজ্ঞানের লেশমাত্র নেই। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ পরম তত্ত্ব, অতিমানস বিজ্ঞান তার পূর্ণ পরম জ্ঞান।

কিন্তু অতিমানসের পরিচিতি শুধু এইটুকুই নয়। সচ্চিদানন্দের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে যাকে রূপ দেওয়া যায়। বস্তুতঃ ভগবানের নিজের সত্তার মধ্যে যে-সব সম্ভাবনা আছে, সেগুলির কয়েকটি পরমেশ্বর চয়ন করে, এই বিশ্ব তাদের একটি সুষম ও সুসমঞ্জস রূপায়নের জন্য। অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে কয়েকটি বেছে নেওয়ার শক্তিকে বলা হয় দিব্যমায়া যা বিজ্ঞানের একটি দিক। সেই শক্তির মধ্যে রয়েছে সঞ্চিত সম্ভাবনাগুলিকে রূপ দেবার সামর্থ্য। কিন্তু এই রূপদান একটি নিয়ম ধরে হয়। বিশ্বের অভিব্যক্তির এই নিয়মটি অতিমানস

বিজ্ঞানের অনুসারী। তার বৈদিক নাম ঋত। সত্য এবং ঋত একটি তত্ত্বেরই দুটি দিক। তবে সত্যের মধ্যে আছে স্থিতির ব্যঞ্জনা, ঋতের মধ্যে গতির। বলা যায় চলমান সত্য ঋত। আবার এই সত্য এবং ঋতই বেদের ভাষায় বৃহৎ—বৃহৎ কারণ তা হল অসীম চেতনা ও তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর, সর্বভূতের মূল। বলা যেতে পারে বিশ্ব জ্ঞানরূপে অতি-মানসের মধ্যে স্থিত। আগে যে-নিয়মের কথা বলা হয়েছে, ঋত তাই। এ-ও বিজ্ঞানের বা অতিমানসের একটি দিক। আর একটি দিক হল সেই নিয়মের দ্বারা চালিত সর্বভূতের অভিব্যক্তির প্রণালী। যে-পদ্ধতিতে বিশ্ব অভিব্যক্ত হয় অতিমানস থেকে অতিমানস জ্ঞান-ইচ্ছার দ্বারা, তা-ও অতিমানস চেতনার থেকেই উৎসারিত।

সচ্চিদানন্দ জগতের মূল। কিন্তু কথাটা আর একটু বিশদ করে বলা উচিত। যে-অবস্থায় সচ্চিদানন্দ জগতের উৎস বা উপাদান তাকে লক্ষ্য করে ব্রহ্মকে অতিমানস ব্রহ্ম বলা যায়। অর্থাৎ জগতের উৎসরূপে সচ্চিদানন্দই অতিমানস অতিমানস শুধু চেতনা, জ্ঞান ও ইচ্ছাই নয়, তা আবার বিশ্বের বিজ্ঞানময় উপাদান। যদিও অতিমানস বিজ্ঞান স্বরূপে অজ্ঞানের বিশ্বের অতীতে স্থিত, তবু সেই জগতের সব কিছুর অন্তরেও সেই একই বিজ্ঞান সর্বত্র অনুস্যূত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, অজ্ঞানের জগতে বিজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞান সব কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত থাকে কি করে? অবিনশ্বর অতিমানস চেতনা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর সব বস্তুর মূল কারণ ও উপাদান হয় কি করে? এই প্রশ্নটি বিশাল, এখানে এর বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলা উচিত যে পূর্ণাদ্বৈত দর্শনে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিরোধী তত্ত্ব নয়। জ্ঞানই নিজেকে আংশিকভাবে আবৃত করে অজ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞানের দিক থেকে বলা যায় যে তা হল বিকাশমান জ্ঞান। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে অজ্ঞান মানে জ্ঞানের একান্ত অভাব নয়। অধ্যাত্মদর্শনে অজ্ঞান একটি পারিভাষিক শব্দ যার মানে হল পরম তত্ত্বের, একম্ সৎ-এর জ্ঞানের অভাব। আর জ্ঞান এখানে একটি পারিভাষিক শব্দ যার মানে হল সেই পরম একের সাক্ষাৎবোধ। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অজ্ঞান জ্ঞানেরই বিকাশ কিন্তু সীমার দ্বারা। তত্ত্বজ্ঞানের দিক থেকে বলা যায় অদ্বৈত বস্তু নিজেকে প্রথমে যুগলভাবে দেখেন। যুগলভাবে একে দুই, দুই-এ এক আছে। কিন্তু ভেদজ্ঞান নেই। এই দুই-এ এক যখন একত্বের ভাবকে কিছুটা আবৃত ক'রে দুই-এর ওপরে জোর দেয়, তখন হয় দ্বৈতের সৃষ্টির সূচনা, অজ্ঞানের উৎপত্তির সম্ভাবনা। অতিমানস পরম একের পূর্ণজ্ঞান, আবার সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড জ্ঞান, যুগপৎ ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বের ঐক্যের অনিবার্য বোধ। তার থেকেই মনের উৎপত্তি যা ভেদপ্রধান বা ভেদের জ্ঞান।

সে যাই হোক, অতিমানস নিজে তা হলে সচ্চিদানন্দের নিজের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান, তার চেতনায় সম্ভাব্য বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান ও সম্ভূত বিশ্বের অখণ্ড ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, আর এই জ্ঞানই আবার উপাদান জগতের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অতিমানস হল একটি করণ, সচ্চিদানন্দের একটি যন্ত্র যা দিয়ে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব অতিমানস পরম তত্ত্ব নয়, বরং সেই তত্ত্বের এক বিশেষ প্রকার চেতনা, জ্ঞান, ইচ্ছা ও সামর্থ্য ও বিশ্বের সারভূত উপাদান। আমরা আগে বলেছি বিজ্ঞান থেকেই অজ্ঞানের উৎপত্তি, এক থেকে যুগল প্রকট হয়ে তার থেকে বহুর সৃষ্টি। এই

সৃষ্টি হয় কি ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ নয়। প্রথমে বলা যায় চেতনা নিজেকে নানা স্তরে বিন্যস্ত করে। সেই বিন্যাসের ফলে মন, প্রাণ ও জড় সৃষ্ট হয় ও প্রকট হয়। মনের মধ্যে চেতনা অজ্ঞান বা দ্বৈতবোধরূপে প্রকট, প্রাণের মধ্যে বাসনারূপে, জড়ের মধ্যে তামসিক নিশ্চেতনারূপে—যার অন্তরে কিন্তু রয়েছে চিৎ-বস্তু ও চিৎ-শক্তি ও অতিমানস উপাদান। এই জড়ের মধ্যে সুপ্ত চেতনা নিজেকে জাগিয়ে তুলতে চায় যখন, নিশ্চেতনার আবরণ ভেদ করে নিজের চেতন স্বরূপ কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে চায় যখন, তখন হয় প্রাণের স্তর থেকে প্রাণশক্তির অবতরণ জড়ের মধ্যে, তার মধ্যে হয় প্রাণের আবির্ভাব। প্রাণময় জড়ের মধ্যে গুপ্তভাবে বর্তমান চেতনা যখন আরও স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, তখন হয় জড়দেহধারী প্রাণীর মধ্যে মনের স্তর থেকে মানসিক চেতনার অবতরণ, জগতে মনের আবির্ভাব, মনুর* সন্তান মানুষের উৎপত্তি। মানসিক চেতনা আমাদের পরিচিত যদিও, বস্তুত: তার রহস্য আমরা জানি না। মানসিক চেতনা বহুবিধ কৃতিলাভ করেছে। দর্শন, শিল্প, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে মানসিক চেতনার কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। আবার এই মানসিক চেতনায় মানুষের মধ্যে 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি, জগতের মূল কি, জীবনের গতি কি'—এই সব প্রশ্ন জেগে ওঠে। বাইরে থেকে সকল বস্তু যা বলে বোধহয় আমাদের কাছে, তাদের স্বরূপ বাস্তবিক তা নয়, তাদের স্বভাব অন্য প্রকার, এই সত্যের ইঙ্গিত পেয়ে মনোময় জীব, মানসিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষ তার নিজের ও বিশ্বের গহনতম তত্ত্বের বা আত্মার সন্ধান করে, সুরু হয় তার আধ্যাত্মিক অভিযান।

বলা হয়েছে যে মন দ্বৈতবোধ নিয়ে কাজ করে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে মন কি আত্মাকে, একত্বকে জানতে পারে? সাধারণত: এই প্রশ্নের সাধারণ উত্তর হল "না"; মনের নেই সেই সামর্থ্য যা দিয়ে সে সচ্চিদানন্দকে জানতে পারে, তার সঙ্গে মিলিত বা এক হয়ে যেতে পারে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত অনুধাবন করার যোগ্য। মনের এই অসামর্থ্য তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। এই সমস্যার তিনি যে-সমাধান দিয়েছেন, তার বৈশিষ্ট্য আছে।

সাধারণত: মানুষের মন ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। তারপর স্মৃতি, অনুমান ইত্যাদি ব্যবহার করে মন একটা জ্ঞানের কাঠামো তৈরী করে নেয়। কিন্তু বাস্তবিক সেই জ্ঞান অজ্ঞানেরই সামিল। ভ্রান্তি তো থাকেই, অপূর্ণতাও তার বৈশিষ্ট্য। এ কথা বলা অসমীচীন নয় যে এই অজ্ঞান-জ্ঞান অপূর্ণ বলেই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে মন জ্ঞানের অধিকারী নয়, জ্ঞান পাবার প্রচেষ্টা করার যন্ত্র মাত্র। উপনিষদ বলেন যে মন ব্রহ্মের থেকে ফিরে আসে তাঁকে না পেয়ে, আবার উপনিষদ এ কথাও বলেছেন যে ব্রহ্মকে দেখা যায় সূক্ষ্মদর্শীদের সূক্ষ্ম ও অগ্র্য বুদ্ধি দিয়ে। এগুলি কি পরস্পর-বিরোধী বচন? শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব উক্তিগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। মনের নানা স্তর আছে। সাধারণ মানুষ মনের যে-স্তরে থাকে, তার উপরের স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারলে ইন্দ্রিয়ের ওপরে নির্ভর না করে, অনুমান বা কল্পনা

---

* মনু শব্দটি মন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

ইত্যাদির উপযোগ না করেও মন সাক্ষাৎভাবে জ্ঞান পেতে পারে। মনের উর্ধ্বতম স্তরে এমনভাবে বিশ্বকে দেখা যায় যে সমগ্র বিশ্ব সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি বস্তু বলে প্রতিভাত হয়। শ্রীঅরবিন্দ মনের এই স্তরের নাম দিয়েছেন 'ওভারমাইণ্ড' বাংলা অনুবাদ অধিমানস। বিশ্বে যে-সব শক্তি ক্রিয়া করছে, সেগুলির একান্ত বিভিন্নতা বা পরস্পরবিরোধিতা অধিমানস স্তরে নেই। কিন্তু অধিমানস থেকে একাধিক শক্তির বিভিন্নভাবে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বিভিন্নতা যত গাঢ় হয়, ভেদও তত স্পষ্ট হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মনে দ্বৈতবোধের উৎপত্তি হয়। সাধারণ মন থেকে অধিমানস পর্যন্ত মানসিক চৈতন্যের অনেকগুলি স্তর আছে সেগুলির বিশেষ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে যত উপরের স্তরে ওঠা যায়, জ্ঞানও তত সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ হয়, দ্বৈতবোধও কম প্রখর হতে থাকে। কিন্তু বোঝাবার সুবিধার জন্য এই সব স্তরগুলির বিশেষ বিশেষ নাম দিলেও শ্রীঅরবিন্দ সবগুলিকেই সাধারণভাবে 'মন' বলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যাকে অনুভব বলা হয়, শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে সাধক তা এই স্তরগুলির কোনও একটিতে লাভ করে। ব্যাপকতর অর্থে অনুভবগুলি আধ্যাত্মিক হলেও মনের ব্যাপকতর অর্থে সেগুলি মানসিক। সাধক সেগুলির মাধ্যমে আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে বলে তা আধ্যাত্মিক, আর পূর্ণ অনুভব হয় না বলে তা মানসিক। বলা বাহুল্য অনুভবগুলির মধ্যে তারতম্য থাকে, সেগুলির মাধ্যম আধ্যাত্মিক মন, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় স্পিরিচুয়াল মাইণ্ড। আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনা খোলা মন নিয়ে অনুধাবন করলে একথা বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পরমতত্ত্বের অনুভবের যে-আদর্শ দিয়েছেন, বুদ্ধের নির্বাণ ও শূন্যতার অনুভূতির সঙ্গে তার একত্ব কোথায়? বা বুদ্ধের সঙ্গে খৃষ্টের অনুভবের সাদৃশ্য কি? অথচ এ কথা বলা কি সঙ্গত হবে যে এই অনুভবগুলির কোনটিই পরম তত্ত্বের সন্ধান দিতে অপারগ? শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এই সব আধ্যাত্মিক দিক্‌পালদের স্বকীয় অনুভবের সাদৃশ্য কি, বৈসাদৃশ্য কতটুকু? শঙ্করাচার্যের তত্ত্ববস্তুর সংজ্ঞা স্বীকার করে নিলে তাঁর দর্শনের বাকীটুকু বোধহয় গ্রহণ করতেই হয়। অন্ততঃ অনেক কুশলী দার্শনিকের তাই মত। কিন্তু তা হলে বলতে হয় যে শ্রীরামানুজ বা শ্রীচৈতন্য প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সে কথা কি সত্য? শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—না।

মানসিক-আধ্যাত্মিক অনুভবের সত্যতা থাকলেও, পূর্ণতা নেই। ব্রহ্মের সামগ্রিক জ্ঞান একমাত্র অতিমানস চেতনা বা বিজ্ঞান দিয়েই লাভ করা যায়। বস্তুতঃ বিজ্ঞান ভাস্বর চেতনা—শ্রীভগবানের নিজের সম্বন্ধে নিজের অখণ্ডবোধও বিশ্বের পূর্ণজ্ঞান। পরমতত্ত্বের সকল দিকের যুগপৎ জ্ঞান পেতে হলে অতিমানসই একমাত্র উপায়। এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস চেতনা লাভ করার আদর্শ দিয়েছেন, ও সেই আদর্শকে অতীন্দ্রিয় জীবনে বাস্তবে পরিণত করার জন্য পূর্ণযোগের প্রবর্তন করেছেন। পূর্ণযোগ শুধু সব প্রচলিত যোগের লক্ষ্যের সমন্বয় করে না। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি ও পূর্ণকর্ম মানসিক-আধ্যাত্মিক স্তরে লাভ করে, সেই কীর্তিকে অতিমানসের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াস করে। সেই প্রয়াসের সিদ্ধি অতিমানসের মাধ্যমে শ্রীভগবানের ভাগবতী করুণার দান।

তবে দেখা যাচ্ছে যে অতিমানস একটি উপায়, করণ, সাধন—উপেয় পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ জ্ঞান, ফল—তার ভিত্তিতে পরমতত্ত্বের সঙ্গে অখণ্ড একাত্মতা, সচ্চিদানন্দের উচ্চতম, বিশাল-

তন অংও অনুভব লাভ করে, স্থিতি ও গতির আনন্দরস পান করে, পরমা চিৎশক্তির কর্মের অধিকারী হওয়া জীবাত্মার স্বকীয় ধাম বিজ্ঞান-ভূমিতে ও এই বিশ্বে। এই বিশ্বে সেই কর্ম হল দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা —যার আছে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত এই দুটি দিক। বিশেষ করে লক্ষণীয় যে এই উদ্দেশ্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত বলে, ব্যক্তিগত সিদ্ধির মহিমা লাভ করার জন্যে নয়।

ব্যষ্টিগত দিব্যজীবনের মূল ভাবনাটি কি? প্রশ্নটি বিশাল ও জটিল। দিব্য, ব্যষ্টি জীব ও জীবন এই ভাবনাগুলি কি, শ্রীঅরবিন্দ এইগুলিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন, সে-সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না থাকলে বিষয়টি সম্বন্ধে স্বল্পতম জ্ঞান হওয়াও সম্ভব নয়। বলা যায় শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবন' গ্রন্থটি এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর। দিব্য বলতে এখানে আমরা পরমদেবের স্বরূপ ও স্বভাব, ভগবানের ভাগবতী স্থিতি ও প্রকৃতি বুঝছি। জীব তার স্বরূপে সচ্চিদানন্দেরই একটি দিক, বলা যায় সে ব্যষ্টি-ভগবান। কিন্তু এই জগতে মানুষকে আমরা যে-ভাবে পাই, সেখানে এই প্রসঙ্গে অন্তত: আমরা ব্যষ্টি বলতে ঠিক তা বুঝছি না। ভগবান এই জগতে সর্বত্র চৈত্য-ধাতুরূপে বর্তমান। সেই চৈত্যধাতু ক্রমবিকাশের ধারায় চৈত্য-পুরুষরূপে অভিব্যক্ত হয়। এইটি মানুষের অন্তরতম সত্তা। আর তার বাইরের প্রকৃতিতে রয়েছে মন, প্রাণ ও দেহের সমাহার। এই চারটি তত্ত্ব দিয়ে গঠিত মানুষকেই আমরা এখন ব্যষ্টি বলছি। এই রকম মানুষই দিব্যজীবন লাভ করবে এই জগতে। ব্যষ্টি ভগবান বা জীবাত্মা অতিমানস জগতে দিব্যজীবন ভোগ করেই ও করছেই। মানুষের জীবন এখন অজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং অদিব্য। মন, প্রাণ, দেহ বস্তুত: ভাগবতী চিৎশক্তিরই অজ্ঞানময় তিনটি তত্ত্ব। তাদের মধ্যে চিৎসত্তা ও চিৎশক্তি যদি জাগিয়ে তোলা যায়, স্পষ্ট করে প্রকট করা যায়, তাহলে মন, প্রাণ, দেহ সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞান বা অতিমানস জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। যার আধারে এটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে, তার জীবন হবে অতিমানস জীবন। কারণ দেহের ভূমিতেও তার ভগবানের জ্ঞান জাগরূক থাকবে, প্রাণের ক্ষেত্রে বিষয় বাসনার স্থানে সব বস্তুর সঙ্গে সংযোগের ফলে সব কিছুতেই শুদ্ধ ভোগ পাওয়া যাবে, মনের ক্ষেত্রে সামর্থ্য জন্মাবে পূর্ণজ্ঞানকে অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত করার। দেহের গঠন ও সকল ক্রিয়াই শুধু রূপান্তরিত হবে না, শরীরের মূলতত্ত্বের বা ধাতুরও হবে রূপান্তর যার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর যে প্রাকৃতিক নিয়ম এখন অনিবার্য তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে।

কিন্তু জীবন একাধিক ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত। সেই জন্য প্রকৃত দিব্য জীবন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে স্থাপিত হতে পারে না। বস্তুত: দিব্যজীবন সমষ্টিগত ও সামূহিক। এখন মানুষের জীবন অজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে আমাদের সামাজিক জীবন বিবাদ, বিসম্বাদ, অনৈক্য, বৈরীভাব, এ সবের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। বিভাজক অহঙ্কারকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবন-চক্র প্রবর্তিত তার কেন্দ্রে নেই মিলনের সূত্র আত্মা। আমাদের মানসচেতনার ভূমি থেকে অতিমানসভূমিতে উত্তরণ হলে, আমাদের সত্তা ও চেতনা অতিমানসের দ্বারা রূপান্তরিত হবে। আমরা মনোময় পুরুষ থেকে বিজ্ঞান-ময় পুরুষ হয়ে উঠব। ভেতর থেকে এই আধ্যাত্মিক উত্তরণের ফলে আমাদের প্রকৃতিও— মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক সত্তাও—অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানময়ী হবে, অদিব্য প্রকৃতি দিব্য হবে। তার একটি ফল হবে এই সংসারে অন্যসকল ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ

জ্ঞান যার সঙ্গে থাকবে তাদের বিকাশের ধারা ও প্রণালীর বোধ। এই জ্ঞান পেলে মানুষের অন্যের বিরুদ্ধে ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদির স্থান থাকবে না। জাগতিক মানুষ ভাগবত হয়ে ভগবানের সত্তায়, চেতনায় ও আনন্দে নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে। অন্য সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যে সেই একই ভগবানের জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে ও তাদের আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে সংসিদ্ধির পথে চালিত করছে তাদের পরিপূর্ণতার দিকে, এই সত্য স্পষ্টভাবে জানা থাকলে সকলের জীবনই এক হিসাবে বিজ্ঞানময় মুক্তপুরুষের জীবনের অন্তর্গত হবে। দিব্যজীবনের ভিত্তি ভাগবত জ্ঞান, চিৎশক্তি, দিব্যপ্রেম। তার সদ্বস্তুগত রূপের ভিত্তি সুষমা ও সামঞ্জস্য। দিব্যজীবন হবে না শুষ্ক ও নীরস। সাধারণ অধ্যাত্ম-জীবন আত্মমুখী, বিশ্বাতীত ভগবৎ-অভিসারী। বিজ্ঞানময় দিব্যজীবন পূর্ণ ভগবানের জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সমষ্টিগত সত্যকে এই জগতে সমষ্টিগত জীবনে অভিব্যক্ত করতে উন্মুখ। জীবনের মূলতত্ত্ব ভগবানকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সেই উপলব্ধিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও কর্মে রূপায়িত করা দিব্যজীবনের লক্ষ্য। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র, সমাজ সবই হবে দিব্য জীবনের অন্তর্গত। কিন্তু সব কিছুরই হবে নূতন মূল্যায়ন। বিজ্ঞানময় অতি-মানস মুক্তপুরুষ এই সব কর্মের প্রতিটির মধ্যেই ফুটিয়ে তুলবেন ভাগবতী ইচ্ছার ছন্দ। ভগবানের জন্যই তার সত্তা ও জীবন। সব কিছুর মধ্যে সচ্চিদানন্দকে অভিব্যক্ত করাই তার ব্রত, তার একমাত্র লক্ষ্য। এই মহান ব্রত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে অতিমানস চেতনা, জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দ লাভ করা অনিবার্য। আমাদের সত্তা ও প্রকৃতিকে পরিণত করতে হবে অতিমানস সত্তায় ও প্রকৃতিতে। জগতে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা, চিন্ময় তত্ত্ব মৃন্ময় জড়ের মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্তি সচ্চিদানন্দের অভিপ্রায়, মনোময় জীবকে বিজ্ঞানময় পুরুষে পরিণত করা বিশ্ব-প্রকৃতির লক্ষ্য। পূর্ণজ্ঞান, স্বাতন্ত্র্য ও জগতে অমরত্ব লাভ মানুষের শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম আস্পৃহা। এ তিনটি বাস্তবিক একই সিদ্ধির তিনটি দিক। সংসারে ভগবানের অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রকৃতির লক্ষ্য ও মানুষের গভীরতম অভীপ্সা সার্থক করার একমাত্র ও অনিবার্য সাধন অতিমানস বিজ্ঞানচেতনা।

একটি ঘোষণা

কিনিসের উপর-উপর দেখে কিছু লোক প্রশ্ন করতে পারে—এ কেমন যে এত বড়ো আশ্রম এই শহরে রয়েছে অথচ এখানকার লোকেদের বিরাগভাজন?

প্রথম এবং ত্বরিত উত্তর হল এই লোকেদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতি, বুদ্ধি, সহৃদয়তা এবং শিক্ষায় উন্নততর পর্যায়ে তাঁরা আশ্রমকে শুধু স্বাগতই করেন নি, তার প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং সদিচ্ছাও জানিয়েছেন। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বহু একনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত অনুগামী ও বন্ধু আছেন।

একথার পরে আমাদের অবস্থা স্পষ্ট।

আমরা কোনো বিশ্বাস বা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিনা।

আমরা কোনো প্রকার সরকারের সঙ্গে লড়াই করিনা।

আমরা কোনো সমাজশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিনা।

আমরা কোনো দেশ বা সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনা।

আমাদের সংগ্রাম বিভেদ, অচেতনা, অজ্ঞান, জড়তা এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে।

আমাদের প্রয়াস পৃথিবীর উপর ঐক্য, জ্ঞান, চেতনা সত্য প্রতিষ্ঠা করা, আর যা কিছু এই জ্যোতি, শান্তি, সত্য ও প্রেমের নবসৃষ্টির আগমনে বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

—শ্রীমা

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য : ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

CENTRAL LIBRARY

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বছরে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা পুরোনো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

2 APR 1979

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—৩০০ টাকা (সডাক ৩৪০ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫০ টাকা (সডাক ৫০০ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হয়ে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

।। গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ।।

১। ৩০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকদের জমা ৩০ টাকা থেকে হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ শেকসপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

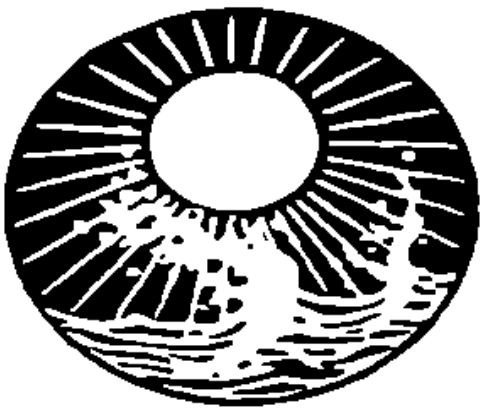

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৯

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল ১৯৭৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

একটি কবিতা	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	...	১২
সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	১৪
মায়ের আলাপ	...	২৪
সিন্ধ (নাটক)	পিয়ের কর্ণেই	৩৬

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

There is a purpose in
life — and it is the only
true and lasting one —
The Divine
Turn to Him and the
emptiness will go.
Lawrence

একটি কবিতা

শ্রীঅরবিন্দ

বন্ধু। প্রেমদীক্ষা লাভে ব্রাত্য সঙ্গদয়।
সন্ন্যাস-আলস্য জালে ধৃত উচ্চাশয়।
মহীয়ান সনাতন বিভূতি কৃষ্ণের
পতিত কলিকলিলে ধর্ম্ম-অধর্ম্মের।
বৃথা কর তিরস্কার, নিন্দা কর পথ।
বুঝিবে না তুমি মোর উগ্র মনোরথ।
অজ্ঞানের দাস হলে সত্বমিশ্র তমে,
নচেৎ এ উগ্রকর্ম্মে তব প্রিয়তনে
চিনিতে, চিনিতে কৃষ্ণে। বোধ তুমি রাধা
তারে বোঝ নাই, পৃথ্বী অসুর-সম্বাধা
হেরিয়া যে নামে সদা কাঁপায়ে অচল
উলটাইয়া শূলস্পর্শে গূঢ় সিন্ধুতল।
বোঝ তুমি বাঁশী, বোঝ তুমি বৃন্দাবন,
বোঝ নাই কংসহত্যা, কুরুক্ষেত্ররণ।
পরম বৈষ্ণব তুমি, কর বুদ্ধ-স্তব।
বিষ্ণু রুদ্র এক দেহ, ভিন্ন অবয়ব
ভুলেছ কি? ভুলেছ কি, দয়ার তাণ্ডার,
ক্রূর হত্যাকারী কল্কী এক অবতার।
রুদ্র কল্কীভাব বুকে সঞ্চরিয়া কানু
রাধার চরণপ্রান্তে পাতিয়াছে জানু।
পূর্ণ লয়া অবরুদ্ধ জননীর প্রাণে
ভৈরবী রাক্ষসী চণ্ডী মাতে উগ্ররণে।
এই যে বৌদ্ধের ধর্ম্ম মায়ামোহ-সৃষ্ট
অহিংসায় শুধচিত্ত, করুণায় ক্লিষ্ট,
করিবে না তীব্র লিপ্সা জগতের হিতে,
ধরিবে না জ্ঞান-অসি অজ্ঞান খণ্ডিতে,
দীনতায় তেজোহীন, আলস্যে নিঃসার,
মাধার নুওন, ভুঁড়ির বর্দ্ধন সার,
বুদ্ধের এ নহে ভাব। মায়ামুক্ত ধীর
কঠোর তপস্বী শ্রেষ্ঠ সেও মহাবীর,
বন্ধুবিত্ত দলি পায়ে, মত্ত মহাব্রতে,

ফিরে না তাকায়ে, গেল একদৃষ্ট পথে।
এই যে বৈষ্ণবতম বিগলিতচিত্ত,
শ্লথতায় কারুণিক, দৌর্ব্বল্যে নিবৃত্ত,
সতত অবসন্নগাত্র, কৃপাবিদ্ধ-মর্ম্ম,
আধ্যাত্মিক কাননদে বীর্য্যহারা ধর্ম্ম,
বিশ্ববীর শ্রীকৃষ্ণের আরাধক বলে
তাঁর বাক্য, তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মে বাক্যে দলে,
দয়া প্রেম বলি সদা যাথার্থ্য দয়ার,—
প্রেমের প্রখর সত্য করেছে অসার—
নহে চৈতন্যের দীক্ষা। প্রচণ্ড সুধীর
তীব্র প্রেম, তীব্র ক্ষমা, তমোমুক্ত বীর
গৌরাঙ্গ সে শচীসুত।
দেখনি সাগর?
শুধু মহেশ্বর যেন,—অগণন স্তর
নিশ্চল নিগূঢ় শান্ত, অলক্ষ্য বিস্তার,—
অগণন নীল নৃত্য উপরে তাহার।
হাসিছে কাঁদিছে ঢেউ,—বিশাল তরঙ্গে
পায়ে পড়ে পৃথিবীর, চুম্বে নানা রঙ্গে।
কিন্তু সে আনন্দময় ক্রীড়া জলধির
হইবে না কভু যদি, প্রতিষ্ঠা গভীর,
অচল অতল গুহা করে না ধারণ
গূঢ়চেতা মহাসিন্ধু অমাপ্য যোজন
স্বদীপিত অন্ধকারে নীরব একেলা।
মহতী সে স্তব্ধতায় এই নৃত্য খেলা।
দেখ নাই পুনঃ যবে বায়ুর তাড়নে
ক্রুদ্ধ উঠে অনিরুদ্ধ,—যোজনে যোজনে
গরজিছে ভীম সিন্ধু নির্দ্দয় অপার,
অনন্ত-ক্রূরতা-মূর্ত্তি, রোষের বিস্তার
হাসিছে আকাশ জুড়ি। আরাবে বধির
অট্টহাস্যে সিংহনাদে ক্রূর জলধির,
ডোবে তরী, ডোবে নর। শোনে কি ক্রন্দন,
নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় মত্ত আলিঙ্গি' পবন?
অন্য এই ক্রীড়া, অন্য নৃত্য, অন্য স্বর,
এ চুম্বন অন্য,—অথচ সেই সাগর।
বলিবে কি তুমি, কোন্ সয়তান তবে
হাসে এই ভীম হাস্যে, ডাকে এই রবে?

কোন্ রাক্ষসের হেন দৃপ্ত অত্যাচার
ক্রীড়াচ্ছলে? এ দারুণ আলিঙ্গন কার?
জান সে রাক্ষসে তুমি। নিরর্থ আবার,
ব্রজবালা চেনে ব্রজে বংশীরব তার।
বৃথা বল, অশুভ সৃজন মানবের;
বৃথা বল ক্রূরতা খেয়াল রাক্ষসের।
এই ভীম রুদ্রক্রীড়া করেছেন তিনি,
যাঁরে বলে শ্যামময়, প্রেমময় যিনি।
কেন করে, যাতে কেন এ ভীম আহবে,—
মায়ামুক্তি এই মূল্যে চিনিয়া কেশবে।
অশুভে যখন দেখি শুভ সৃষ্টি তাঁর,
ক্রূরতায় চিনি দয়া, তখন নিস্তার।
সর্ব্ববোধ যায় ভেঙ্গে, সর্ব্ব পাপ মরে,
মুক্ত অনন্তনিবাসী জীবাত্মা বিচরে।
আর নাই কেহ কার সবাই তাঁহার,
জন্মমৃত্যুস্রোতে চলে লীলা অনিবার।
লীলাময় তপোময় বিশ্বে নারায়ণ
অনন্ত চৈতন্য-রস আনন্দ-স্পন্দন।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৩শ সূক্ত

১। প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বহিষ্ঠমর্চাগ্নৈ।
গমদ্দেবেভির্যা স নো যজিষ্ঠো বহিরা সদৎ ॥১॥

প্র (+অর্চ)—পাঠ কর
বঃ—তোমাদের
দেবায়—দেবতার জন্য
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
বহিষ্ঠম্—বৃহত্তম, পরম শক্তিপূর্ণ (স্তোত্র)
অর্চ (প্র+)—পাঠ কর
অগ্নৈ—এই
গমৎ (আ+)—সে যেন আসে
দেবেভিঃ—দেবতাদের সঙ্গে
আ (+গমৎ)—সে যেন আসে
সঃ—সে
নঃ—আমাদের কাছে
যজিষ্ঠঃ—পরম যজ্ঞসমর্থ
বহিঃ—কুশাসন
আ (+সদৎ)—আসন গ্রহণ করে
সদৎ (আ+)—আসন গ্রহণ করে

এই অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরম শক্তিময় মন্ত্রটি উচ্চারণ কর, সে যেন সকল দেবতাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক সে, এখানে এসে আসন গ্রহণ করে যেন ॥১॥

২। ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত ঊতয়ঃ।
হবিষ্মন্তস্তনীড়তে তং সনিষ্যন্তোঽবসে ॥২॥

ঋত-বা—সত্যময়
যস্য—যার
রোদসী—দ্যুলোক-ভূলোক

দক্ষম্—সত্য-নিরীক্ষণকে
সচন্তে—ধরে থাকে
উতয়ঃ—রক্ষক শক্তি সব
হবিষ্মন্তঃ—আহুতি-দাতারা
তম্—তাকে
ঈড়তে—পূজা করে
তম্—তাঁকে (পূজা করে)
সনিষ্যন্তঃ—যখন তারা বিজয় কামনা করে, ভবিষ্যৎ তারা
অবসে—রক্ষার জন্য

সত্যময় তিনি, দ্যুলোক-ভূলোক তাঁরই, রক্ষণ-শক্তিরা ঘিরে আছে তাঁর সত্য নিরীক্ষা; আহুতি নিয়ে এসেছে যারা তারা তাঁকেই পূজা করে, তাঁকেই পূজা করে রক্ষণের জন্য যখন তারা চলে বিজয়ের অভিমুখে ॥২॥

৩। স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ঘঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত ধাতা যো বনিতা মঘম্ ॥৩॥

সঃ—সে
যন্তা—নিয়ন্তা
বিপ্রঃ—জ্ঞানময় দ্রষ্টা
এষাম্—এ সকল
সঃ—সে
যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের
অথ—এবং
হি—নিশ্চয় করে
ঘঃ—সে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
তম্—সেই
বঃ—তোমরা, তোমাদের
দুবস্যত—কর্মে নিযুক্ত কর
ধাতা—দাতা হয়ে
যঃ—যে
বনিতা—জয় করবে
মঘম্—পরিপূর্ণতাকে

এই সকল যজ্ঞে তিনিই হলেন নিয়ন্তা, জ্ঞানদীপ্ত দ্রষ্টা, একমাত্র তিনিই; এই অগ্নিকে তোমরা কর্মে নিযুক্ত কর, দাতা তিনি, তিনি জয় করে নিয়ে আসবেন পরিপূর্ণতাকে ॥৩॥

৪। স নঃ পর্ষাণি বীতয়েঽগ্নির্যচ্ছতু শন্তনা।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্সুষা ॥৪॥

সঃ—সে
নঃ—আমাদের
পর্ষাণি—সকল স্থিতি, সকল প্রশান্তি
বীতয়ে—অগ্রগতির জন্য, যাত্রার জন্য
অগ্নিঃ—অগ্নি
যচ্ছতু—দান করে যেন
শন্-তনা—পরম সুখকর
যতঃ—যেখান থেকে
নঃ—আমাদের
প্রুষ্ণবৎ (আ+)—বর্ধিত হয়
বসু—সম্পদ
দিবি—স্বর্গস্থ, স্বর্গের
ক্ষিতিভ্যঃ—সকল ভূমি হতে
অপ্সু—সকল জলধারায়
আ (+প্রুষ্ণবৎ)—বর্ধিত হয়

আমাদের অগ্রগতির জন্য সেই অগ্নি দান করে যেন পরম সুখকর সকল প্রশান্তি সেই স্থানে যেখান হতে বর্ধিত হয় স্বর্গের সম্পদ, সকল ভূমির সম্পদ, সকল জলধারার সম্পদ ॥৪॥

৫। দীদিবাংসমপূর্ব্যং বসুভিরস্য বীতিভিঃ।
রুরুক্ষাণো অগ্নিনিন্ধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্ ॥৫॥

দীদিবাংসম্—প্রজ্বলন্ত
অপূর্ব্যম্—অপূর্ব, অনুপম
বসুভিঃ—প্রাচুর্যময়
অস্য—এর
বীতিভিঃ—বীশক্তিসকল দিয়ে
রুরুক্ষাণঃ—জ্যোতির্ময়েরা
অগ্নিম্—অগ্নিকে
ইন্ধতে—প্রজ্বলিত করে
হোতারম্—আহ্বাতা যিনি
বিশ্পতিম্—লোকাধিপতি
বিশাম্—সকল লোকের

এই অগ্নিরই প্রাচুর্যময় বীশক্তিদের আশ্রয়ে জ্যোতির্ময়েরা প্রজ্বলন্ত এই অপূর্ব অগ্নিকে সমিদ্ধ করে ধরেন ; অগ্নি হলেন দেবতাদের আহ্বাতা, সকল লোকের লোকাধিপতি ॥৫॥

৬। উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ ॥৬॥

উত—আরও
নঃ—আমাদের
ব্রহ্মন্—বাক্-ব্রহ্মের
অবিষঃ—রক্ষা কর
উকথেষু—সকল উক্তিতে
দেব-হূতমঃ—দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আহ্বাতা
শম্—সুখস্বস্তি নিয়ে
নঃ—আমাদের জন্য
শোচ—প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ
মরুৎ-বৃধঃ—প্রাণশক্তির বর্ধক
অগ্নে—হে অগ্নি
সহস্র-সাতমঃ—সহস্রের বিজয়ে পরমশক্তিমান

আমাদের বাক্যের মধ্যে, আমাদের উক্তির মধ্যে আমাদের রক্ষা করে চল তুমি, তুমি হলে দেবতাদের পরম আহ্বাতা, সুখ-স্বস্তি নিয়ে তুমি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ আমাদের জন্য, হে অগ্নি, প্রাণশক্তির বর্ধক তুমি সহস্রের পরম বিজয়ী শক্তি ॥৬॥

৭। নূ নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্যং বরিষ্ঠমনুপক্ষিতম্ ॥৭॥

নূ—এখন
নঃ—আমাদের
রাস্ব—দাও, দান কর
সহস্রবৎ—সহস্র-দাতা
তোকবৎ—তনয়দাতা
পুষ্টিমৎ—পুষ্টিদাতা
বসু—সম্পদ
দ্যুমৎ—দীপ্তিময়
অগ্নে—হে অগ্নি
সুবীর্যম্—বীর্যময়
বরিষ্ঠম্—প্রাচুর্যময়
অনুপ-ক্ষিতম্—ক্ষয়হীন, অক্ষয়, অফুরন্ত

আমাদের তবে দাও তুমি এমন সম্পদ যাতে নিয়ে আসে সহস্রকে, তনয়কে, পুষ্টিকে, নিয়ে আসে দীপ্তি, সুবীর্য যা অফুরন্ত, যা অক্ষয় ॥৭॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্যসহ

১—আমি যখন কথা বলি বিচারবুদ্ধি ভাবে, "এই কথা বলব আমি"—কিন্তু ভগবান আমার মুখ থেকে কথা তুলে নেন, জিহ্বা বলে এমন কিছু বিচারবুদ্ধি যাতে ভয়ে কাঁপে।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বলছেন "আমি", তিনি বলছেন নিজের কথা এবং তাঁর আপন অনুভূতির কথা। এ হল প্রতীকী এবং তা অনেকের পক্ষেই প্রযোজ্য হতে পারে—এ কথা বলতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা মোটেই নয়।

বলবার সময় যা বলতে চাও তা না বলে অন্য কিছু বলে ফেলা এ-অভিজ্ঞতা সচরাচর অনেকেরই হয় কিন্তু তাহল এখানে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে তার বিপরীত; অর্থাৎ যখন তুমি আন্তর প্রশান্তিতে বসে সাধ্যমত সব থেকে বেশি যুক্তিবিচারের সঙ্গে কাজ করছ, তুমি স্থির কর কোথায় কি বলতে যাচ্ছ, কোন জিনিসটা যুক্তিবিচার-সম্মত, কিন্তু বলবার সময় প্রায়ই যত নিম্নতন প্রবৃত্তি, অযৌক্তিক আবেগ ও প্রাণময় প্রতিক্রিয়া জিহ্বায় ভর করে আর তুমি বলতে বাধ্য হও এমন কিছু যা বলা উচিত ছিল না।

এখানে ব্যাপারটা একই ধরনের হলেও,—আগেই যেমন বললাম, বিপরীতধর্মী। সেখানে যুক্তি-বুদ্ধির নিম্নস্তরের প্রণোদনা আবেগ-উত্তেজনার মধ্যে তোমায় বলতে বাধ্য করে, সেখানে বিপরীত পক্ষে ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসে এক অনুপ্রেরণা, জ্যোতি এক যুক্তিবিচার হতে মহত্তর জ্ঞান এক তোমার বাক্‌কে আবিষ্ট করে আর তুমি বলতে বাধ্য হও এমন কিছু যা সবচেয়ে আলোকিত যুক্তিবুদ্ধির সহায়েও তুমি বলতে পারতে না।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলছেন যে "বিচার-বুদ্ধি ভয়ে কাঁপে" কারণ মানুষী এলাকার মধ্যে ঊর্ধ্বতন সত্য সব সর্বদাই দেখায় যেন আপাতবিরোধী সত্যের মত, যুক্তিবিচার বিরোধী উদ্ভাসনের মত; ঊর্ধ্বলোক হতে যা-কিছু আসছে তা বুঝতে যুক্তিবুদ্ধি অক্ষম বলে নয়, তার কারণ হল যুক্তিবুদ্ধি যা বুঝতে পেরেছে স্বীকার করেছে তা থেকে এই সব উদ্ভাসন সর্বদাই অগ্রসর কিছু—অনেক অগ্রসর। মানুষী বিচারবুদ্ধি আজ যা দেখে যুক্তিসম্মত কিছুকাল আগে তাই ছিল তার কাছে আপাতবিরোধী ও পাগলামি; আর সম্ভবতঃ—বলা যেতে পারে নিশ্চিতই এই সব অপ্রত্যাশিত, আপাতবিরোধী, বিপ্লবাত্মক উদ্ভাসন যত এখন প্রকট হয়ে যুক্তিবুদ্ধিকে কাঁপিয়ে তুলছে, আগামী কালে তারাই হবে খুবই যুক্তিসম্মত জ্ঞান আর তারা নিজেরাই তখন কেঁপে উঠবে নূতন সব উদ্ভাসনের সম্মুখে।

এমন কিছু যা নিরন্তর গতিময়, নিরন্তর উন্নতিশীল, নিরন্তর রূপান্তরমান—এই অর্থই শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দিতে চেষ্টা করেছেন যখন এই সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি আমাদের বলছেন। সূত্রগুলি জিনিস সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু বোধ সব কিছুকালের জন্য নাড়িয়ে দেয় আমাদের এগিয়ে দিতে, জগতে যা-কিছু ফুটে ওঠে আর এই যে বিশ্ব চলেছে, সদাই

চলেছে উর্ধ্বতর নহতর এক সত্যের দিকে সেগব সম্বন্ধে পূর্ণ আপেক্ষিকতার অনুভব আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে।

আমাদের কাছে, বর্তমানে, মতিমানস রূপান্তর হল সর্বোচ্চ সত্যের প্রকাশ, এই মহা "বিপ্লব"ই পৃথিবীতে আমাদের সিদ্ধ করতে হবে; আর নিশ্চিতই, অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এটা না হয়ে পারে না যে তারা এই "বিপ্লব"কেই পরম ও চরম বলে অনুভব করবে, না হলে তারা সেটি সিদ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জোর দিচ্ছেন যাতে আমরা ভুলে না যাই যে ওই পরমসিদ্ধিও আপেক্ষিক, আর এই বিশ্ব-প্রকাশ সর্বদাই হবে আপেক্ষিক আরও এক পরতর পরমের তুলনায় যা হল অনভিব্যক্ত আর কালে যা অভিব্যক্ত হবে।*

২৬-৯-৫৮

---

* অনুবাদক : শতদল

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৪র্থ পর্ব—জন্ম ও সন্ধান
১ম সর্গ—অগ্নিশিখার জন্ম ও শৈশব

বাসনাচক্রে লীলারঙ্গিনী সে
মহাজ্যোতিষ্কেরে ঘিরি চলে সে অধিকার নাই তারে স্পর্শ করে.
ধেয়ে সবেগে সুদূর অজ্ঞাত এক লক্ষ্যের অভিমুখে
পৃথিবী অনুসরণ করে সূর্যের এই অন্তহীন পথযাত্রা।
অর্ধজাগ্রত মন এক শূন্যের দোলায়
নিশ্চেতনার বক্ষোপরে স্বপ্নে সৃষ্টি করেছে জীবনধারা.
বন্ধন করে চলেছে চিন্তার কর্মের এই সীমাবদ্ধ জগৎ
পার হয়ে অসীমের অচল সমাহিতি।
এই পৃথিবীর সঙ্গে ছুটে চলেছে বিপুল এক অক্ষয় নৈঃশব্দ:
রহস্যচিত্ত এক ধাবমান চক্রপরে বন্দিনী সে.
সংযোগ তার আকাশের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে।
তারকামণ্ডলীর এই সন্দেহসঙ্কুল শুব্ধতা ভেদ করে
চলেছে সে অলক্ষিত এক পরিণতি অভিমুখে.
গতি-ছন্দ তার বেগে চলে মহাকালের সুদীর্ঘ ঘূর্ণন।
রক্তবর্ণ নেমির নিরন্তর গতিবেগে
দিনের পর দিন বেগে চলে যায় যেন বিবিধবর্ণের শলাকামণ্ডলী.
আকাশের বিচিত্র বিলাসের মোহনশ্রী পার হয়ে
ঋতুরাজি ব্যূহবদ্ধ হয়ে অর্ঘবহ নৃত্যলীলায় অঙ্কিত করে যায়
সম্বৎসরের প্রতীক শোভাদৃশ্য।
দগ্ধ মাটির ত্বিনিত শ্বাস পার হয়ে
গ্রীষ্ম বীর পদক্ষেপে ছড়িয়ে চলেছে তার রুদ্র মধ্যাহ্নের বিরাট ঐশ্বর্য সব,
তার উত্তপ্ত আলোকের পীড়ন সবলে চিহ্ন রেখে যায়
রেখে যায় বিরাট অগ্নিবর্ষী আকাশের সুনীল স্বাক্ষর।
তারপর অগ্নিসমাধি যখন গ্রন্থিল জট ভেদ করে
বর্ষাধারা নেমে এল তীব্রবেগে উত্তাপের ছিন্ন পাখা উড়ায়ে,
বিদ্যুৎ-বিলাসে চমকিত করে বাতাসের অস্থির তন্দ্রা,
হানে তার সঞ্জীবনীপ্রবাহের আঘাত মূর্ছাহত বৃত্তিকাপরে,

ঢেকে রাখে তার দীপ্তবর্ষণ আর গর্জন আর ঝঞ্ঝাবাহন অন্ধকার দিয়ে
তারকারক্ষিত দুয়ার যত স্বর্গের ক্ষীণদৃষ্টির,
কিংবা তার দয়িতের স্থিরনম্র দৃষ্টি হতে দূরে
পৃথিবীর পিঙ্গল মুখমণ্ডল পুঞ্জীভূত মেঘের অবগুণ্ঠন দিয়ে আবৃত করে রাখে।
বিপ্লবের সৈন্যদল কালক্ষেত্র পার হয়ে যায়,
মেঘমালার অন্তহীন অভিযান পৃথিবীকে ঘিরে ধরে অবরোধে
ঝঞ্ঝার ঘোষণানিনাদ পূর্ণ করে বয়ে গগনমণ্ডল
বজ্রের দুন্দুভি পরিচয় দেয় যুদ্ধোদ্যত দেবতাদের।
যাত্রী এক পার্শ্ববর্তী বিক্ষুব্ধ সাগর হতে
ঘন-কেশর প্রাবৃট অশ্বসব হ্রেষারবে ছুটে চলে পৃথিবীর প্রহরক্রম ভেদ করে :
বর্শাফলকের ঝাঁক যেন ছুটেছে বার্তাবহ যখা
বিপুল বিদ্যুৎবালা খণ্ডিত করে দেয় দিক্‌চক্রবাল,
আর, চতুর্দিকের স্বস্তিরত শিবিররাজি হতে যেন নিক্ষিপ্ত হয়ে,
জুড়ে দেয় গগনের প্রান্ত যত উদ্বুদ্ধ অনাবৃত অঙ্ক
বিপুল বর্ষার আলোড়ন, গর্জন আর উচ্ছ্বাস,
সুদীর্ঘ গুরুরেখ বৃষ্টিধারা, উড়ন্ত ঝঞ্ঝার উচ্ছল কলরব,
বায়বীয় মুখমণ্ডলের ভিড়, বায়বীয় পদক্ষেপের দ্রুতগতি
ছুটে চলেছে লুণ্ঠিত জর্জরিত প্রান্তরের বুক বেয়ে
স্বর্গের জলস্রোত নশ্বর হয়ে আসে, ক্রমে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে নিমজ্জিত
পৃথিবীর পরে।
তারপর সব ছুড়ে এল দ্রুত দীর্ঘায়িত পদক্ষেপ, উদ্ধ্বনিপ্লুত ছন্দ,
অথবা শোনা যায় শুধু ঝঞ্ঝার চিৎকার, জলের প্রপাত।
কুয়াশা নেমে আসে যেন দিনের ধূসর অঙ্গনপরে,
দিনমানের মলিনা আপনাকে ছড়িয়ে যায়, জুড়ে দেয় পূর্বাহ্নকে সায়াহ্নের সঙ্গে,
কর্দমে বারিধারায় সিক্তিত হয়ে শেষ হয় গিয়ে কৃষ্ণকালো অন্ধকারে।
দিনমান অর্ধ-অন্ধকারের মলিন বসন গায়ে তুলে ধরে।
আলো চেয়ে রয় ভোরের বিবর্ণ দর্পণে, দেখে সেখানে
আপনার আনন, যমজ যেন অর্ধদীপ্ত রাত্রির
বিপুল বর্ষণ আর বিন্দুকরণ আর কুয়াশার সিঞ্চন দোলায় সকলে,
শুষ্ক মৃত্তিকা পরিণত হয় কর্দমে আর ধূমায়িত পঙ্কে
পৃথিবী কাদাজলে জলাকার আর আকাশ মূর্ত বিষণ্ণতা।
এই স্যাঁতসেতে ভিজে দিনের পর দিন বন্দী সূর্যকে দেখে নাই কেউ চোখে।
বাতাসের এই বিষাদগ্রস্ত বিশ্রাম বিঘ্নিত হয় নাই যখন কোন বিকোভে,
অথবা যখন স্তিমিত কিরণরেখা এক কষ্টে ভেদ করে চলে রোদনরত
মেঘের ভিতর দিয়ে
ফিরে আসা চক্ষুজলে ঢাকা বিমর্ষ হাসির আভার মত,

তখনও উজ্জ্বল আলোকের প্রতিশ্রুতি বিফল হয়ে যায় তৎক্ষণে
অথবা, হয় প্রত্যাখ্যাত অনতিবিলম্বে, মুছে যায় ক্ষণজীবী প্রত্যাশা যেন।
অবশেষে বিপুল প্লাবন এক ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ কর্দমের পরে,
ক্রমে ক্ষীণতর আঘাত এক চলে যায় স্তব্ধ ক'রে রেখে সব,
রয় শুধু ক্ষীয়মান মন্থর জলস্রোতের কালিমাময় অপসরণ
আর তরুশাখাবলীর ক্ষীণ মর্মর আর সবুজ আলোড়ন।
পৃথিবীর ভাবপরিবর্তন এল : রয়েছে সে ঘুমন্ত বিশ্রামের কোলে,
প্রহরমান। চলে যায় ধীর আত্মতৃপ্ত পদসঞ্চরণে
সুবিস্তৃত প্রশান্ত বাতাসে বহন করে শান্তির স্মৃতি,
পৃথিবী হয়েছে প্রসন্ন সূর্যের সহচর।
প্রশান্তি এক নিকটে আসে ভগবৎ-সান্নীপ্যের মত,
অন্তর্মুখী সমাহিতি আলোক ছড়িয়ে দেয় পৃথিবী আর আকাশের পরে।
একত্ববোধ আর পরম পুলক
ভরে দেয় নিঃসঙ্গ হৃদয়ের ধ্যানমগ্নতা।
স্বপ্ন এক ঘুরে চলে ব্যোমতলের মুক্ত মন মাঝে
মহাকাল খুলে দেয় তার আনন্দের কক্ষ সব,
উল্লাস এক আশা এক প্রবেশ করে
অন্তরতম সত্তা উর্ধ্বে দৃষ্টি দেয় স্বর্গের ওপারে,
অন্তরতম চিন্তা প্রজ্বলিত করে এক গুপ্ত শিখা
আর আন্তর দৃষ্টি পূজায় রত এক অগোচর সূর্যের।
তিনটি ঋতু তাদের চিন্তাধারা নিয়ে চলে গেল দীপ্ত পদক্ষেপে,
তাদের একে একে নিরীক্ষণ করে আপূর্ণ প্রহরক্রম
সেই অগ্নিশিখার আশায় লুকিয়ে রয়েছে যে জ্যোতির্ময় গভীরে সব,
জেগে রয় যেন কোন মহাজাতকের জন্মতরে।
শরৎ পথ মেখিয়ে চলে তার চন্দ্রাবলীর মহিমায় ভূষিত হয়ে
স্বপ্নে দেখে তার পদ্মসায়রের ঐশ্বর্য যত,
এল এবে শীতের আর শিশিরের কাল, এল তাদের শান্ত শীতল প্রলেপ
প্রকৃতির বক্ষপরে এখনও নিমগ্ন অর্ধসুপ্তিতলে,
শৈথিল্য আর স্নিগ্ধ আরামের রং ছড়িয়ে গভীরতর করেছে
অন্তর্গামী বৎসরের স্থির সুষমা।
তারপর বসন্ত এল, উদ্দাম প্রেমিক, ঝাঁপিয়ে এল শতাপাতা ভেদ করে
পৃথ্বিবক্ষে তার নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে ;
তার আগমন অগ্নিশিখা যেন ইন্দ্রধনু বর্ণমালায় উজ্জ্বল,
বাহুযুগল তার বন্ধনী যেন আনন্দ-আবির্ভাবের।
তার কণ্ঠে ছিল সেই লোকাতীত মণ্ডলের অভিমুখে আহ্বান
যার গোপন স্পর্শ আমাদের মর্ত্য জীবনের পরে

বিশ্বসৃষ্টিকর আনন্দের শিহরণকে চিরন্তন করে রাখে,
সনাতন মাধুর্যকে নিত্য নব রূপ দান করে
আর মৃত্যুর এবং মহাকালের হাত থেকে রক্ষা করে অক্ষুণ্ণ অপরিবর্তিত রেখে যায়
প্রকৃতির মোহিনী শক্তির উপর আমাদের হৃদয়ের নিবিড় আকর্ষণ,
চিরকাল একই অথচ চিরন্তন করে রাখে
সেই স্পন্দন পুরাতন আনন্দে যে নিত্যনন্দিত
রেখে যায় তেমনি সৌন্দর্য আর পুলক আর জীবনধারণের উল্লাস।
তার আগমন নিয়ে এল যাদু এক, মোহ এক,
তার স্পর্শে জীবনের শ্রান্ত হৃদয় হয়ে ওঠে প্রফুল্ল তরুণ;
পৃথিবীর বুকে হর্ষকে স্বেচ্ছাবন্দী করে রাখে সে।
তরুণ এক দেবতার আলিঙ্গনে নিবদ্ধ যেন পৃথিবীর অঙ্গরাজি
আপনার দিব্য আবির্ভাবের আবেগে রূপান্তরিত এখন,
গাঢ় চুম্বনে সুন্দর করে ধরে প্রিয়ার দেহ।
রভসের লোভে অধীর হয়ে এসেছে সে,
কোকিলকণ্ঠের তৃপ্ত উদ্‌গীথ ছড়িয়ে দিয়েছে সে,
শিখিপুচ্ছ উষ্ণীষ আপনার দুলায়ে চলে তরুশাখা পরে
তার নিশ্বাস সাদর আহ্বান জানায় যেন আনন্দের দিকে,
তারই দৃষ্টি মূর্ত নিষ্পা ওই ঘন নীলিমা।
মুকুল স্বর্গীয় প্রবেগে অভিভূত রক্তধারা
সমৃদ্ধ যেন সহজাত ভাগবত ইন্দ্রিয়সম্ভোগে;
সৌন্দর্যে ধরা দিয়েছে ছন্দ এক, ছড়িয়ে পড়েছে
তুলে ধরেছে পুনঃপুনঃ জীবনের উল্লাস-শিহরণ
অনন্ত বৃত্তিসব স্পর্শ করে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তমালা।
ইন্দ্রিয়ানুভূতি দেবসদৃশ এক ঘনীভূত তীব্রতার
প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও ধরে দেয় এক পুলক-আবেগ
শ্রুতি-দৃষ্টির বিষয় যত এক অভিন্ন লাবণ্যে গাঁথা।
মোহমুগ্ধ ধরিত্রীর জীবন হয়ে উঠল
মাধুর্যের আর আলোকের আর সঙ্গীতের প্রবল আলোড়ন,
বর্ণের আর পুলকের মহোৎসব,
সূর্যকিরণের স্তবমালা, উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ:
বহুকণ্ঠের বন্দনগীত তোলে পুণ্য সুর তার
আর, ধূপের মত উঠে চলে তরুশাখাবলীর দোলায়িত ধূপদানী হতে যেন,
সৌরভের যজ্ঞে ভরে গিয়েছে কালের ধারা।
অশোকফুল জ্বলে যেন রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা যত,
বিমল বাসনার বিশুষ্ক নিশ্বাসের মত
শুভ্র যূথিকা ছড়িয়ে রয়েছে প্রীতিমুগ্ধ বাতাসের কোলে;

কোমল আনুকূল্যে আর্দ্র করেছে
প্রেমোন্মত্ত কোকিলের কণ্ঠ, ধূসর ভ্রমর
করে গুনগুন মধুমঞ্জরীর সুরভিতলে।
সূর্যালোকে ফুটে ওঠে মহান এক দেবতার সোনার হাসি।
প্রকৃতিদেবী যোগ দিয়েছেন সদলে সৌন্দর্যের মহোৎসবে।

দেবতাদের এই সমুচ্চ সঙ্কুল মুহূর্তে
যখন তারা সাড়া দেয় পৃথিবীর আকুতির এবং আনন্দের জন্য তার
আকুল আহ্বানে
দেখা দিল এসে মহিমা এক অন্যলোক হতে।
পার্থিব কোলাহল সব হয়ে গেল নীরব
ব্যক্ত হল অক্ষুণ্ণ এক নিগূঢ় বাক্,
বিপুলতর প্রবাহ এক ভরে দিল এসে বিস্মৃতিময় মাটির দেহ
দীপ এক জ্বলে ওঠে, পুণ্য প্রতিমা এক স্থাপিত হয়।
নেমে এসেছে রশ্মি এক পৃথিবীকে করে স্পর্শ
সেতু তুলে দিয়েছে মানুষের মন আর ভাগবত মনের বিচ্ছেদ পরে
স্বর্গকে রূপান্তরিত করেছে মানুষী আকার দিয়ে,
প্রভা তার জুড়ে দিয়েছে আমাদের নশ্বরতাকে পরম অজ্ঞাতের সঙ্গে।
সচেতন সত্তা এক আপন স্বর্গীয় উৎস নিয়ে
অবতীর্ণ পৃথিবীর অসম্পূর্ণ আধারে,
অশ্রু ঝরে না তার এই মর্ত্য পতনের তরে,
দৃষ্টিপাত করে সর্বত্র আয়ত প্রশান্ত নয়ন খুলে।
ফিরে এসেছে কে লোকান্তর হতে,
পুনরায় গ্রহণ করেছে মানুষী নিঃশ্বাসভার,
চিরকাল যে যুদ্ধ করে এসেছে অন্ধকারের সঙ্গে আর আমাদের দুঃখের সঙ্গে;
ফিরে আবার সে গ্রহণ করেছে তার দিব্য-নির্দিষ্ট অসম্পূর্ণ ব্রত
মৃত্যু পার হয়ে, পার হয়ে যুগ-যুগান্তর
পুনরায় সে তার অতল হৃদয় নিয়ে দাঁড়িয়েছে মহাকালের সম্মুখে।
পুনরায় আবার নূতন করে আরম্ভ, নূতন করে ব্যক্ত
অবগুণ্ঠিত ছিল যে প্রাচীন অন্তরঙ্গতা পার্থিব দৃষ্টিতলে,
মহাকাল যে ভেঙে দিয়েছে প্রচ্ছন্ন সংযোগ,
পৃথিবীর ও স্বর্গের এক রক্তপ্রবাহ,
একদিকে যে মানুষী অঙ্গ শ্রম করে চলে এখানে
আর অন্যদিকে অদ্যাবধি অজ্ঞাত অনন্ত মহাশক্তি।
আবার শুরু হল সেই রহস্যাপ্লুত গভীর প্রয়াস
সেই দুঃসাহসী পণরঙ্গ বিশ্বব্যাপী লীলায়।

যখন থেকে এই অন্ধ ঘূর্ণমান মণ্ডলের উপরে
প্রতিটি জীবকোষ প্রথম শিহরিত হয়ে উঠেছে মনের আলোকস্পর্শ পেয়ে
আর প্রাণধারা জড়ময় কোষকে অধিকার করেছে
নিশ্চেতনাকে দুঃখ দিয়ে অনুভূতির প্রয়োজন বোধ এনেছে,
যখন থেকে আনন্ত্যের নৈঃশব্দ্যে জেগে উঠেছে বাক্ এক,
তখন হতে জ্ঞানময়ী মাতা এক প্রকৃতির বুকে কাজ করে চলেছে
আনন্দ ঢেলে দিতে প্রযত্নের অভাবের হৃদয়তলে,
জীবনধারার স্খলন্ত সার্থকতের পরিপূর্ণতার দিকে জোর করে নিয়ে যেতে,
চাপিয়ে দিতে তামস গহ্বরের পরে স্বর্গের সংবেদন,
বুক জড়কে এনে দিতে তার ভগবানের চেতনা।
আমাদের অধঃপতিত মন ভুলে যায় যদি উঠে চলতে,
যদিবা আমাদের মানুষী উপাদান বাধা দেয় বা ভেঙে পড়ে,
অটুট রাখে সে তার সংকল্প, আশা করে মাটির হবে দেবতনু
ব্যর্থতা দমন করে না, পরাজয় উচ্ছেদ করে না
মহাকাল তারে শ্রান্ত করে না, মহাশূন্য তাকে পরাভূত করে না,
যুগযুগান্তর তার আবেগমাত্রাকে হ্রাস করে নাই
স্বীকার করে না সে মৃত্যুর বা নিয়তির কোন বিজয়।
নিত্য সে জীবকুলকে সবলে নিয়ে চলেছে নূতন প্রয়াসের অভিমুখে
নিরন্তর তার যাদুময়ী আনন্ত্যশক্তি
জড় অসাড় উপাদানসকলকেও বাধ্য করে ঊর্ধ্বমুখী হতে,
অন্তহীন কাল যেন রয়েছে তার বৃথা ব্যয়ের তরে
তাই সে শাশ্বতের সার্থকবীজ ছড়িয়ে দেয়
অর্ধজীবন্ত আর জড়ের আধারের পরে,
স্বর্গের আনন্দ যখন করে প্রাণের আবিলভরা পঙ্কনাশে,
ঢেলে দেয় দেবত্বের আকৃতি অনাবৃত পাশব আকারের মধ্যে
অমরত্বকে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখে।
সেই তীব্র এষণা পুনরায় ধারণ করে পার্থিব আকৃতি।
মানস সত্তা এক শক্তিলাভ করেছে সত্যের অব্যয় আসন হতে,
গঠিত হয়েছে সত্যদৃষ্টি আর তার প্রয়োগক্ষমতা তবে;
যন্ত্রসব কল্পিত হয়েছে পরম পারিপাট্যে
ভগবানের পূর্ণপ্রকাশের তরে পার্থিব পরিচয়ের আশ্রয়ে।
এই অভিনব অবতরণের প্রবেগে দেহ এক রূপ নিয়েছে
গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অপরিচিত এক মোহনতর দেহে।
তবে এখনও ভবিষ্যবাণীমাত্র, শুধু ইঙ্গিত,
যাদুময় অদৃশ্য বৃত্তের দীপ্ত একাংশ শুধু
মরজীবনের আকাশে এসে ধরা দিয়েছে

সমুজ্জ্বল যেন একফালি হিরণ্ময় চন্দ্রকলা
ফিরে এসেছে সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে।
ঈষৎ-উদ্ভাসিত অপরিণত ভাবনা এক যেন
এলায়িত সে শয়ান বাক্‌হীন সুপ্তির আশ্রয়ে,
অন্তর্লীন, নিমজ্জিত জড়ের বিপুল সমাধিগর্ভে,
জগৎ-পরিকল্পের গভীর জঠরে শিশুর হৃদয় এক
ভাগবত নিশ্চেতনার দোলায় দুলে চলে
তপনরাজির বিশ্ব-আনন্দের প্রবেগে।
অবতারী মহাশক্তি এক অর্ধজাগ্রত আধার-অন্তরে
পোষণ করে লোকাতীত জন্মের নূক বীজ এক মহিমাময়
যার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এই প্রত্যক্ষ আবাস।
তবে অনতিবিলম্বে অন্তরাত্মার আর বাহ্যরূপের সংযোগসূত্র দৃঢ়তর হয়ে ওঠে ;
ছায়াচ্ছন্ন গহ্বর প্লাবিত হয়ে যায় নশ্বর সচেতন আলোকের প্রকাশে,
বীজ পরিণত হয় অপরূপ সুকুমার এক নওরীরূপে,
নওরী ক্রমে খুলে ধরে তার বিপুল স্বর্গীয় পূর্ণ শোভা।
তখনই সেই মহীয়সী হতে জন্মিল যেন মহত্তর জাতি এক।
এসেছে সে অদ্ভুত সন্দেহসঙ্কুল ধরণীর পরে
শিশুমনে আগে তার সুদূরের গৃহখানি
সন্তর্পণে জীবনযাপন তার অন্তরাত্মার জ্যোতির্ময় কোষ-অভ্যন্তরে সুরক্ষিত হয়ে,
মর্ত্যজনের মাঝে একক সে, সঙ্গী শুধু রয় তার স্বর্গের স্বজাতি।
এমনকি তার শৈশবের গতিবিধিমাঝেও অনুভব হয়
জ্যোতির সামীপ্য এক দূরে এখনও পৃথিবী হতে,
অনুভব যত অংশীদার নারা শুধু অনন্তের,
চিন্তারাজি যত দেবতাদের স্বভাবজাত, জন্মগত।
কোন প্রয়োজন নাই তার, তৃপ্ত সে আপন আত্মরত উর্ধ্বায়নে
তার প্রকৃতির নিবাস ভিন্ন এক শক্তিধর নভঃস্থলে
অদ্ভুত বিহঙ্গ যেন মেলে দিয়ে তার প্রসারিত বর্ণভূষিত বক্ষতল
অপেক্ষায় রয়েছে গুপ্ত ফলভারনত শাখাপরে
ডুবে গিয়েছে বনভূমির সবুজ শোভায়
অথবা উড়ে চলে উর্ধ্বে অনায়াস দিব্য শিখরে সব।
সুসঙ্গত করে জুড়ে দিয়েছে সে পৃথিবীকে স্বর্গের সঙ্গে।
বিশুদ্ধ পুলকের ঝরধারাছন্দের তালে
আপন আনন্দে দিনসব তার চলে যায় ;
প্রতি মুহূর্ত স্পন্দ যেন সুন্দরের হৃৎপিণ্ডের,
নিবেষরাজি সুরে বাঁধা মধুকণ্ঠ তৃপ্তির সঙ্গে
দাবি নাই কোন সেখানে, জীবনের যা-কিছু দান গ্রহণ করা হয়েছে

দক্ষিণারূপে, তার প্রকৃতির সহজাত অধিকার যেন।
অন্তশ্চেতনা তার আপন জনক সূর্যের সান্নীপ্যে রয়েছে যেন,
অন্তরের প্রাণবায়ু অনন্তপুলকের সান্নীপ্যে।
প্রাণধারার আদিশ্রী যখন প্রথমে উদিত হয় প্রকৃতির মূর্ছা হতে,
উঠে চলে সে মহানন্দের ধারা বেয়ে আকাশের অভিমুখে
মগ্ন সে আপন আনন্দের প্রেরণায়,
জীবন তার আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তবু সকলের দিকে ফিরে রয়েছে সে।
বিশ্বের সঙ্গে নাই তার বাহ্য কোন সংযোগ,
ব্যক্ত আদানপ্রদান নাই আশপাশের বস্তুরাজির সঙ্গে।
একত্ব রয়েছে এক সহজাত, অন্তর্গূঢ়
প্রয়োজন নাই তার কোন যন্ত্রের, তুলে ধরে না কোন বাহ্যরূপ
বেড়ে ওঠে সে যা-কিছু রয়েছে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে,
যা-কিছু সংস্পর্শ আপন সমাধিমাঝে তুলে নেয় সে,
হাস্যলাস্যে সাদরে সে প্রাণশ্রী গ্রহণ করে সবীরণের চুম্বন
করে আত্মসাৎ তপনের বাতাসের সংঘর্ষ :
রভসাপ্লুত আকৃতি বিলাসে বিকৃষ্ণ তার পত্রে পত্রে,
কুসুমকলির প্রস্ফুরণে স্পন্দিত যাদুময় আবেগ,
তরুশাখারাজি ঊর্ধ্বমুখী প্রাবেগে স্তব্ধ আনন্দঘনগর্ভে।
এই সৌন্দর্যের নিপান প্রচ্ছন্ন দেবতা এক,
এই সম্মোহনের অন্তশ্চেতনা আর অন্তরঙ্গ অতিথি,
এই মাধুর্যের হোত্রী, এই স্বপ্নের ধ্যানী।
অলক্ষ্যে রক্ষিত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম হতে
বনদেবতারা রয়েছে অভিসিঞ্চিত হয়ে গভীরতর আলোরেখার তলে
অনুভব করে তারা ঝঞ্ঝার শান্তির অন্যতর আকাশ এক
অন্তরে স্পন্দিত তারা লোকোত্তর বর্ষার ধারায়।
স্বর্গীয় এক ঊর্ধ্বতর লোকে সাবিত্রীর মধ্যে দেখা গেল এই দৃশ্য।
আনত যখন সে পৃথিবীর অন্তরঙ্গতা স্পর্শতরে
তখনও অন্তরাত্মা তার ধরে রাখে দেবতার পদবী ;
অবনত হয় সে, হারিয়ে যায় না তবু জড়ের শাসনতলে।
রূপান্তরিত জগৎ এক হল তার জ্যোতির্ময় মন,
অলৌকিক চন্দ্রালোকে পুঞ্জীভূত যত সমুজ্জ্বল জল্পনা
স্বপ্নের অধ্যায় আহার্য দিয়ে পোষণ করে
মনোময় দেবীকে তার সোনার ভবনে।
রূপসব গোচর তার আমাদের নয়ন দেখে না যাদের,
সচেতন সে সেইসব সান্নীপ্যের আমাদের অনুভবে আসে না যারা,
তার অন্তশ্চারী মহাশক্তি রূপ দিয়েছে তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে

ঢেলে গড়ে যায়া গভীরতর আকাশ, আমাদের পরিচিত নীলের অনুরূপ নয় তারা।
অদৃশ্য সূর্যালোক এক বয়ে চলে তার ধমনীর অন্তরে,
প্লাবিত করে দেয় তার মস্তিষ্ক স্বর্গীয় জ্যোতির ধারায়,
জাগিয়ে তোলে সেখানে বৃহত্তর দৃষ্টি এক পৃথিবীর অজানিত।
সেই আলোকচ্ছটার অন্তরঙ্গতায় পূর্ণ রূপরেখা যত
ধারণ করেছে তার উচ্ছ্বসিত শিশুসুলভ চিন্তাবলী পরম শোভায়
পরিণত হয়েছে তার অন্তরাত্মার গভীর সত্যের রূপমালায়,
নয়ন তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নবতর এক
চারিদিকে সকল বস্তুর পরে, মানুষী অজ্ঞানের অগোচর।
সকল বস্তুই হয়ে ওঠে তার কাছে জীবন্ত সত্তার আকার সব,
অনুভব করে আপনজন তার নিয়ে আসে যেন বার্তা তাদের
নবজাগ্রত প্রতিটি বাহ্যবস্তুর স্পর্শে।
প্রতিটি প্রতীক শক্তি এক, দীপ্ত বিদ্যুৎবিলাস যেন
অর্থ-পরিচিত অনন্তরাজির পরিক্রমায়;
পরবর্তী নয় কিছু, নয় কিছু প্রাণহীন,
অর্থশূন্য নয় কিছু, নয় কিছু অনাহূত।
বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত সে।
মাটি হতে উদ্ভূত যেমন তরুশাখার পুষ্পাবলীর মহিমা,
পশুর জীবন হতে উঠেছে যেমন মনোময় মানুষ,
নূতন আবির্ভাব এক দেখা দিল সাবিত্রীর অন্তরে।
জ্যোতির্ময় মন, ছন্দিত শক্তিময় প্রাণধারা,
আর দেহ অভিষিক্ত প্রচ্ছন্ন দেবত্বে
গড়ে তুলেছে আগামী দেবতার বিগ্রহ এক;
ক্রমপ্রসারিত সম্বৎসরের মন্থর ছন্দদোল
আর দিনমানের শুদ্ধ গুঞ্জরিত মধুচক্রসম ক্রিয়াবলী
মধুভারে পূর্ণ করে দিয়েছে তার ইন্দ্রিয়গ্রাম আর সকল অঙ্গ,
তার সুষমার পৌর্ণমাসী সম্পূর্ণ করে ধরেছে,
শুদ্ধ সামর্থ্য তার আত্মসম্বৃত
নিঃসঙ্গ মহিমায় তার নাই কোন হ্রাস।
দেবত্ব তার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যত বহির্মুখী হয়ে
তত শৈশবের নীহারিকা দূর করে এসেছে সূর্যমণ্ডল
সুনীল নিরালা আকাশের একমাত্র অধিপতি।
ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়াল সে পার্থিব অঙ্গন মুষ্টিগত করবে বলে:
অন্তর্যামী শক্তি বিশাল দৃষ্টি তার আপন ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করে,
সুকোমল আলোক এক ভাসে আত্মচেতন কপালে তার
মধুর গম্ভীর হয়ে ওঠে ধ্যানস্তিমিত নয়ন তার;

স্বর্গীয়-মানুষী ভাবরশ্মি গভীর ঘুমন্ত স্ফুলিঙ্গধারা যেন
জেগে ওঠে তার নয়নের দীর্ঘায়ত মহিমার মাঝে
বেদীপরে জ্বলন্ত শিখা যেন যজ্ঞগৃহতলে।
ওই যুগল স্বচ্ছ গবাক্ষ দিয়ে সংকল্প এক দীপ্তি ছড়ায়
এনে দেয় তাতে জীবনের বৃহত্তর ব্যঞ্জনা এক।
আয়ত কপালের সরল অমল অবকাশ আশ্রয় করে
ওই আনত ভ্রূভঙ্গ-বলয়ের পশ্চাতে বিরাট শক্তি এক
জ্ঞানময় আলোকের দৃষ্টিপাত করে ক্ষণস্থায়ী বিষয়রাজিপরে।
বিজয়ের বার্তাবহ সতর্ক প্রহরী,
আশ্বাস তার আহ্বানে নামিয়ে আনে সুনিশ্চয় নিয়তিকে
অন্তরে তার অভেদ্য দুর্গে যেন করে পদচারণা নির্বাক যোদ্ধা এক,
রক্ষা করে সে সত্যের বজ্রশুভ্র সিংহাসন।
আবেগাপ্লুত হৃদয় তার অমৃতের আধার বলয়শোভিত চন্দ্রমা যেন—
ভালবাসা তার সকলের পরে, কহে না কথা কোন, পরিচয় দেয় না কিছু তার,
ধরে রাখে বক্ষমাঝে তার গোপন উল্লাস
জগৎ যেন সে আনন্দের প্রবেগের উৎসাহের, বাক্যহারা তবু
সগর্বে খরধারে আহ্লাদে ধায় জীবনতরঙ্গে
অন্তরে তার স্বর্গের স্রোতস্বিনী যেন।
সেই অপরূপ ভবনে ঊর্ধ্বের দেববৃন্দ কত হয়েছে অধিবাসী
তবুও সে প্রকৃতির অখণ্ড পরিপূর্ণ মণ্ডল এক,
বহুল সুরবালার সুচ্ছন্দ সুসঙ্গত সঙ্গীত যেন,
বিশাল বিচিত্র বিশ্বেরই অনুরূপ।
যে দেহ ধারণ করেছে এই মহিমা
মনে হয় যেন তা গঠিত স্বর্গের আপন স্বচ্ছ আলোকে।
শোভা তার জাগায় স্মৃতি—দিব্যদর্শনের প্রতিফলিত রূপ যেন,
সোনার সেতু এক কল্পলোকের স্রোতধারার দুই তীর বেঁধে দিয়েছে,
হ্রদতটে নিঃসঙ্গ তালতরুর শিখরে জ্যোৎস্নার স্পর্শ যেন,
সাথী শুধু তার ঝলমল শান্তির বিশাল প্রসার,
নন্দনকাননে শুনি যেন পত্ররাজির মর্মর
চলমান দেবতাদের পদধ্বনি যেন,
জ্যোতির্ময় ছটা ছেয়ে রয় ঘুমন্ত পাহাড়ের চূড়ায়,
অদ্ভুত তারকাশোভিত শীর্ষ তার একক রাত্রির গহনে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

মায়ের আলাপ

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

(Les Bases du Yoga pp. 77-80 ed. Ashram 1954)

প্রশ্ন না, এই "শক্তিদের দেবতা কে, যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনের যত দোষ ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করেন" ?

শ্রীমা এ হল দিব্য সান্নিধ্য, তোমার মধ্যে যে ভগবান প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত রয়েছেন, যাবতীয় কাজ কর্মের মধ্যে যা কিছু খুঁত রয়েছে, যা কিছু সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, সে সব তিনি লক্ষ্য করেন। তোমার চৈত্যপুরুষের মধ্যে এই দিব্যচেতনা অবস্থান করছেন এবং যা কিছু ত্রুটিপূর্ণ তা তিনি লক্ষ্য করছেন। সেই সঙ্গেই আবার বিরোধী আক্রমণগুলোর সম্বন্ধেও তিনি অবহিত এবং সেগুলোকে প্রতিহত করবার জন্যে যা কিছু দরকার, তা তিনি জানেন। কিন্তু সে জন্যে মানুষকে তার চৈত্যপুরুষের সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সর্বদাই এ হল সেই একই জিনিস। ঘুরে ফিরে সর্বদাই একই জিনিসে ফিরে আসা, নিজের চৈত্য-পুরুষকে জানা।

প্রশ্ন মানুষ আত্মহত্যা করলে কষ্টভোগ করে কেন ?

শ্রীমা কিন্তু মানুষ আত্মহত্যা করে কেন ? তার কারণ সে কাপুরুষ...যে কাপুরুষ তাকে সর্বদাই কষ্টভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন পরের জীবনেও কি সে আবার কষ্টভোগ করে ?

শ্রীমা : প্রতিবার মানুষের মধ্যে চৈত্যপুরুষ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, তা হল নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, শিক্ষালাভ করা এবং উন্নতির পথে এগিয়ে চলা। এখন তুমি যদি তাঁর কাজ শেষ হবার আগেই চলে যাও, তাহলে আবার সেই কাজ করবার জন্যে তাঁকে ফিরে আসতে হবে, আর তখনকার অবস্থা শতগুণে বেশী কঠিন হবে। তার মানে, এ জীবনে তুমি কঠিন বলে যা কিছুই ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেলে, পরের বারে এসে আবার সেই সবেরই সম্মুখীন হতে হবে, অবস্থা তখন আরও বেশী কঠিন হবে। আর ও ভাবে চলে না গিয়েও যদি জীবনে তোমার বাধাবিঘ্ন জয় করবার থাকে, অর্থাৎ আমরা যাকে বলি পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হবার থাকে, আর তুমি যদি তাতে উত্তীর্ণ না হও, অথবা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যদি পাশ না করে পাশ কাটিয়ে চলে যাও, তাহলে আবার ফিরে এসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, আর তখন তা আগের চেয়ে ঢের বেশী কঠিন হবে।

এখন ব্যাপারটা হল, মানুষ অতিমাত্রায় অজ্ঞান, তাদের বিশ্বাস, এক হল জীবন আর এক হল মৃত্যু। জীবন মানেই যত কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়ানো, আর তারপর মৃত্যু মানে অপার শান্তিলাভ। কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা মোটেই তা নয়, আর প্রায়ই মানুষ যখন ওই ভাবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ঝোঁকের মাথায়, অন্ধ আবেগে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়, তখন সে সোজা এমন এক প্রাণ জগতে গিয়ে পড়ে, যেটা এই সমস্ত কামনা উত্তেজনা আর

অজ্ঞানের দ্বারা ভর্তি। সুতরাং যে সব কষ্টের হাত থেকে সে অব্যাহতি লাভ করতে চেয়েছিল, সেগুলোকেই সে আবার সামনে দেখতে পায়, অথচ জীবিতকালে তার দেহ তাকে আবরণ দিয়ে রক্ষা করত এবার সে সুযোগ আর থাকে না। তোমরা মনে করে দেখতে পার যদি কখন রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে থাক,—তার মানেই প্রাণ জগতে বেপরোয়া ভাবে বেড়াতে বেরিয়ে থাক—তখন জেগে উঠলেই তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে দেহের মধ্যে ঢুকে পড়া। কিন্তু দেহটিকেই যদি ধ্বংস করে ফেলে থাক, তাহলে সে ত আর তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে রইল না। সে ক্ষেত্রে তোমায় অনন্তকাল দুঃস্বপ্নের রাজ্যেই বাস করতে হবে, যার সেটা মোটেই খুব উপভোগ্য অবস্থা নয়। কারণ দুঃস্বপ্ন এড়াতে হলে তোমাকে চৈত্য-চেতনাতে বাস করতে হবে, আর যখন চৈত্য-চেতনাতে থাকবে তখন নিশ্চিত জানবে কোন কিছুই তোমাকে উত্যক্ত করবে না। আত্মহত্যা করা সত্যিই অতিশয় অন্ধ মূঢ়তার কাজ, আর সেটা বললাম, জীবনে যে প্রচেষ্টা, যে যুদ্ধ করে চলতে হবে, তার দিক থেকে চরম কাপুরুষতা।

প্রশ্ন আচ্ছা মা, কেবল বুধবারেই এগুলো সব ঘটে কেন? হয় সৃষ্টি, নয়ত রাস্তায় গোলমাল?

শ্রীমা তার মানে কিছু একটা বোধহয় আমাদের এই সব পড়াশোনা পছন্দ করে না। তবে আজ আবার ২৬শে জানুয়ারী,* ঠিক এই দিনেই পড়েছে।

প্রশ্ন মা, লোকেরা হৈ চৈ করতে এত ভালবাসে কেন?

শ্রীমা হৈচৈ করতে ভালবাসে? তার কারণ তারা নিজেদের অভিভূত, হতবুদ্ধি করতে ভালবাসে। চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকলে নিজেদের বাধাবিঘ্নগুলো তাদের জ্বালাতন করবে, তারা তখন সেগুলোর সামনা সামনি পড়বে। সাধারণত সেটা তাদের পছন্দ নয়। খুব হৈচৈ গোলমালের মধ্যে তারা সব কিছু ভুলে যায়, হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাই তারা দিব্যি খুশি হয়।

সারাক্ষণ মানুষ দৌড়োয় বাইরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, যাতে সে শান্ত হয়ে নিজের জীবনকে লক্ষ্য করার সময় না পায়। সে ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াতে চায়, আর সেটাই এই উপায়ে হয়। সত্যিই অনেকে আছে যাদের পক্ষে চুপচাপ থাকা বা শান্তভাবে নীরব থাকা ঢের বেশী কষ্টকর। তাদের কাছে একঘেয়েমী কাটাবার এগুলোই হল উপায়, প্রচুর হৈচৈ করা, প্রচুর বেয়াদবী করা, প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হওয়া, প্রভৃতি। যখন তারা শান্ত হয়ে বসে থাকে এবং নিজেকে লক্ষ্য করে তখন তারা বড়ই অস্বস্তি ভোগ করে। হয়ত তার কারণ, তারা নিজেরাই অস্বস্তিকর। খুব সম্ভব তাই। যে নিজে যত বেশী একঘেঁয়েমী করে সে ততবেশী একঘেঁয়েমী সহ্য করতে পারে না। যারা খুব মার্জিত আকর্ষণীয় ব্যক্তি হয় তারা একঘেয়েমী বোধ করে না।

---

* প্রায়ই মায়ের এই ক্লাশের সময় শহরের যত উচ্চনাদের গীতবাদ্য বা গোলমাল মুখর হয়ে ওঠে। ২৬শে জানুয়ারী হল ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-দিবস।

প্রশ্ন মা, কেউ যদি কাপুরুষ হয় এবং কোন একটা অসুবিধাকে ভয় না করে এড়িয়ে যায়, তাহলে পরের বার অসুবিধাটাই যদি আরও বড় রকমের হয়, তাহলে কতকাল পর্যন্ত এমনটা চলবে?

শ্রীমা যতকাল পর্যন্ত সে কাপুরুষ থাকবে, ততকাল চলে। যখন সে বুঝতে পারবে যে কাপুরুষতা করা উচিত নয়, তখন বন্ধ হবে। কাপুরুষতাকে অবশ্যই জয় করা যায়। মানুষ সত্যি সত্যিই যদি চায়, তাহলে এমন কোন জিনিষ নেই যা সে জয় করতে পারে না।

প্রশ্ন মানুষ অজ্ঞানের দরুণই ত কাপুরুষ হয়, নয় কি?

শ্রীমা কিসের দরুণ?

—অজ্ঞানের দরুণ।

শ্রীমা হাঁ, বলতে পার যা কিছুই খারাপ, তার মূলে রয়েছে অজ্ঞান। কিন্তু আমার ধারণা, মানুষের কাপুরুষ হবার কারণ হল, সে ভীষণ তামসিক আর চেষ্টা করতে সে ভয় পায়। কাপুরুষ না হবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, শুরু করতে হবে চেষ্টা দিয়ে, পরে সেটা খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সব চেয়ে যেটা ভাল তা হচ্ছে, এই ধরণের নিজের দেহ ছেড়ে চলে যাওয়াটাকে ভয় করতে চেষ্টা করা। বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে মানুষ পিছু হটে পালায়, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দৌড় দেয়। তার কারণ, প্রথম চেষ্টাটাই হল কঠিন। কিন্তু যে তোমাকে চেষ্টা করতে দেয় না, সে হল তোমার অজ্ঞাননয় জড়বৎ প্রকৃতি।

যেই তোমার প্রকৃতি রাজসিক হয়ে ওঠে, চেষ্টা করতে তোমার ভাল লাগে। অন্তত রাজসিক লোকেদের একটা সুবিধা তাদের সাহস আছে, কিন্তু তামসিকরা কাপুরুষের হদ্দ। চেষ্টা করতে ভয় পাওয়ার ফলেই মানুষ কাপুরুষ হয়ে ওঠে। একবার যদি শুরু কর, একবার যদি সংকল্প করে থাক, আর যদি চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলেই তোমার উৎসাহ লেগে যাবে। ঠিক এই একই কারণে, ছাত্রেরা তাদের পড়া তৈরী করতে চায় না, শিক্ষকরা যেটা পড়ান তা শুনতে চায় না। তামসিকতার চূড়ান্ত। একেই বলে ঘুমিয়ে থাকা। এই অবস্থাটা চেষ্টা করতে দেয় না, চেষ্টা করে একবার জিনিসটার নাগাল পেলে তখন তাকে আঁকড়ে ধরা আর ছেড়ে না দেওয়া চাই। কিন্তু এ হল আধঘুমন্ত অবস্থা। বাহ্যত এটাও ওই একই জিনিস, সত্তার ঘুমন্ত জড়ত্বের অবস্থা।

অনেকে আছে, বাইরের দিক দিয়ে দেখতে তারা খুবই সাহসী, তেমন কোন লোককে আমি জানতাম, দেহে তারা বেশ বলবান এবং সৎসাহসী, কিন্তু অন্তরে ভীষণ ভাবে কাপুরুষ। তার কারণ, মানুষের মধ্যে নানা অংশ আছে। তাদের দেহটা খুবই কর্মঠ এবং সাহসী হতে পারে, অথচ তাদের ভিতরটা কাপুরুষ। আবার এর উল্টোটাও আমি দেখেছি। এমন কয়েকজনকে জানতাম অন্তরে তাদের খুবই সাহস ছিল, কিন্তু বাইরেটা ছিল ভীষণ ভীতু। এদের বেলায় অন্তত একটা সুবিধা হচ্ছে যে, এদের অন্তরে একটা ইচ্ছা-শক্তির জোর আছে। সেই জোরে তারা বাইরে কাঁপলেও দেহকে সংযত রেখে যা কর্তব্য তা করে।

একবার একজন আমাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন করে। লোকটার ছিল বন্যপশু কেনা-বেচার কারবার। বুনো জানোয়ারদের রাখবার তার একটা আস্তানা ছিল, মানান

দেশ ঘুরে, যেখানে যেখানে বুনো জানোয়ার ধরা হয়, সেখান থেকে কিনে এনে তাদের য়ুরোপের বাজারে বিক্রী করত। সম্ভবত লোকটা অষ্ট্রিয়ার অধিবাসী ছিল। সে যখন প্যারিসে আসে, আমার সঙ্গে একবার দেখা করেছিল। আমাকে বলল, "দু রকমের পশু-পালকদের সঙ্গে আমার কারবার। বলতে পারেন, কে বেশী সাহসী? এক রকম, যারা পশুদের খুব ভালবাসে এতো ভালবাসে যে স্বচ্ছন্দে তাদের খাঁচার মধ্যে ঢুকে যায়, বিপদ যে ঘটতে পারে, এমন বিন্দুমাত্র ধারণাও তাদের মনে উদয় হয় না। বন্ধু যেমন বন্ধুর বাড়ীতে যায়, সেই ভাবে তারা পশুদের খাঁচায় ঢুকে তাদের দিয়ে নানা কসরৎ করায়, কেমন ভাবে কি করতে হয় তা তাদের শেখায়, এতটুকুও ভয় পায় না। আমি কয়েকজনকে জানতাম, তারা হাতে একটা চাবুক পর্যন্ত নিত না, তারা খাঁচার ভিতরে ঢুকে জানোয়ারগুলোর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ভাবে কথা বলত যে, সব কিছুই দিব্যি ভালভাবে চলত। কিন্তু তাহলেও একদিন যে তারা পশুগুলোর উদরস্থ হতে না পারে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই হল এক ধরণের। দ্বিতীয় ধরণের যারা, তারা খাঁচার মধ্যে ঢোকার আগে এতদূর ভয় পায় যে, রীতিমতো কাঁপতে থাকে, এবং তার দরুণ প্রায়ই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা খুব করে মনের জোর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে এবং ভয়ের কোন চিহ্ন প্রকাশ না করে, খাঁচার মধ্যে ঢেকে এবং জানোয়ারগুলোকে দিয়ে কাজ করান।"

এরপর লোকটা আমাকে বলল, "আমি দুরকম মত শুনেছি, একদল বলে, একেবারে ভয় না থাকার চেয়ে, ভয়কে জয় করা ঢের বেশী সাহসের কাজ।...সমস্যাটা এই। এখন বলুন, এদের মধ্যে কে সত্যিকারের সাহসী?"

হয়ত তৃতীয় একজন আছে যে যথার্থ সাহসী, আগের জনের চেয়ে অন্তত ঢের বেশী সাহসী। যে বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং বেশ ভাল করেই জানে যে এই সব বুনো পশুদের বিশ্বাস করা যায় না... যে দিন তারা বিশেষ একটা উত্তেজনার অবস্থায় থাকবে, সেদিন অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার ঘাড়ে লাফ্ দিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তাদের কাছে ও একই। তারা কাজ করবার আনন্দে সেখানে যায়, কোন বিপদ ঘটবে কি না, সে প্রশ্ন তাদের মনে কোনদিন জাগেই না। তাদের মন সম্পূর্ণ শান্ত থাকে, এবং তাদের দেহে উপযুক্ত বল এবং প্রয়োজনীয় চেতনা বর্তমান থাকে। লোকটা নিজে ছিল এই ধরণের। তার এতই দুর্দান্ত মনের জোর ছিল যে হাতে কোন চাবুক না নিয়ে শুধুমাত্র অটল ইচ্ছাশক্তির জোরে সে তাদের দিয়ে যা করাতে চাইত তাই করাত। কিন্তু মনে মনে বেশ ভালই জানত যে, এ বড়ই বিপজ্জনক পেশা। সে বিষয়ে তার কোন দ্বিরুক্তি ছিল না। লোকটা আমাকে বলেছিল যে সে একটা বেরাল পুষে, তার কাছ থেকে এই পদ্ধতিটা শিখেছিল—সত্যিই একটা জ্যান্ত বেরাল!

বন্যপশুর ব্যবসা করা ছাড়াও লোকটার আর একদিক ছিল। সে ছিল একজন চিত্রশিল্পী, ছবি আঁকতে, রঙ্ করতে সে খুবই ভালবাসত। তার আঁকবার ষ্টুডিওতে একটা বেরাল ছিল, আর সেই সূত্রেই বন্যপশুদের সম্বন্ধে তার আগ্রহ জাগতে শুরু করে। তার বেরালটা ছিল ভীষণ একরোখা। আজ্ঞা পালন করা সম্বন্ধে তার কোন বোধই ছিল না। লোকটা একদিন তার এই বেরালের একটা ছবি আঁকবে স্থির করল। সেটাকে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে সে নিজের আঁকার জায়গায় গেল। ফুস্ করে বেরালটা পালালো।

সে তখন সোজাকে আবার ধরে এনে সেই চেয়ারে বসালো। কোন রকম উচ্চবাচ্য করল না, ধস্তাধস্তি দিল না, কোন কিছুই করল না, অবশ্য বাধাদান বা আঘাত করার ত কথাই ওঠে না। তুলে এনে আবার সেই চেয়ারটাতে বসান। বেয়ারাটা এবার ক্রমশ বেশী করে চালাক হয়ে উঠতে লাগল। সেই ষ্টুডিওতে একটা কোণের দিকে, আঁকার যত সরঞ্জাম, ক্যানভাস প্রভৃতি জমা করে রাখা ছিল, সেগুলো আঁকবার কাজে ব্যবহার করা হত। ঘরের পিছন দিকে এক কোণে, সেগুলোকে একটার উপর একটা এই ভাবে গাদা করে লুকিয়ে রাখা ছিল। বেয়ারাটা গিয়ে সেইগুলোর পিছনে লুকিয়ে রইল। সে বেশ জানত যে, তার মনিব ওই সব ক্যানভাসকে একটি একটি করে সরিয়ে রেখে তাকে পাকড়াও করতে বেশ কিছুটা সময় নেবে। লোকটিও চুপচাপ একটি একটি করে সেগুলোকে বের করে এনে বেয়ারাটিকে ধরে এনে আবার তার জায়গায় বসান।

লোকটা আমায় বলেছিল যে, একদিন সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি বারও না থেমে সে এই কাজ করেছিল। জলস্পর্শ করে নি পর্যন্ত, বেয়ারাটাও খায়নি (সকলের হাস্য), সারাদিন এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। প্রায় যখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তখন সেটা হার মানল। তার মনিব যখন তাকে চেয়ারে এনে বসাল, (সকলের উচ্চহাস্য) সে বসে রইল এবং তখন থেকে আর কখন পালাতে চেষ্টা করেনি। লোকটার তখন মনে হল, "বড় জানোয়ারগুলোর সঙ্গেও ত এই ভাবে চেষ্টা করে দেখলে হয়!" তখন থেকে সে চেষ্টা শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছিল।

অবশ্য বলাবাহুল্য, সে একটা সিংহকে এভাবে তুলে এনে চেয়ারে বসাতে পারত না। না, সেটা সম্ভবও নয়। তবে সে তাদের দিয়ে নানা রকম খেলার কসরৎ করাতে চেষ্টা করেছিল—যদিও সেগুলো অতি ছেলেমানুষীর খেলা, যেমন সব সার্কাসেই দেখানো হয়ে থাকে। সামনের পা-দুটো একটা টুলের উপর রাখা বা কোন একটা ছোট্ট জায়গাতে চারটে পা-কেই একসঙ্গে করে বসা, প্রভৃতি যত রকমের আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু ওটাই ত ফ্যাসান, আর ওই সবই ত লোকেরা দেখতে চায়, কিম্বা কুকুরের মতো পিছনের দুপায়ে ভর করে দাঁড়ানো, কিম্বা গর্জন করানো—যখন জন্তুটার সামনে একটা আঙুল উঁচু করে ধরা হয় তখন সে গর্জন করে—এই ধরনের যত সম্পূর্ণ বাজে ব্যাপার। জন্তুগুলোকে যদি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে সেটাই ঢের বেশী উপভোগ্য হত। সে যাই হোক, যে কথা আগে বললাম, ওটাই হল ফ্যাসান।

কিন্তু লোকটা কোন রকম চাবুকের সাহায্য না নিয়ে, দিব্যি এই সব কসরৎ করাতে পারত। কখন তার পকেটে একটা পিস্তল পর্যন্ত রাখত না। সে সোজা ভিতরে চলে যেত, যদিও বেশ ভাল করেই জানতো যে, একদিন যখন জানোয়ারগুলোর মেজাজ বিগড়ে যাবে সেদিন তারা একটি ধাবায় তাকে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু এ কাজ সে বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে করত, আর যে পরিমাণ ধৈর্য নিয়ে বেয়ারাটার বেলায় লেগেছিল, ঠিক সেই পরিমাণ ধৈর্য এদের বেলাতেও বজায় রাখত। তারপরে সে যখন তার জানোয়ারগুলোকে সার্কাসে চালান দিত, তাদের পালকদের জিম্মায় দিত, তখন তারাই তারা খুবই চমৎকার খেলা দেখাত।

অবশ্য এই জানোয়ারগুলো—সব জানোয়ারই বলতে হবে—তুমি ভয় পেয়েছ কিনা, ঠিক বুঝতে পারে, বাইরে যদি তা প্রকাশ নাও কর। একটা সহজাত প্রবৃত্তির দরুন তারা

সেটা অদ্ভুতভাবে বুঝতে পারে, মানুষের সে ক্ষমতা নেই। পশুরা তৎক্ষণাৎ অনুভব করতে পারে তুমি ভয় পেয়েছ, তোমার দেহে একরকমের স্পন্দন জাগে, যেটা তারা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। পশুগুলো যদি খুব বলবান হয় তাহলে রেগে আগুন হয়ে যায়, আর যদি দুর্বল জাতের হয়, তাহলে তারাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি বিন্দুমাত্র ভয় না পাও, যদি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও,—যথার্থই তা বিরাট-বিশ্বাস হওয়া চাই,—যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে এগিয়ে যাও, দেখবে তারাও ভয় পাবে না, তারা তোমাকে ভয় বা ঘৃণা কোনটাই করবে না। তাছাড়া তারা খুবই বিশ্বাস যোগ্য।

অবশ্য আমি তোমাদের উৎসাহিত করবার জন্যে বলছি না যে তোমরা যখন সিংহ দেখতে যাবে, তখন তাদের খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকবে। মোটেই তা নয়। তবে ব্যাপারটা হল এই রকমই। একটা কুকুর যখন তোমার সামনে ঘেউ ঘেউ করছে, তখন তুমি যদি ভয় পাও, তাহলেই সে তোমাকে কামড়াবে, কিন্তু যদি ভয় না পাও, সে চলে যাবে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ভয় না পাওয়া চাই, কেবল লোকদেখানো মাত্র নয়, সেটার কোন মানে নেই, ও হল স্পন্দনের ব্যাপার।

আজ বাইরের গোলমালটা বেশ জাঁকালো রকমের হয়েছে, নয় কি?

প্রশ্ন কিন্তু না, কার সাহস সব চেয়ে বেশী, তা ত তুমি বললে না?

শ্রীমা সে কী? আমি ত বললাম, তৃতীয় লোকটিই সব চেয়ে বেশী সাহসী। সাহস...কথাটা হল সত্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাহস নিয়ে। লোকটার সঙ্গে জানোয়ার-গুলোর এতই বন্ধুত্ব যে, তার কোন রকম ভয় নেই—এর কারণ তার এবং তাদের মধ্যে একটা বিরাট অন্তরের সংযোগ, একটা নৈকট্যের ভাব আছে, যেটা নানা কারণে হয়ে থাকে, একটা স্বতঃস্ফূর্ত দেহগত বন্ধুত্বের ভাব। তবে বলতে পারিনা হঠাৎ যদি তার মধ্যে একটা বিপদের অনুভূতি জেগে ওঠে, তাহলে সে তার সাহস বজায় রাখতে পারবে কিনা। খুবই সম্ভব সে তৎক্ষণাৎ তার সাহস হারিয়ে ফেলবে।

কিন্তু অন্য লোকটির জানোয়ারদের সঙ্গে কোন অন্তরের সংযোগ নেই, তাই সে তাদের ভয় করে। কিন্তু অন্তরে তার যথেষ্ট সাহস এবং সদিচ্ছা আছে, এ ইচ্ছাশক্তি এবং সাহস হল মনের, হয়ত প্রাণেরও হতে পারে, যার দরুণ লোকটা তার দৈহিক ভয়কে জয় করতে পারত এবং মোটেই ভয় পেত না। এই ভাবে কাজ করে। কিন্তু তার দেহের মধ্যে ভয় ছিল, সে কেবল সেটাকে আয়ত্তের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। এখন দেখতে হবে কোন্ সাহসটা বড়, দেহের না অন্তরের? কোনটাই বড় নয়, ও হল সত্তার বিভিন্ন অংশের সাহস।

কেউ কেউ আছে, যারা যে কোন বিপদের মাঝে অবিকম্পিতভাবে, স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভিতরে এতটুকুও কাঁপুনি ধরে না। দৈহিক সাহস তাদের।

আবার অন্য অনেকে আছে...যেমন গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা গিয়েছিল। সে সময়ের ঘটনাগুলো থেকে গবেষণা ও অনুশীলনের সব কিছুই পাওয়া যেত। সৈন্যরা তখন পরিখার (trench) মধ্যে থেকে যুদ্ধ করত। তাদের উপর যখন একটা পরিখা থেকে বেরিয়ে অন্য আর একটা পরিখা দখল করবার হুকুম হত, আর তারা বেরিয়ে যাবামাত্রই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মুখে পড়ত...তখন স্বভাবতই,

যদি তোমার নিজের জীবনের উপর কিছুমাত্র মায়া থাকে তাহলে ভয় না পেয়ে পারবে না—যদি তোমার জীবনের কোন মূল্য আছে বলে মনে কর...অবশ্য কেউ কেউ আছে যাদের কোন ভয় নেই—কিন্তু তারা নিশ্চয়ই যোগী। সাধারণত সৈন্যরা ত আর যোগী হয় না, তারা একেবারেই সাধারণ মানুষ, কারণ সবাই সৈন্য হতে পারে। আগেকার কালে, অনেক কাল আগে, যারা যুদ্ধ করতে ভালবাসত কেবল তারাই সৈনিক হত। কিন্তু এখনকার দিনে আর সে রকমটা নয়। এখন যত গরীব গোবেচারী শান্তিপূর্ণ নিরীহদেরই ধরে সৈন্যের দলে নাম লেখানো হয়। অর্থাৎ সবাইকেই যোগ দিতে হবে। সুতরাং তাদের হাজারের মধ্যে একজনকেও পাবে না যার মধ্যে সত্যিকারের সৈনিকের মন মেজাজ আছে হতেই পারে না তা। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল, সেই সব মানুষ যারা অতি সাধারণ ভাবে সাধারণ জীবন যাপনের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে, তারা চুপচাপ শান্তিতে থেকে গতানুগতিক বাঁধাধরা জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। তারা যে বীর যোদ্ধা, তা জীবনে কখন অনুভব করে না। কাজেকাজেই রাতারাতি তাদের বীরপুরুষ হয়ে উঠতে হুকুম করা চলে না। কিন্তু তা বললে কি হবে, তাদের উপরওয়ালাদের হাতে হাতে পিস্তল, কেউ আজ্ঞা অমান্য করেছে কি তার পিঠ ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে যাবে। তাই ইঁদুরের মতন মারা পড়ার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই তারা পছন্দ করে। এই হল তাদের সত্যিকারের অবস্থাটা। মোটেই কবিত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সত্যিই ওই রকম। এখন ঠিক সেই সময়, তাদের বেরিয়ে যাবার মুখে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সত্যিই শরীর খারাপ, আমি বলছি, তাদের পেটের অসুখ করেছে, তারা সম্পূর্ণ অসুস্থ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেতে তাদের হবেই, এবং গেলও তারা, আর তারপর কখন কখন চলতে চলতে সেই প্রত্যক্ষ বিপদের সামনে তাদের উপর প্রচণ্ড সাহস যেন ভর করল।

অন্য অনেকে যেতে লাগল, যেন মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, প্রচণ্ড বিপদের মুখে তারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, তারা জানেও না কি ঘটতে চলেছে। ওদের মধ্যেই আবার কয়েকজন ছিল, যারা আগে থেকেই বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল, যখন তারা জানল যে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যাওয়া দরকার। তখন সকলের বেরুবার জন্যে আদেশজারী করা হয়নি, তারা নিজে থেকেই যেতে রাজী হয়েছিল, যদিও তাদের বরাতে কি ঘটতে পারে তা তারা বেশ ভাল করেই জানত। সুতরাং এক্ষেত্রে, এরাই ছিল সত্যিকারের সৎসাহসী, কিন্তু সংখ্যায় তারা খুব বেশী ছিল না। এদের সংখ্যা কখনই বেশী হয় না।

কেবল সেই অগ্নিকাণ্ডের প্রচণ্ডতার মাঝে আকাশ বাতাস যখন উত্তেজনার চরমে পৌঁছয় তখন একরকমের সম্মোহনকারী সংকেত সকলের মধ্যে জেগে ওঠে, আর সেই সন্ধিক্ষণে তারা সবাই বীরপুরুষ হয়ে ওঠে। পরে আবার সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে সাধারণও অসাধারণ বীর হয়ে ওঠে। অবশ্যই এ হল সমবেত ইচ্ছার ফল।

গভীরতম অর্থে তাকেই বলে, যথার্থ সাহস যখন মানুষ যে কোন বস্তুর সম্মুখীন হতে পারে, জীবনে প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম, স্থূল বস্তু থেকে আত্মার বস্তু, সব কিছুর সম্মুখীন হতে পারে, কোন রকম কাঁপুনি নেই সেখানে, দেহের কোন অংশে নেই...হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠানামা করে না, স্নায়ুগুলির কোন কম্পন নেই, সত্তার কোন অংশেই সামান্যতম

আবেগ উত্তেজনার ভাব নেই। অনুক্ষণ ভগবানের দিব্য সান্নিধ্যের চেতনায় পূর্ণ হয়ে তাঁর কাছে অখণ্ড আত্মনিবেদনের ভাবে, সমগ্রসত্তা এই নিবেদনের ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়ে সকল কিছুর সম্মুখীন হতে পারবে, তখনই মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে চলতে পারে, যে কোন কিছুর সম্মুখীন হতে পারে। আমি বললাম, এতটুকু কাঁপুনি থাকবে না, স্পন্দনের লেশমাত্র থাকবে না। এমনটা হতে পারে সুদীর্ঘকালের সাধনের ফলে, যদি না কেউ এক বিশেষ কৃপার অধিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে, পূর্ব জন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মে থাকে। কিন্তু এমনটা আরও বেশী বিরল।

ভয়কে কাটিয়ে ওঠার অর্থই হল, সত্তার একটি অংশ অন্যটির চেয়ে বেশী শক্তিশালী, তার কোন ভয় নেই এবং সে অন্য যে অংশটি ভীতু তার উপর নিজের নির্ভীকতার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না যে, যাকে মোটেই ভয়কে কাটিয়ে উঠতে হয় না, তার চেয়ে এ ব্যক্তির সাহস বেশী।... কারণ যার ভয়কে জয় করতে হয় না, তার মানে হল, মানুষটা সর্বক্ষেত্রেই তার সত্তার সকল অংশেই নির্ভীক। কিন্তু আবার এক রকমের নির্ভীকতা আছে যেটা আসে অচেতনার এবং অজ্ঞানের দরুন। দৃষ্টান্ত, যেমন শিশুরা, বিপদ সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা এমন সব কাজ করে, যেগুলো তারা করত না, যদি এই বিপদ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকত। তার মানেই তাদের নির্ভীকতা হল, অজ্ঞতা প্রসূত। কিন্তু যথার্থ সাহস হল তাই, যার পরিণাম সম্বন্ধে মানুষটার পূর্ণজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যা কিছুই সম্ভব, যা কিছুই ঘটতে পারে, সে সব জেনেও যে বিনা ব্যতিক্রমে সকল কিছুরই সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।

* * *

২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

(Les Bases du Yoga, pp. 80-83, Pub. Ashram)

প্রশ্ন : "তোমার মনোভাবটি সঠিক হওয়া চাই"—এর মানে কি ?

শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ এটি আগে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সঠিক মনোভাব হল, বিশ্বাসের মনোভাব, আজ্ঞাপালনের মনোভাব, আত্মনিবেদনের মনোভাব।

প্রশ্ন "কোন কিছুই এবং কোন ব্যক্তিই যেন তোমার এবং আমার মধ্যে না আসে... —এই ব্যক্তিটি কে ?

শ্রীমা ব্যক্তিটি ? যে কোন ব্যক্তি...যে কেউই হতে পারে...তোমার এবং দিব্যশক্তির মাঝে কাউকে আসতে দেওয়ার কত রকমের উপায় আছে। প্রথমত, যেমন কারুর সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার অত্যন্ত বেশী মূল্য দেওয়া, তোমাকে উপদেশ দেবার ক্ষমতা নেই এমন লোকের কথা মেনে চলা, কোন একটা বিশেষ কারণে কাউকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়া। লোকেরা ত সমানেই এটা করছে, নয় কি ?

সম্ভবত ওখানে যেটা লেখা রয়েছে, সেটা শ্রীঅরবিন্দ কাউকে তার চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, কারণ সে লোকমুখে কিছু শুনে সেগুলোকেই খুব বেশী সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল —হয়ত তা কোন উপদেশ বা কোন বিষয়ে মন্তব্য, বা কারুর মতামত—যেগুলোকে সে খুব বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছিল। তাই শ্রীঅরবিন্দ তাকে বললেন, তোমার এবং ভগবানের মাঝে যেন কেউ মধ্যস্থতা করতে না আসে।

এই কেউ বলতে, যে কেউই হতে পারে, যেমন বাপ-মা, বন্ধুবান্ধব, যে কেউই—হয়ত সেটা প্রত্যেকের বেলাতেই বিশেষ কেউ একজন হতে পারে।

প্রশ্ন : না, "সাধনা করতে হবে দেহে"—এই কথাটা আমি বুঝতে পারি নি।

শ্রীমা : দেহে ? ওটা কোন একটা কথার জের। লোকে বলে, কেউ কেউ জীবনে তিক্তি-বিরক্ত হয়ে গিয়ে দেহত্যাগ করতে চায়। তাদের আশা, অন্য এক সময়ে অবস্থাটা ভাল হবে। তাই ওখানে লেখা হয়েছে, "তোমার দেহকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার কোনই মানে হয় না, কারণ দেহকে বাদ দিয়ে অবস্থাটা মোটেই সহজ হবে না। বরং তা ঢের বেশী কঠিন হবে।" আর দেহটি সৃষ্টি হয়েছে যোগ করবার জন্যে। আমরা এখন পৃথিবীতে রয়েছি, আর যত দিন আমরা বেঁচে থাকব, সেই সময়টার মধ্যে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারব। পার্থিব জীবনের বাইরে মানুষ উন্নতি লাভ করে না। এই পার্থিব স্থূল জীবনই হল বিশেষ করে উন্নতি লাভের জন্যে জীবন। এখানেই মানুষ যত উন্নতি লাভ করে। পার্থিব জীবনের বাইরের যে জীবন, সেখানে মানুষ বিশ্রাম করে, হয় অচেতন অবস্থায় থাকে, নয়ত পৃথিবীতে সে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছে, সেগুলোকে নিজের অঙ্গীভূত করে। তাই ও হল বিশ্রামের বা অচেতন অবস্থায় থাকার কাল। কিন্তু উন্নতি লাভের কাল হল, যতদিন এই পৃথিবীতে এবং এই দেহে আছ। তাই তুমি যখন দেহধারণ করলে, তখন তার উদ্দেশ্য হল উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া, আর যখন এ দেহটিকে ত্যাগ করে চলে যাও, তখন উন্নতি লাভের কাল শেষ হয়েছে।

আর সত্যিকারের উন্নতি বলতে বোঝায় সাধনা, অর্থাৎ ও হল সব চেয়ে সচেতন এবং সবচেয়ে দ্রুত উন্নতির সুযোগ। তা না হলে মানুষ ত বিশ্বপ্রকৃতির ধারায় উন্নতি লাভ করে চলেইছে। তার মানে, মাত্র সামান্য একটু উন্নতি লাভ করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর কেটে যেতে পারে। কিন্তু সাধনার দ্বারা যেটা লাভ করা যায়, যোগের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ যা করতে পারে তা অন্যভাবে করতে গেলে, অফুরন্ত কাল কেটে যাবে। কিন্তু সর্বদাই এই দেহে এবং সর্বদাই এই পৃথিবীতে তা করা হয়ে থাকে, অন্য কোথাও নয়। সেই জন্যেই যখন এই দেহ ধারণ করে বিরাজ করছ তখন এ সুযোগ হারানে চলবে না, বললে চলবে না, "থাক না, কিছুকাল পরে হবে, আরও কিছুকাল পরে।" না, কালবিলম্ব না করে, করতে লেগে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল। উন্নতি লাভ না করে যতগুলি বছর কাটিয়ে দাও, সে সবই বৃথা নষ্ট হয়ে যায়, পরে সেজন্যে নিশ্চয়ই অনুতাপ করতে হবে।

প্রশ্ন : "বাধাটা নিশ্চয় এসেছিল অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতার দরুণ..."

শ্রীমা হ্যাঁ, এ সবই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন চিঠির উত্তরে। কেউ তার কোন একটা বাধার সম্বন্ধে লিখে থাকবে। আর তার চিঠিটা পড়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন যে তার এই বাধাটা হল অবিশ্বাসের এবং আদেশ অমান্য করার ফল। সেই কথাই তিনি তাকে বলেছেন। আর এমন ব্যাপার ত প্রায়ই ঘটে থাকে, খুবই সাধারণ ঘটনা, তাই উত্তরটা সকলেরই উপকারে লাগবে।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, একই ভাবে আচ্ছন্ন হওয়ার দ্বারা একই রকমের অনুভূতি সব সময় হয় না কেন? যেমন ধরুণ যখন সমুদ্রের দিকে বা আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের অকিঞ্চিৎকরতার কথা মনে হয়, তখন দেহের মধ্যে বিশেষ এক রকমের অনুভূতি হয়। কিন্তু পরে আর একটা সময়, সেই রকমেরটা অনুভব করতে চাইলে এমন কি সে সম্বন্ধে চিন্তা করলেও তেমনটা আর হয় না কেন?

শ্রীমা একই অভিজ্ঞতা দুবার কেউ লাভ করতে পারে না, কারণ কেউই দুবার সেই একই মানুষ থাকেনা। প্রথমবারের অভিজ্ঞতার পর দ্বিতীয়বারেরটি যদি মাত্র ঘন্টাখানেকের পরেও হয়, তবু তুমি আর সেই একই মানুষ নও এবং দুবার কখনই তুমি হুবহু একই বস্তু লাভ করতে পার না। যদি আরও সচেতন হতে চেষ্টা কর, আরও ঐকান্তিক, আরও অভিনিবিষ্ট হবার দিকে লক্ষ্য রেখে চল, তাহলেও তোমার অভিজ্ঞতা অন্য রকমের হবে। হয়ত তা, আরও গভীর, আরও পরিষ্কার হতে পারে। কিন্তু যেটা উপলব্ধি করেছিলে সেইটিকেই যদি আঁকড়ে ধরে থাক আর সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি চাও, তাহলে কিছুই পাবে না, কারণ একই জিনিস তুমি পেতে পার না। আর তুমি তখন এমন এক অবস্থায় রয়েছ, যেখানে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে তুমি রাজী নও, কারণ অতীতের অভিজ্ঞতাকেই তুমি ধরে রয়েছ। আর সাধারণত যদি তোমার এমন কোন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, যেটা কোন উর্ধ্বের জ্ঞানের প্রতীক, খুবই মূল্যবান, তখন সেটাকে হারাতে তুমি চাইবে না, তোমার ভয় হবে, পাছে সেটা আবার না আসে। এ ভাবে কোন কিছুকেই আঁকড়ে ধরে থাকার যে প্রবৃত্তি, সেটার দরুণ তুমি নিজেই নিজের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এবং এমন সব অবস্থায় পড়ে যাবে, যেখানে আর তার পরের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে না।

এটা কিন্তু খুব ভাল করে বোঝা দরকার, কারণ এ হল একটি মূল সত্য। কেউ একই অভিজ্ঞতা দুবার লাভ করতে পারে না। অভিজ্ঞতা একই রকমের হতে পারে, খুবই কাছাকাছি হতে পারে, বিশেষ করে কতকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলি...কেউ যদি সম্পূর্ণ অকপট হয়, একেবারে পক্ষপাতশূন্য হয় এবং ধবধবে সাদা পাতার মতন হয়, তাহলে সে ঠিক লক্ষ্য করতে পারবে, তফাৎ একটা আছেই। কোন কোন সময় তা মূলগত তফাৎ, যদিও বাহ্যত দেখতে দুটি অভিজ্ঞতা প্রায় এক রকমই বলে মনে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তুমি যত কিছু অভিজ্ঞতালাভ করেছ, সে সবকে পিছনে ফেলে রেখে, আরও ভাল, আরও উর্ধ্বের কিছুর দিকে এগিয়ে যেতে যত প্রস্তুত হবে, তত তাড়াতাড়ি তুমি এগিয়ে যেতে পারবে। যত তুমি অতীতের ভার বোঝা ছাড়তে চাইবে না, যত সেটাকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াবে, তত তুমি ধীরে ধীরে চলবে।

সমগ্র অতীত যেন সর্বদাই হয় শুধুমাত্র এগিয়ে যাবার একটি পাদপীঠ, অথবা সই বা সিঁড়ির মতন একটা কিছু, যা তোমাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। কেবল সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোন সার্থকতা নেই। যদি এই ভাবে অনুভব করতে শেখ, যা কিছুই অতীতের পর্যায়ে পড়ে গেছে তার দিকে পিঠ ফেরাতে পার, কেবল যেটা তুমি করতে চাইছ সামনে সেই দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখ, তাহলে বেশ বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। চলতি পথে আর সময় নষ্ট হবে না। যেটা তোমার সময় নষ্ট করায়, সর্বদাই তা হল, যেটা আগে ছিল, যেটা এখনও রয়েছে, তার মধ্যে যেটা তোমার কাছে সুন্দর এবং শুভঙ্কর বলে বোধ হয়েছে সেগুলোকে জোঁকের মতন আঁকড়ে ধরে থাকা। সেগুলো যেন কেবল তোমায় সাহায্য করে। তাদের বর্জন করবে না, কিন্তু সেগুলো যেন তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেগুলো যেন হয় শুধুমাত্র এমন কিছু, যার উপর ভর করে তুমি সামনের দিকে এক পা এগিয়ে যেতে পার।

হয়ত বিশেষ কোন একটা সময়ে, অন্তরের এবং বাইরের কতকগুলো ঘটনার সমাবেশে কেউ একটা বিশেষ স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছিল। ধর যেমন তুমি বললে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে, কিম্বা কোন বইয়ের একখানা পাতা পড়ে বা কোন বক্তৃতা শুনে, হঠাৎ তোমার অন্তরে একটা উপলব্ধি হল, একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলে, বা ওই জাতীয় একটা কিছু হল যেটা তোমাকে নাড়া দিল, তোমার বেশ বোধ হল, যেন নতুন একটা কিছুর দিকে তোমার ভিতরটা খুলে গেছে। কিন্তু সেটাকে যদি তুমি শক্ত করে, এইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও, তাহলে সব কিছুই হারিয়ে ফেলবে। কারণ অতীতকে ধরে রাখতে পারা যায় না। সর্বদাই এগিয়ে যেতে হবে। আরও, আরও, আরও এগিয়ে চলতে হবে। এই জ্যোতির্ময় অবস্থা যেন তোমাকে তৈরী করে তুলতে পারে, যাতে এই নতুন স্তরে উঠে তুমি তোমার সমগ্র সত্তাকে গুছিয়ে গড়ে তুলতে পার, যার ফলে হঠাৎ একবার তুমি আরও একধাপ উপরে উঠে যেতে পারবে।

হঠাৎ উর্ধ্বের স্তরে উঠে যাওয়ার মাঝে এক সমান্তরাল (horizontal) গতি আছে। ঠিক যে মুহূর্তে তুমি হঠাৎ উপরের স্তরে উঠে গেলে, তৎক্ষণাৎ তোমার ধারণা হয় যেন একটা অলৌকিক উপলব্ধি হল, বিরাট এক আনন্দে অন্তরটা ভরে গেল। কিন্তু একবার এই ধাপটি অতিক্রম করার পরে, যদি আরও উপরে উঠতে চাও তাহলে আবার নিচে নেমে আসতে হবে। এই নিচের স্তর থেকে নিজেকে তৈরী করে চলতে হবে, যাতে আরও একধাপ উপরে উঠে যেতে পার। যে সব বস্তু তোমাকে হঠাৎ আনন্দে ভরিয়ে তোলে সেগুলো সবই হল উত্তরণ, উর্ধ্বে উঠে যাওয়া। কিন্তু এই উত্তরণগুলি সমান্তরাল উন্নতির সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তার মানে হল, তোমাকে ক্রমে ক্রমে আরও বেশী করে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। তুমি যথার্থই যা, সেই অবস্থায় ক্রমশ আরও বেশী করে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং এই অবস্থা থেকে সকল আভ্যন্তরীন্ এবং অন্তর্মানসিক (psychological) পরিণামগুলিকে লাভ করতে হবে, এবং কাজের মধ্যেও সে সবকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ উপরের দিকে উঠে যাওয়াটাকে এই ভাবে, সুদীর্ঘকাল ধরে কাজে লাগাতে হয়, আর আমি তোমাদের আগেই যে কথা বললাম, উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া দুরকমের আছে। কিন্তু এই সমান্তরাল গতিটি হল অপরিহার্য।

থামলে চলবে না। তোমার ঊর্ধ্বের দিকের খাড়াই (vertical) উন্নতিকে আঁকড়ে ধরে থেকে, আর নড়তে না চাইলে চলবে না। যদিও সেটার যাত্রা তুমি একটা অলৌকিক কিছু উপলব্ধি করেছ, সেটিকে কিভাবে ছাড়তে হয় তা জানা চাই, নইলে নতুন আর একটির জন্যে কি ভাবে তৈরী হতে হয় তা জানতে পারবে না।

সিদ

বিয়োগান্ত-মিলনাত্মক নাটক

পীয়ের কর্ণেই
Pierre Corneille

[আরবী সৈয়দ যেমন রাজমর্যাদাসূচক, আমাদের সদাশয় বা সরদার বোধ হয় অনুরূপ পদকৌলিন্য নির্দেশক।]

ফরাসী ক্লাসিকাল নাট্যসাহিত্যে দিকপাল ত্রয়ী—রাসীন, কর্ণেই, মোলিয়ের। ফরাসী প্রতিভার তিনটি ধারা এঁদের ধরে পরিস্ফুট রাসীন হলেন উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং শিল্পসংযমের প্রতিমূর্তি, কর্ণেই হৃদয়-প্রাণের বিচিত্র বিপুল তরঙ্গলীলার মূর্ত বিগ্রহ, মোলিয়ের তার উদার রহস্যময় রসিকতা ও উচ্ছল আমোদ-বিলাসের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

—চরিত্র—

দন ফের্দনান্দ	কাস্তিলের প্রথম রাজা
দনা উরাক	দন রোদ্রিগের পিতা
দন গোমেজ	গোরমা'র কাউন্ট, সিমেনের পিতা
দন সাঞ্চো	সিমেনের পাণিপ্রার্থী
দন আরিয়াস দন আলফঁস	কাস্তিলের ভদ্রবর
সিমেন	দন গোমেজের কন্যা
লেওনরা	রাজকন্যার সেবিকা
এলভির	সিমেনের সেবিকা
রাজকন্যার জনৈক ভৃত্য	

প্রথম অঙ্ক

সিমেনের বাড়িতে

প্রথম দৃশ্য

শিমেন, এলভির

শিমেন। এলভির, বল তো, একথা কি সত্যি? বাবার কথার একটুও হেরফের করনি তো?

এলভির। সেসব কথা মনে আনলে বুক আবার দুলে ওঠে।
রোদ্রিগের উপর তোমার যত ভালোবাসা তত্তো তাঁর শ্রদ্ধা
যতটা তাঁর গভীরতম অন্তরের কথা বুঝতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে
তিনি ওই লোকটির প্রতি তোমার প্রেম নিবেদন করতে বলবেন।

শিমেন। স্পষ্ট ক'রে আবার বল, কী কারণে তোমার মনে হল
আমার পছন্দে তাঁর সম্মতি আছে, আবার শুনি
কী ভরসা তিনি আমাকে দিচ্ছেন,
এমন সুন্দর অনন্তকাল ধরে শুনতে রাজী আছি।
অতিরিক্ত আস্বাভরে তুমি কিছুতেই আমাদের প্রেমে
তাঁর সম্মতির প্রতিশ্রুতি দিতে পার না।
তোমার সঙ্গে রোদ্রিগ ও সাঙ্কো মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছিলে
তার বিষয়ে তিনি কী বললেন?
যে বৈপরীত্য আমাকে রোদ্রিগের দিকে নিয়ে গিয়েছে
তা তুমি খুলে ধর নি?

এলভির। না, আমি এঁকে ধরলাম নিরাসক্ত তোমার হৃদয়,
যা না-একে না-ওকে আশান্বিত বা হতাশ করেছে,
অতি নির্দয় বা অতি সদয়ও নয়,
কিন্তু পতি বরণে পিতার পছন্দেরই অপেক্ষায়।
পিতৃভক্তি তাঁকে মুগ্ধ করল,
তাঁর ওষ্ঠাধর এবং সর্বাঙ্গ জানাল সম্মতি।
আর যেহেতু তোমার হৃদয় বার বার তাঁর মুখের কথা
চাচ্ছে তাই বলি "আমার পছন্দের অপেক্ষায় থেকে

সে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছে ;
দু'জনেই সমান যোগ্য, উভয়েরই অভিজাত রক্তে জন্ম ;
সমান বিশ্বস্ত ও সাহসী। দু'জনেরই তরুণ মুখশ্রী
সগৌরবে প্রকাশ করছে পুরুষানুক্রমিক ধারায় নেমে আসা নানা গুণাবলী।
রোড্রিগের দৃষ্টিতে আকাশচুম্বী সাহস এবং নির্মল সম্মান ছাড়া
আর কিছুর লেশমাত্র দেখি না।
যুদ্ধে নানা পুরস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠেছে এই যুবক,
এদের বংশ দিয়েছে কত যে বীর।
বীরত্বব্যঞ্জক ও জয়ের অপূর্ব কাহিনী কত শোনা আছে।
কপালের রেখাগুলি যেমন বয়েসের হদিশ দেয়
তেমনি আরো স্পষ্ট বলে দেয়
অস্ত্র নিয়ে যত মহৎ কৃতিত্ব অর্জনের কথা।
বাপের যোগ্য হবে ছেলে।
ও আমার মেয়ের হৃদয় পেলে খুশি হব।"
এই বলে তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন মন্ত্রণালয়ে,
সেই জরুরী কালগ্রহে আলাপে ছেদ পড়ল :
তবে তড়িঘড়ি বলায় মনে হয় একথা স্পষ্ট
যে কারো দিকে প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্ব তাঁর নেই।
রাজা তাঁর পুত্রের আচার্য নির্বাচন করবেন
এবং তোমার পিতাই একাজ পেয়েছেন—নির্বাচন নিশ্চিত,
এবং তাঁর দুর্লভ বীরত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন বা তর্ক উঠতেই পারে না।
তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার জুড়ি নেই—
না রাজসভায় না রণক্ষেত্রে।
আর যেহেতু তোমার রোড্রিগ তার পিতৃবাক্য পেয়েছে
সভাস্তে বিবাহের উদ্যোগ করতে
তোমার হৃদয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তাঁর কথায়,
কোমল আশায় পরিতৃপ্ত থাকতে পারে।

শিরেন। দুরন্ত হৃদয় আমার এখন আশায় থোরাই স্বস্তি পাচ্ছে,
বরং বিষণ্ণ দ্বিধায় নিশ্চিষ্ট হয়ে চায় নিশ্চয়তা
নিয়তি এক নিমেষে তার মত বদলাতে পারে :
তাই আনন্দের অর্থও হতে পারে দুঃখ।

এলভির। না, সুখের বিষয় এই ভয় দূর হয়ে যাবে।

শিরেন। চল যাই। অপেক্ষা করা যাক, যা আছে ভাগ্যে।

সিনেনের বাড়িতে

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজকন্যা, লেওনর, ভৃত্য

রাজকুমারী। আজ্ঞাবাহী সিনেনকে শীঘ্র গিয়ে বল
আমার সঙ্গে সাক্ষাতে সে একটু দেরীই করছে,
আমার স্নেহ নালিশ জানাচ্ছে—
তাকে ভালোবাসে এই যে-হৃদয় তাকে সে অবহেলা করছে।
(ভৃত্যের প্রস্থান)

লেওনর। মহাশয়া, প্রতিদিন একই বাসনা আপনাকে চেপে ধরে,
প্রতি সাক্ষাতে আপনি জানতে চান
তার প্রেমিক উন্নতির দিকে কতটা এগুলো।

রাজকুমারী। তার হেতু আছে তার হৃদয় বিদ্ধ করেছে যে-শর
তা আমিই নিক্ষেপ করেছি।
সে রোদ্রিগকে ভালোবাসে
আমার হাত থেকেই তাকে নিয়েছে,
আমারই কল্যাণে রোদ্রিগ জয় করেছে তার অনিচ্ছা।
এমন করে দুই প্রেমাসক্তকে শেকলে বেঁধে
আমার লক্ষ্য হল তাদের সকল দুঃখের অবসান করা।

লেওনর। মহাশয়া, ওদের পরস্পরে প্রেমের নিবিড় আনন্দ
আপনার হৃদয়ে তেমন সুখ জাগায় না—
আমি যতদূর আপনার অন্তর দেখছি।
তাদের আশা দুঃখের ভার হয়ে চাপে আপনার ভিতরটায়।
আর এই যে তীব্র আগ্রহ দেখাচ্ছেন ওদের জন্য
তা কি অসুখী করছে আপনাকে, ওদের সুখী ক'রে?
কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলাম, অধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

রাজকুমারী। লুকিয়ে রেখে দুঃখ আমার দ্বিগুণ হয়।
শোনো, শোনো, তাহলে কেমন লড়াই আমার,
শোনো, সাহস আমার কী আক্রমণ বুক পেতে নিচ্ছে

প্রেম স্বেচ্ছাচারী, সে কাউকে রেহাই দেয় না
এই তরুণ বীর এই প্রেমিক, যাকে ছেড়ে দিলাম,
তাকে ভালোবাসি।

লেওনরা তাকে ভালোবাসেন আপনি!

রাজকুমারী। বুকের উপর রাখ হাতখানি,
দেখ তার বিক্ষোভের মাঝে কত সে বিচলিত
যেন তাকে সে চেনে।

লেওনরা। মহাশয়া ক্ষমা করবেন,
মধুর সৌজন্যে বিরত হবনা আমি
আপনাকে এই অনুরাগের জন্য তিরস্কার ক'রে।
কিন্তু ডাকসাইটে রাজনন্দিনী এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে
নিজের অন্তঃপুরে এ কি ডেকেছেন সাধারণ এক রণবীরকে।
রাজা কী বলবেন? কাস্তিল কী বলবে?
মনে আছে কি কাদের মেয়ে আপনি?

রাজকুমারী। আছে বৈ কি।
আমার পদ-মর্যাদার হানি ঘটাবার আগে
চিরে দেখাব আমার ধমনীতে রক্তধারা,
রাজকীয় অন্তরে নাকি একমাত্র যোগ্যতাই
প্রেমের উচ্ছল আলো জ্বালতে পারে;
তেমন চাইলে আমার কামনা চরিতার্থের জন্য
আমার মতো পদস্থ অনেকে জড়ো হত।
কিন্তু প্রেমের আকুল ছুতো তো সম্মানের পরোয়া করে না,
আর আমার বিস্মিত অনুভূতি আমার সাহস একটুও কমায় না।
রাজার মেয়েকে রাজার সঙ্গিনী হতেই হবে;
আমার পাণিপ্রার্থী রাজা ছাড়া কেউ নেই।
হৃদয়কে আমার মরণ-কল্প প্রায় সেই চরম দণ্ড থেকে বাঁচাতে
যাকে নিতে পারিনি তাকে নিজেই দিলাম অন্যের হাতে।
আমার পরিবর্তে শিমেনকেই দিলাম তাঁর সঙ্গে বেঁধে,
জেলে দিলাম তাদের আলো আমার দীপ নিভিয়ে।
তাই অবাক হ'য়োনা যদি আমার বিষণ্ণ হৃদয়
তাদের মধুগুঞ্জন শোনার অপেক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে
দেখতেই পাচ্ছ তারই উপর আজ আমার বিশ্রাম নির্ভর করছে।

প্রেম আশা নিয়ে বাঁচে আর আশা গেলেই তার মরণ
এ এমন আগুন যে উস্কানির ইন্ধন না পেলে নিভে যায়,
আমার এই করুণ প্রয়াসের তপস্যা সত্ত্বেও
শিবেন যদি রোদ্রিগাকে পতিরূপে শীঘ্র পায়
তবে আশার আমার শেষ এবং আত্মার নিরাময়।
অবিশ্বাস্য যন্ত্রণাভোগ তবু আমার
সেই শুভলগ্ন না আসা পর্যন্ত রোদ্রিগ আমার প্রিয়া
তাকে হারাবার কাজই আমার খেলা
আবার সে-হারানোতেও দুঃখ
এর পরে সে-ধারা হবে আমার গোপন যাতনা।
অতৃপ্তিভরে দেখছি যে যাকে অবহেলা করি
প্রেমে তারই জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে
আমার হৃদয় যেন দুই ভাগে ভেঙে গেছে
সাহস আমার উঁচু হলেও হৃদয় যে উতলা
এ মিলন আমার পক্ষে সর্বনাশা
তাই আমার ভয় ও বাসনা
এর ফল আশা করি একমাত্র অপূর্ণ আনন্দ।
এই অঙ্গনে জীবনান্তক যুদ্ধে নেমেছে সম্মান আর প্রেম
কেউ পুরোপুরি জিতবে না, হারবেও না।

লেওনরা। এরপর আপনাকে বলার আমার আর কিছুই নেই,
শুধু আপনার কষ্টে আপনার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি
কখনো আগে আপনাকে দোষারোপ করেছি,
এখন কিছু অনুযোগ করব।
তবে এমন মধুর এবং তীব্র সংগ্রামে
আপনার সদ্‌গুণ যখন লড়াই করে চলে
তার মাধুর্য দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত ক'রে ও বিষাদ বর্জন ক'রে,
সে-ই আপনার বিচলিত অন্তরে এনে দেবে প্রশান্তি।
তারই কাছে সব চান এবং কালের কাছে সাহায্য
সব চান ঈশ্বরের কাছে—ন্যায়ের মূর্তি তিনি
আপনার সদ্‌গুণের দীর্ঘ প্রার্থনা অবহেলায় রাখবেন না।

রাজকুমারী। আমার মধুর আশা হ'ল আশা হারানো।

ভৃত্য। আপনার আদেশে শিবেন আপনার দর্শনপ্রার্থী।

রাজকুমারী। (লেওনরাকে) ওই বারান্দায় গিয়ে আলাপে রাখ ওকে।

লেওনরা। আপনি কি স্বপ্নেই মশগুল থাকবেন?

রাজকুমারী। না তবে ওর কাছ থেকে নিজের দুঃখ লুকাতে চাই,
যা পারিনা সেই সুখী-সুখী ভাব দেখাতে চাই;
যাচ্ছি তোমার পরেই। (স্বগতোক্তি) ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর,
শুধু তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা—
এই দারুণ যন্ত্রণার শেষ করে দাও,
দাও বিশ্রাম, সম্মানের পথে হও দিশারী;
অন্যের আনন্দেই চেষ্টা করব পেতে নিজের আনন্দ।
এই মিলন-বন্ধনের জন্য তিনটি হৃদয় অপেক্ষমান;
দাও, তাড়াতাড়ি সাধ্য করো,
নয়তো বল দাও আমার দুর্বল অন্তরকে।
যে বন্ধনসূত্র এই সুখী প্রেমার্তদের একত্র করবে
তা ভেঙে দেবে আমার শৃঙ্খল আর ঘুচাবে আমার যন্ত্রণা।
কিন্তু দেরি করে ফেলছি; যাই, শিগগির কোথায় দেরি।
তার সঙ্গে আলাপে স্নিগ্ধ হবে বেদনা।

(প্রস্থান)

(রাজপ্রাসাদের সামনে বারোয়ারি জায়গা)

তৃতীয় দৃশ্য

কাউন্ট, দিয়েগ

কাউন্ট। আপনিই ওটা তাহলে পেলেন,
অথচ রাজানুগ্রহ যে পদে আপনাকে তুলল সেটা আমারই প্রাপ্য ছিল;
কাস্তিল-রাজকুমারের শিক্ষক হলেন আপনি।

দন দিয়েগ। এই যে সম্মান তিনি দেখালেন আমাদের পরিবারের প্রতি
তা সকলকে দেখিয়ে দিল যে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ,
বেশ বুঝিয়ে দিল যে অতীতে সেবার পুরস্কার দিতেও জানেন।

কাউন্ট। রাজারা যতই বড় হোন, আমাদের মতোই তাঁরা!
অন্য মানুষের মতো ভুলও করতে পারেন,
এই মনোনয়ন সব সভাসদদের দেখিয়ে দেবে
তাঁরা বর্তমান সেবার মূল্য দিতে ঠিক জানেন না।

ডন দিয়েগ। যে নির্বাচন নিয়ে তুমি ক্ষুব্ধ তা নিয়ে কথা না তোলাই ভালো
যোগ্যতার মাপেই তিনি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন
কিন্তু এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে সম্মান দেখাতে হয়
রাজার পছন্দ সম্পর্কে কোনো তর্ক না তুলে।
তিনি যে মর্যাদা আমাকে দিলেন তার সঙ্গে জুড়ে দাও আর একটা ;
তোমার ঘর আর আমার ঘর এক বন্ধনে বাঁধা পড়ুক
তোমার একমাত্র কন্যা এবং আমার একমাত্র পুত্র
ওদের পরিণয় চিরতরে আমাদের বন্ধুত্ব এনে দেবে
আমাদের প্রতি দেখাও এই ঔদার্য এবং গ্রহণ করো এই আবেদন।

কাউন্ট। এই সখ্যতায় উৎসাহী আপনার ছেলে ?
আপনার পদের নব জৌলুসে তার বাপা অহংকারের ভারে
ঘুরে যাবে না তো ?
নূতন পদবী কাজে লাগান,
সদুপদেশ দিন রাজকুমারকে,
শেখান একটা প্রদেশ কেমনভাবে শাসন করতে হয়
যাতে তার নিয়মের অধীনে সকলে ত্রাসে কাঁপে,
যাতে ভয় ও ভালোবাসা সিংহাসন রাখে অটুট ;
নাগরিক কর্তব্যের সঙ্গে তাকে দেখেন সৈনিকের জীবন
যেন হাসিমুখে কষ্ট বরণ এবং নির্ভয়ে অতুলনীয়ভাবে নামতে পারে যুদ্ধে ;
ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি কাটাতে পারে,
আপাদমস্তক রণসজ্জা প'রে ঘুমুতে পারে
বাঁচি অধিকার এবং যুদ্ধজয় করতে পারে,
বিজয়ের জন্য দায়িক হতে পারে নিজেই।
দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেখাবেন ;
তার তরুণ দৃষ্টি আপনার মধ্যে স্বরূপের পরিপূর্ণ চিত্র দেখতে পায়।

ডন দিয়েগ। তোমার ঈর্ষাকাতর অন্তর ফুটে উঠছে এই বিদ্রূপের ভাষায়,
কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য আমার জীবনের পাতায়
চোখ ফেললেই হ'ল,
সেখানে বীরত্বমণ্ডিত কীর্তির নম্র ইতিহাস পড়ে সে জানবে

কি করে পরের দেশ পদানত করতে হয়,
দুর্গ অধিকার করতে হয়
সেনাবাহিনী চালনা করতে হয়,
এমন সুনাম অর্জন করতে হয় যার দিকপ্লাবী ভিত্তি মহৎ কীর্তি।

কাউন্ট। জীবন্ত দৃষ্টান্তই একমাত্র শিক্ষারী ;
বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না রাজকুমার।
আবার একটি দিন আপনার আত্মোৎসর্গিত পঞ্চ বছরের সমান
এবং তাদের ছাড়িয়েও যায়।
আপনি বীর ছিলেন
আর আমি বীর এখন।
আমারই সবল বাহুতে এই রাজ্য সুরক্ষিত ;
আমার তরবারি ঝলমলিয়ে ওঠে যখন তখন আরাগঁ পালায়,
প্রাণাদায় থরহরি কম্প ;
আমারই নামের প্রতাপ সুরক্ষিত দেয়ালে ঘিরে রেখেছে কাস্তিলকে।
আমি না থাকলে আপনারা বিদেশী শাসনের অধীন হতেন
শত্রুরা অচিরে হয়ে বসত আপনাদের রাজা।
প্রতিদিন, প্রতিটি ধাবমান প্রহর আমার যশ কীর্তন করে
জয়ের পর জয় আনে, প্রশংসার উপর প্রশংসা।
আমার আশ্রয়বাহুর ছায়াতলে রাজকুমারের উচিত
রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখানো
জয়লাভ দেখে বিজয় অর্জন শেখা।
তরুণ বয়সেই রাজকুমারের উচিত বীরত্বের চূড়ায় ওঠা
দেখা উচিত...

দন দিয়েগ। আমি জানি ! তোমার প্রভু রাজাকে বেশ সেবা কর তুমি ;
আমার নেতৃত্বাধীনে তোমাকে বহুবার দেখেছি যুদ্ধ করতে ;
যখন বার্দ্ধক্যের অবশ ধারা আমার সামর্থ্য স্তিমিত করেছে
তখনই তুমি ফলাতে পেরেছ বীরত্ব
তার বেশি নয়, আমি যা ছিলাম তুমি আজ তা-ই।
তবে একথাও সত্যি যে পছন্দের বেলা
আমাদের মধ্যে রাজা তবু দেখতে পান পার্থক্যটি।

কাউন্ট। না ! আমার ন্যায্য দাবি আপনি চুরি করে নিয়েছেন।

দন দিয়েগ। সম্মান জিতে নেওয়া যোগ্যতারই প্রমাণ।

কাউন্ট। সে-ই সবচেয়ে যোগ্য যে যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার জানে।

দন দিয়েগ। প্রত্যাখ্যাত হওয়া অর্ধ যোগ্যতার দুর্বল প্রমাণ।

কাউন্ট। সভাসদের ছলাকলা প্রয়োগ করেছেন আপনি,
জিতেছেন চক্রান্তে।

দন দিয়েগ। আমার একমাত্র সহায় আমার যশ।

কাউন্ট। মানি, রাজা তবু আপনার বার্দ্ধক্যকেই সম্মান দিলেন।

দন দিয়েগ। আমার বার্দ্ধক্যের মাপ নিয়েছেন তিনি আমার কীর্তি দিয়ে।

কাউন্ট। কীর্তি আর বয়েস যদি এক জিনিস হয়
তবে আপনার অনেক জ্যেষ্ঠ আমি!

দন দিয়েগ। যে সম্মান পায় নি সে পাবার উপযুক্তও নয়।

কাউন্ট। আমি উপযুক্ত নই? আমি?

দন দিয়েগ। হাঁ তুমি।

কাউন্ট। বুড়ো তোমার স্পর্দ্ধার এই ঠিকঠিক পুরস্কার।
(মুষ্টাঘাত)

দন দিয়েগ। (তরবারি কোষমুক্ত করে) নাও, বিদ্ধ করো!
আমাদের বংশে এই প্রথম লাঞ্ছনাচিহ্ন ধারণ করল মুখে।

কাউন্ট। নির্বীর্য আপনি কী করতে পারেন?

দন দিয়েগ। হায় ঈশ্বর!
প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যক্তিত শক্তি আমাকে ছেড়ে গেছে।

কাউন্ট। আপনার তরবারি এখন আমার,
কিন্তু আপনার পতনের এই জয়চিহ্ন
আমি নিলেও আপনার গৌরব।

বিদায় : বিদ্রূপবর্ষণ সত্ত্বেও শোনান গিয়ে রাজপুত্রের তরে
উন্নতির জন্য আপনার জীবনেতিহাস।
উদ্ধত বিতর্কের এই তিরস্কার আশা করি
কম শোভনীয় হবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

দন দিয়েগ

দন দিয়েগ। রাগ হতাশা : শত্রু বার্দ্ধক্য!
এই অপমানে শেষ হবার জন্যই আমার বহৎ জীবন?
কত বছরের যুদ্ধের পরিশ্রমে
বীরে ওগ্রান্বিত কেশের সঙ্গে পেয়েছি যে নামযশ
তা একদিনে মুছে যাবে?
যে-হাত গোটা স্পেনের বিস্ময়ের বস্তু,
যা রাজার সিংহাসন কতবার রক্ষা করেছে,
রাজদণ্ড রাখতে দিয়েছে তার হাতে অটুট,
তা এখন প্রতিশোধ না নিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?
হায়, অতীত গৌরবের একি নিষ্ঠুর স্মৃতি!
কত দিনের কীর্তি একদিনে বিলোপ।
নূতন সম্মান সর্বনাশী হল আমার সুখের।
উন্নীত চূড়া, সেখান থেকে পতন আমার মানমর্যাদার।
তোমার গৌরব থেকে দেখতে হবেই কি কাউন্টের ক্ষয়,
বিনা প্রতিশোধে মৃত্যু এবং অবমাননায় জীবন?
কাউন্ট, এখন তাহলে আমার রাজকুমারের শিক্ষক হও
মানহীনের জন্য এই উচ্চপদ হতে পারে না;
তোমার ঈর্ষান্বিত ঔদ্ধত এই নীচ সংঘর্ষের ফলে
রাজার নির্বাচন সত্ত্বেও আমাকে ও-পদের অনুপযুক্ত করেছে।
আর এই আমার কত মহৎ কীর্তির অস্ত্র,
এখন হিমস্তব্ধ দেহের নিরর্থক ভূষণ,
একদিন কত শত্রুর আতংকস্বরূপ এখন সজ্জামাত্র
আত্মরক্ষার আয়ুধ নয়,
যা মানুষের শেষ স্পর্শ ছেড়ে যা,
আমার হয়ে প্রতিশোধের জন্য যোগ্যতর হাতে যা।

পঞ্চম দৃশ্য

ডন দিয়েগ, ডন রোদ্রিগ

ডন দিয়েগ। রোদ্রিগ, সাহসী হৃদয় তোমার ?

ডন রোদ্রিগ। পিতা ছাড়া যে কোনো লোক এখনই তার প্রমাণ দিতে পারে।

ডন দিয়েগ। কি মধুর ক্রোধ। এ-আক্রোশ আমার ক্ষতের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ।
এই ত্বরিত বিদ্বেষে সোচ্চার আমারই রক্ত,
এই উত্তেজনায় যৌবনও ফিরে আসে আমার কাছে।
পুত্র আমার, কুলতিলক আমার, এস, আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবিধান কর,
এখনই প্রতিশোধ নাও আমার হয়ে !

ডন রোদ্রিগ। কেন ? কিসের জন্য ?

ডন দিয়েগ। সেই অপমান এত নির্দয় এত অন্যায়,
আমাদের বংশমর্যাদার সর্বনাশকর।
মুষ্ট্যাঘাত ! আমারই গালে ! তার প্রাণ শেষ,
কিন্তু অবশ আমার বাহু আমার মনের হুকুম মানে না।
এই যে তরবারি আমি আর তুলতে পারি না
তা তোমাকে দিলাম প্রতিশোধে প্রাণ নিতে।
এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে খাড়া কর তোমার সাহস
একমাত্র রক্তধারায়ই ধুয়ে যায় এ-কলঙ্ক,
তোমারও কর্তব্য হয় হত্যা নয় মৃত্যু।
এই যে আমার শত্রুটির সম্মুখীন হবে
সে তোমার উপযুক্ত বৈরী
ধূলিধূসরিত রুধিরসিক্ত কঠোরপণ তাকে দেখেছি
অনায়াসে বিরুদ্ধ বাহিনীকে ভয়কম্পিত করতে,
বিদ্যুৎবেগে শত ব্যূহবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে ;
এর অর্থ বীর সেনাপতিরও বেশি কিছু সে,
মহারথীর চেয়েও অধিক, সে সে...

ডন রোদ্রিগ। দয়া করে বলে ফেলুন।

ডন দিয়েগ। শিমেনের পিতা !

ডন রোড্রিগ। শিনেনের...

ডন ফিরেগ। না, কথা ব'লো না
আমি জানি তোমার প্রেম;
কিন্তু যে হতমান হয়েও বাঁচতে পারে সে বাঁচার যোগ্য নয়।
দোষী যদি প্রিয়জন হয় তবে সে-দোষ ঘোরতর।
আমার অভিযোগ তুমি জান,
তার প্রতিকার তোমারই হাতে;
এর বেশি বলব না—আমার ও তোমার হয়ে প্রতিশোধ নাও!
মনে রেখো কে তোমার পিতা,
কি ছিলেন তিনি!
নিয়তি যে লাঞ্ছনা চাপিয়েছে তার ভারে ভারাক্রান্ত
আমি যাই সেই খেদ বয়ে।
তুমি যাও, দ্রুত হানো প্রতিশোধের আঘাত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডন রোড্রিগ

ডন রোড্রিগ। হৃদয় আমার দুঃখে আকুল।
যে মারাত্মক আঘাত আমার সস্নেহ বিশ্বাসকে উপহাস করে
তা-ই আমাকে ন্যায়সঙ্গত বিরোধের শাস্তিদাতা
এবং অন্যায় বিরোধের বলি ক'রে তুলেছে।
উৎসাহ আমার মথিত
তবু আমার আশাঘাতীকে হস্তে ডাকতে হবে।
প্রেমের সাফল্য-দুয়ারে পৌঁছে শুনতে হল—
হায় ঈশ্বর, একি অদ্ভুত আশ্চর্য বেদনা!—
পিতা আমার পেয়েছেন রূঢ় অপমান
আর কীর্তিধর হলেন শিনেনের জনক!

চতুর্দিকে সংঘর্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি।
হাত তুলেছি পিতার শত্রুকে আঘাতের জন্য
অথচ প্রবল আবেগে প্রেম বলে উঠছে 'না'।

গর্ব তাতিয়ে তুচ্ছ হৃদয় কিন্তু স্নেহ হাত টেনে ধরছে ;
প্রবৃত্তির আবেদনের কাছে আমাকে বধির হতে হবে
নয়ত বরণ করে নিতে হবে অতল অপমানিত জীবন।
যা-ই করি তাতেই ফল তীব্র যন্ত্রণা
ঈশ্বর, এ কি আশ্চর্য অদ্ভুত বেদনা।
এমন নীচ অবমাননা কি শান্তিহীন যেতে পারে?
কিন্তু আমি শিমেনের পিতার বিরুদ্ধে লড়তে পারি?

কাকে দেব আনুগত্য?
স্নেহময় দৌরাত্ম্য না মহান সম্বন্ধকে?
কলঙ্কিত নাম না মধুর আমোদ হারানোকে?
আমার ভাগ্য অযোগ্য অসুখী জীবন।
(নিজের তরবারিকে) প্রিয়, অভিজাত ও দুঃসাহসীর অবিকল্প আশা
তুমি অর্পিত প্রেমে রক্ষিত,
আজ আমার মত সুখস্বপ্নের বৈরী,
আমার যত বেদনার হেতু তুমি তরবারি,
তুমি এই জন্যই এই কারণেই হওনি আমার?
আমার সম্মান রক্ষার্থে অথচ হারাতে শিমেনকে?

মৃত্যুর ভয়ংকর রাজ্য দেখতে হবে আমাকে।
কর্তব্য আর প্রেমের ওজন করা নিরর্থক।
তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ যদি নিই তবে লাভ আধার অন্যের ঘৃণা,
যদি প্রত্যাঘাত না করি তবে পাই তার উপহাস ;
মধুরতম আশার কাছে আমাকে অবিশ্বস্ত প্রমাণ দিতে হবে
নতুবা সেই আশার অযোগ্য আমি।
যা আমার সম্মানের ক্ষত নিরাময় করে তাই বাড়ায় আমার দুঃখ,
আনে তীব্রতর বেদনা ;
হৃদয় আমার, শক্ত হও।
মৃত্যুই যখন আমার একমাত্র শান্তি,
মৃত্যু বরণ করব আমি অথচ হারাব না শিমেনের প্রেম।

কী? প্রতিশোধ বিনা মৃত্যু?
মৃত্যু কামনা—আমার ভবিষ্য যশের যা পরিপন্থী?
তা সহ্য করা অর্থ—
যে একজন সম্মান রক্ষার চরম ক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে
সেই আমার মাথার স্পেনের চাপিয়ে দেওয়া লাঞ্ছনাভার?

আর তা সব সেই আশার জন্য
যাকে আমার ব্যাকুল হৃদয় ইতিমধ্যে সমনোন্যত দেখছে।

আর ওই কোমল কথাকলায় কান দেব না
আমার যন্ত্রণা শুধু বাড়িয়েই দেয়;
এস, বাহু আমার, তোমাকেই বরণ করলাম শেষে,
হায়, আর তো কিছুই শিমেনকে ফিরিয়ে দেবেনা আমার কাছে।
হাঁ, বুদ্ধি আমার প্রেমের দ্বারা প্রতারিত।
জীবনে খ্যাতি ও আর সব-কিছুর জন্যই পিতার কাছে ঋণী;
দুঃখে বা চরম আঘাতে যাতেই প্রাণ দিই
যেমন তাঁরই জন্য পেয়েছিলাম তেমনই তাঁরি জন্য ঢেলে দেব
একান্ত নিকলঙ্ক সত্যনিষ্ঠ রক্তধারা।
দুর্বল সিদ্ধান্ত নিয়ে টালবাহানা করলাম অনেকক্ষণ;
এখন চাই দ্রুত প্রতিশোধ।
অপমানের ঝলক উষ্ণধারায় উঠেছে আমার কপালে
আর যাতনায় ডেকে উঠছে তা,
পিতৃবংশের নাম রক্ষার্থে
এই আমি চললাম শিমেনের পিতাকে খুঁজতে।*

ক্রমশঃ

---

* অনুবাদক—সবীরকান্ত গুপ্ত

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য : ১·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

২৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যথাভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা পুরোণো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—৩০৲ টাকা (সডাক ৩৫৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫৲ টাকা (সডাক ৫০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা। সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হয়ে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

।। গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ।।

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকদের জমা ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
২৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা–৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

বর্তিকা

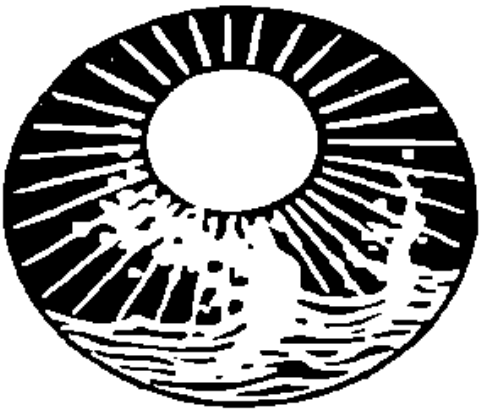

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৯

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৪
মায়ের আলাপ		১৯
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	...	২৯
সাবিত্রী—কাব্যের বিন্যাস	সুধা বসু	৩১
সিদ (নাটক)	পিয়ের কর্ণেই	৩৮

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathmondir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Ponicherry-2

When you are conscious
of the whole work at the
same time, then you can
become conscious of the Divine

Sri Aurobindo

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

১০ম পর্ব—৪র্থ সর্গ

পার্থিব বাস্তবের স্বপ্ন-গোধূলি

(১)

একটা চালু জায়গা এল, ধীরে নীচের দিকে নেমে ডুবে গিয়েছে ;
গড়িয়ে গিয়েছে একটা ধূসর অবতরণের স্খলন-পথে।
স্তিমিত হৃদয়ে অপরূপ আদর্শখানি হারিয়ে গিয়েছে :
তার উজ্জ্বল সুকুমার স্বপ্নের পুঞ্জীভূত বিস্ময়
আর অস্ফুট অর্ধরূপায়িত তুঙ্গতাসব সে পিছনে ফেলে এসেছে এখন
চিন্তা নেমে পড়েছে নিম্নতর স্তরের দিকে ; কঠোর তীক্ষ্ণ
উদ্যম সে একটা রূঢ় বাস্তবের জন্যে।
গোধূলি ভেসে রয়েছে তখনও কিন্তু হয় তার অন্যরকম হয়েছে,
গাঢ় আস্তরণে ঢেকে রেখেছে একটা অপ্রেম-প্রায় স্বপ্নকে ;
বাতাসে ভর করে রয়েছে পরিশ্রান্ত পুঞ্জে পুঞ্জে
তার প্রতীক-বর্ণরাজি সুর বেঁধেছে অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণের সঙ্গে,
এ যেন প্রায় দিনের কুয়াশার ঘোর ছটা।
একটা তীব্র কুলক্ষণ প্রকোপ তার হৃদয়কে অবরোধ করেছে ;
একটা বিষন ভারে ইন্দ্রিয় তার ভারাক্রান্ত হয়েছে,
তার শ্রবণে ধরা দিয়েছে ক্রমে বিষণ্ণতর তীব্রতর ধ্বনিসব ;
প্রখর আলোর স্পন্দনের কঠোর ফাঁকে ফাঁকে
দৃষ্টিতে তার ধরা পড়ে ছুটে চলে যায় ধাবমান মাঠের পর মাঠ
আর মেষালয় গিরিপুঞ্জ আর উদার বিস্তৃত ধূসর স্রোতস্বিনী যত,
আর যত নগরী বেয়ে চলেছে তাদের মিনার আর গম্বুজ ধরে
সুদূর-পরাহত অপরিবর্তিত আকাশের দিকে :
সুদীর্ঘ তটবাট আর ঘাট আর বন্দর যত শ্বেতশুভ্র পালে ভরা
ক্ষণতরে দৃষ্টিকে তার আকর্ষণ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে, তারপর যায় অদৃশ্য হয়ে।
এ সবার মাঝে কর্ম করে চলে শ্রমক্লান্ত জনসংঘ
চিরপরিবর্তিত নশ্বর দল বেঁধে,
চলচ্চিত্র যেন একখানা তুলে ধরা হয়েছে আলোকিত ছায়ারূপে সব ভরে দিয়ে
স্বপ্নের ধূসর পরিধানে আবৃত রেখে।
জীবনের গুরুভার গতিধারার অর্থ কিছু তারা কল্পনা করে,

নির্ভর করে চলে অনিশ্চিত পরিবেশের পরে
আর অপেক্ষায় রয় মৃত্যু এসে অবশেষে এনে দেবে তাদের অন্তরাত্মার নবতর রূপমঞ্চ।
কর্মক্ষেত্রে আর পদভার তুলে ধরেছে বিকট কোলাহল এক
যুদ্ধরত জীবনধারার আর চিন্তার ও কর্মের চিরকালের সেই একই সমস্বরে গুঞ্জন,
যেন একটা বিপুল নিষ্প্রাণ যন্ত্রের একই অস্ফুট নিত্য গর্জন,
তার অন্তরাত্মাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে,—
সরব অশান্ত সাগরের আর্তকণ্ঠ
ছড়ায় তার ধূসর অতৃপ্ত আরাব ভূতাবিষ্ট যেন।
বিপুল অমানুষী দানবীয় নির্ঘোষ এক,
বহুল বিচিত্র যন্ত্রের বজ্রধ্বনি যেন উঠে চলে স্বর্গ অভিমুখে,
যন্ত্রাবলীর কম্পন আর আয়ুধরাশির ঝংকার
নিয়ে আসে গর্ভবেদনার গভীর নিভৃত স্বর।
বিবর্ণ বিদ্যুৎমালায় দীর্ণ য ন পীড়িত আকাশ,
দূরে মাথার উপরে মেঘের বলয় যেন কাতারে কাতারে জ্বলে ওঠে
ধেয়ে চলে ধোঁয়া যেন উৎক্ষিপ্ত রক্তবর্ণ মুড়দের মুখ হতে,
অজ্ঞান মনের কৃতকৃত সৃষ্টিসব
দেখে সে খণ্ডিত ছবি সব ছুটে যায় ভেসে যায়
মানুষী চিন্তার মানুষী নিরাশার প্রেতমূর্তি সব,
প্রকৃতির আপন আকার আর মানুষের শিল্প-শ্রী,
দর্শনশাস্ত্র আর সাধনসূত্র আর বিধি-বিধান,
আরও দেখে পুরাতন সমাজের মৃত আত্মা,
অসুরে গড়ে যে কৃপাণলী আর যা গড়ে কৃমিকীটে।
বিস্মৃত আলোকের লুপ্ত অবশেষ যেন,
মনের সম্মুখে তার পালিয়ে যায় শ্রান্ত তাদের ডানা টেনে টেনে
স্তিমিত জ্ঞানজ্যোতি যত মুক্তিপ্রদ মন্ত্র যত,
ব্রতত্রাতা তারা, ত্রাণশক্তিহারা,
বার্তাবহ দেবতাদের নববার্তা,
ভবিষ্যদ্রষ্টার কণ্ঠ যত, লয়মুখী মতবাদের শাস্ত্রলেখ যত।
প্রত্যেকে তার ক্ষণিকায় দাবি করেছে চিরন্তন সে আর চলে গিয়েছে :
আদর্শ, সম্প্রদায়, জ্ঞানবিজ্ঞান, কাব্য, শিল্প কত যে
অবিশ্রান্ত লোপ পেয়েছে তারা আবার ফিরে এসেছে,
সৃষ্টিশক্তি এক কত না উদ্বেগে চেয়েছে তাদের।
সব তবু স্বপ্নমেলা অনন্ত শূন্য এক পার হয়ে যায়।
নিঃসঙ্গ দ্রষ্টাদের তপস্বী কণ্ঠ আহ্বান করে চলে
পর্বতের চূড়ায় অথবা নদ-নদীর তটভূমে
অথবা আরণ্য-বীথিকার সাথীহীন হৃদয় হতে

খুঁজে সে-স্বর্গের শান্তি আর আত্মার নির্বাক শান্তি,
অথবা নিঃস্পন্দ শরীর যত প্রস্তরমূর্তির মত স্থিরপ্রতিষ্ঠ
নিদ্রাহীন তাদের চিন্তা যেখানে স্তব্ধ সমাহিত
আসীন সেখানে ঘুমন্ত আত্মা যত—এও তবু স্বপ্নমাত্র।
যা-কিছু অতীত সৃষ্টি করেছে যা-কিছু ধ্বংস করেছে সব রয়েছে সেখানে,
বিলুপ্ত বিস্মৃত রূপ যত তার ছিল জীবন্ত এককালে,
আর বর্তমানের যা-কিছু প্রিয় নবোন্মেষ রূপে
আর আশা যত ভবিষ্যৎ নিয়ে আসে
ব্যর্থ হয়ে গেছে সব, মিথ্যা প্রয়াসে বাঁধা পড়েছে আর ক্ষয় পেয়ে গিয়েছে,
নিরর্থক তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে যুগ-যুগান্তরে।
সব ফিরে আসে অবিশ্রান্ত, নিরন্তর প্রয়াস করে চলে
কারণ আনন্দ তার অন্বেষণের বেদনায়,
আনন্দ তার পরিশ্রমে, আনন্দ তার বিজয়ে পরাভবে,
আনন্দ তার সৃষ্টি ক'রে পালন ক'রে, আনন্দ তার ধ্বংস ক'রে।
যুগচক্র ঘুরে চলে গিয়েছে, ফিরে আবার এসেছে,
আবার নিয়ে এসেছে সেই একই প্রযত্ন, সেই একই নিষ্ফল পরিণাম,
রূপ সব চিরনূতন আবার চিরপুরাতন—সুদীর্ঘ
এই বিশ্বের ভয়াবহ আবর্তনধারা।

ওঠে পুনরায় আর একবার বিরাট সেই কণ্ঠ কালাতীত
পার হয়ে লোক সকলের ব্যর্থ পরিশ্রমধারা
তার বিপুল নাস্তির সর্ববিজয়ী শক্তি
চলেছে অনুসরণ করে বেদনাক্লিষ্ট কালের অজ্ঞান অভিযান।
"চেয়ে দেখ এই প্রতীকলোকের আকৃতিগুলি,
তার স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তিগুলির দৃঢ়বদ্ধ চতুঃসীমা
পৃথিবীর মহান নিরেট কর্মাবলীর অনুপ্রেরণা যেখানে।
এইতো মানুষী জীবনের গাতনিবদ্ধ কাহিনী
এখানেই তুমি অনুধাবন করতে পার প্রকৃতি এনে দিয়েছে যে পরিণাম
অস্তিত্বের পাপ আর বস্তুরাজির ভ্রান্তিমাঝে
আর যে বাসনা অব্যর্থভাবে নিয়ে আসে জীবনধারণ
আর মানুষের অসাধ্য ব্যাধি আশার পোষণ।
নিত্যস্থির শৃঙ্খলায় যে শ্রেণীক্রম
সেখানে প্রকৃতির পরিবর্তন নাই, মানুষও অক্ষয় পরিবর্তনে :
চিরদিন সে মেনে চলে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পরিবর্তনবিধি ;
প্রকৃতির পুনঃপুনঃ কথিত আখ্যানের নবসংস্করণে
যুগচক্রে ঘুরে চলেছে মানবজাতি।

মন তার আবদ্ধ বৃত্তাকার সীমানা সকলের ক্রমে
মানুষ হল মানস, চিন্তার বাহিরে সে উঠে যেতে পারে না।
তার সীমাসব যদি অতিক্রম করে যেতে পারে তবেই সে নিবিষ্ট
চেয়ে দেখে সে কিন্তু উঠে যেতে পারে না তার বৃহত্তর আকাশতলে ;
ডানাও যদি সে পেয়ে যায় তবুও ফিরে সে নেমে পড়ে তার সহজাত মাটির 'পরে।
বন্দী সে তার আপন মনের জালে
অন্তরাত্মার ডানা দিয়ে বৃথাই সে আঘাত করে জীবনের দেওয়াল পরে।
বৃথাই তার হৃদয় হতে উঠে যায় আকুল প্রার্থনা,
সনুজ্জ্বল দেবতাদের দিয়ে ভরে দেয় সে নিরাকার শূন্য
হতাশে অবশেষে ফিরে যায় সেই শূন্যে
আর সেই স্বপ্নহীন রিক্ততায় চায় মুক্তি তার,
অন্তরাত্মার স্বপ্ন তার সেই প্রশান্ত নির্বাণ
বাক্ শেষ হয় নীরবতার মধ্যে, নামের শেষ নাস্তি।
অগণিত জনতার মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে,
আহ্বান করে সে অলভ্য ভগবানকে
তার একক অন্তরাত্মার প্রেমিকরূপে
অথবা ঢেলে দেয় সে নিজ আত্মাকে তারই শূন্যের আলিঙ্গনে,
অথবা সে দেখে আপন প্রতিরূপ নিরপেক্ষ সর্বান্তির মধ্যে ;
আরোপ করে সে অচলের উপরে আপন প্রকল্প,
শাশ্বতের মধ্যে দেখে ক্রোধ ও প্রেম
আর অনামাকে ভূষিত করে সহস্র নাম দিয়ে।
আশা কোরো না কখনও ভগবানকে ডেকে আনবে জীবনের মধ্যে
কি করে তুমি নিয়ে আসবে এখানে সেই চিরন্তনকে ?
গৃহ নাই তার এখানে এই ধাবমান কালক্রমে।
নিরর্থক তুমি খুঁজে চল জড়ের জগতে লক্ষ্য এক ;
কোন লক্ষ্য নাই, আছে শুধু এক অস্তির সঙ্কল্প।
বিশ্ব চলেছে প্রকৃতির বন্ধনবশে একভাবে চিরকাল।
চেয়ে দেখ এই সব রূপ ক্ষণতরে দাঁড়ায় আবার চলে যায়,
এই সব জীবনধারা কামনায় প্রয়াসে পরিপূর্ণ, আর নাই তারা ;
এই সব রূপগঠন, নিত্যকার সত্য নাই সেখানে কিছু,
তাদের উদ্ধার-নয় উদ্ধার করে না তাদের আপনাকে,
ডুবে যায় সম্বৎসরাবলীর হস্ত-নিষ্পেষণ তলে,
মানুষের চিন্তা পরিহার করে, কালের ধারা মিথ্যা প্রমাণ করে ;
যত দর্শনে সকল সমস্যা দীর্ণ করে নগ্ন করে ধরে
কিন্তু কোন কিছুরই মীমাংসা হয় নাই পৃথিবীর আদিকাল হতে,
মূল বিজ্ঞান অবধি নিরর্থক তার সর্বশক্তিমত্তা নিয়ে,

মানুষ শিখেছে তার কল্যাণে সূর্যসব গঠিত কোন উপাদানে,
রূপান্তরিত করে সব রূপে তার বাহ্য প্রয়োজনে মিটাবার জন্য,
আকাশ ভেদ করে উড়ে যায়, ডুব দিয়ে চলে সাগরতলে
কিন্তু শেখে নাই তবু নিজেরা কি বস্তু, কেন এসেছে তারা
এইসব নীতিশাস্ত্র, মানুষের মস্তিষ্ক দিয়ে গঠিত,
তার গঠন-উপাদান হল ভাল এবং মন্দ, তাতে মানুষের চেতনাকে বেঁধে রাখে অচলায়তনে
জীর্ণ বাসভবন যত, যুগপৎ রাজপ্রাসাদ আর কারাগার,
যতদিন রাজত্ব তাদের ধীরে ধীরে পচে যায়, ধ্বসে যায় ক্রমে ধ্বংসস্তূপে :
এইসব বিপ্লব যত, অসুর বা পীনবক্ষ দেবতা,
নিপীড়িত করে মানুষের ক্ষতাক্ত দেহ
নূতন রং ফিরায় শুধু পুরাতন আননে :
এই যত যুদ্ধ, এই যত বিজয়ের রক্তস্রোত, এই যত উন্মত্ত ধ্বংস
শত শতাব্দীর কর্ম বিলুপ্ত প্রস্তরকাল মধ্যে,
পরাজিতের রক্তধারা আর যে বিজয়ীর মুকুট
যার জন্য ভবিষ্যতের মানুষ তাদের বেদনা দিয়ে মূল্যদান করবে,
এই যে দেবোপম মহাবীরের মুখমণ্ডল বয়ে চলে পশুর অসুরাক্তি,
অসুরের গরিমা মিশে রয়েছে অর্ধ-দেবতার মাহাত্ম্যের সঙ্গে,
এই যে মহিমা, এই যে পশুত্ব, এই যে কলঙ্ক ;
কেন এ সব—এই যে শ্রম, এই যে কোলাহল
ক্ষণিকের সুখভোগ, অশ্রুর অন্তহীন সাগর
এই যত আকাঙ্ক্ষা আশা উৎকণ্ঠা,
এই যে সংগ্রাম, বিজয় আর পতন,
এই লক্ষ্যহীন যাত্রা বিরাম নাই যার,
এই চিরজাগ্রত আয়াস আর এই অসংলগ্ন সৃষ্টি ?
সঙ্গীত আর চিৎকার আর রোদন, বিজ্ঞতা আর ব্যর্থ বাক্যাবলী,
মানুষের হাস্য আর দেবতার ব্যঙ্গ ?
কোথায় চলেছে এই অভিযান, কোন দিকে এই তীর্থযাত্রা ?
কে ধরে রেখেছে পথের মানচিত্র, কে দিয়েছে পরিকল্পনা প্রতি পর্যায়ে ?
অথবা হয়তো আত্মচালিত বিশ্ব চলেছে আপনি আপন পথে,
হয়তো-বা কিছু নেই সেখানে, রয়েছে শুধু মন এক স্বপ্ন যে দেখে
জগৎ কল্পকথা এক সত্য হয়ে উঠেছে কোন ক্রমে,
কিংবদন্তী এক আপন চেতনায় মন বলেছে আপনাকে,
চিত্ররূপে প্রক্ষিপ্ত লীলায়িত কল্পনাকৃত জড়ের ভূমিপরে
দাঁড়িয়েছে সেখানে অবাস্তব এক বিপুল ব্যোমতলে।
মনই হল স্রষ্টা, দর্শক, অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ :
মন রয়েছে শুধু, যা চিন্তা করে তাই সে দেখে।

মনই যদি হয় তবে বিসর্জন দাও আনন্দের আশা
মনই যদি সব, বিসর্জন দাও সত্যের আশা।
মন কখনও স্পর্শ করে না সত্যের দেহ
আর মন কখনও দেখে না ভগবানের আপন অন্তরাত্মা
ধরে শুধু তার ছায়া, শোনে না তাঁর হাস্য
যখন সে সরে যায় তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শূন্যগর্ভ প্রতীয়মানের দিকে।
মন বস্তুর বয়ন এক আলোছায়ার বিন্যাসে,
সত্য এবং মিথ্যা সেখানে গ্রথিত করেছে তাদের নেশানো অংশ সব
অথবা মন হল প্রকৃতির সুবিধার উদ্ভাবন
সত্যের ও অসত্যের মধ্যে, আনন্দের ও বেদনার মধ্যে :
এই বর্ধমান যুগলকে কোন বিচারালয় বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।
প্রতি চিন্তাই স্বর্ণমুদ্রা এক, উজ্জ্বল ভেজাল রয়েছে তাতে,
ভ্রান্তি আর সত্য দুই বিপরীত পৃষ্ঠা তার
এই হল মস্তিষ্কের রাজকীয় টাকশাল
আর তার যত মুদ্রা সবই এই ধরনের।
পৃথিবীর পরে জীবন্ত সত্যকে রোপণ করবে মনেও ভেব না কখনও
অথবা জড়ের ভাগ্যকে করবে ভগবানের ভবন :
সত্য সেখানে আসে না, আসে শুধু সত্যের ভাবনা,
ভগবান নিজে নাই সেখানে, আছে শুধু তাঁর নাম।
আত্মাপুরুষ থাকে যদি কোথাও তবে তা অদেহী অজাত,
বিশেষ কেউ নয়, কারো অধিকারে নয়,
কিসের উপরে তুমি তবে গড়ে তুলবে তোমার সুখের জগৎ?
দূরে ফেলে দাও তোমার প্রাণ আর মন, তবে হয়ে উঠবে তুমি তোমার আত্মাপুরুষ,
সর্বদর্শী সর্বান্তি নিরালম্ব, নিঃসঙ্গ।
ভগবান যদি রয়েছেন কোথাও জগতের জন্য কোন চিন্তা নাই তাঁর :
সব তিনি চেয়ে দেখেন প্রশান্ত উদাসীন দৃষ্টি দিয়ে,
সকল হৃদয়ের জন্য তিনি শেষ পরিণাম দিয়েছেন দুঃখ আর বাসনা,
সমস্ত জীবন বেঁধে দিয়েছেন তাঁর নির্মম বিধান দিয়ে ;
সাড়া নাই তাঁর কোন অজ্ঞান প্রার্থনার কণ্ঠে।
চিরন্তন তিনি, যুগযুগান্তর শ্রবনিমগ্ন নীচে তাঁর,
ঊর্ধ্বে তিনি অচল অটল, তাঁর সৃষ্ট কোন কিছু স্পর্শে না তাঁরে
তিনি দেখেন ক্ষুদ্র কণা যেন সব তারকামণ্ডলী মাঝে
জীবের বেদনা, মানুষের নিয়তি :
অপরিবের জ্ঞান তাঁর তোমার চিন্তার পারে ;
তাঁর নিঃসঙ্গ আনন্দে প্রয়োজন নাই তোমার প্রেমের।
তাঁর সত্য মানুষী চিন্তার মধ্যে বাস করে না

সত্যকে চাও যদি শান্ত কর মনকে চিরতরে,
মূক অগোচর জ্যোতি নিহত করে যেন তাকে।
অমর আনন্দ জীবনধারণ করে না মানুষী বাতাসে :
জগৎ-জননী তাঁর প্রশান্ত আনন্দকে কিরকম করে
সৌগন্ধ্যে ভরে রাখবেন এই সঙ্কীর্ণ ভঙ্গুর পাত্রে
অথবা তাঁর মধুর অক্ষত পুলকের জন্য স্থান করে দেবেন
এই সব হৃদয়ে পার্থিব বেদনায় আকিষ্ট যারা,
এই শরীরে মৃত্যু যাদের ইচ্ছাক্রমে মৃত্যু ঘটায়?
স্বপ্নেও ভেব না ভগবানের পরিকল্পিত এই বিশ্বকে নবরূপ দেবে তুমি,
তাঁর চিরন্তন বিধানকে পরিবর্তিত করবে সে প্রয়াস কোরো না।
এমন স্বর্গলোক যদি থাকে সেখানে দুঃখের পথ নাই প্রবেশ করবার,
সেখানেই তবে খোঁজ সেই আনন্দ পৃথিবীর পরে পাবে না যা
অথবা সেই অক্ষয় পরার্ধে
আলোক যেখানে সহজাত, আনন্দ সম্রাট
আর চিন্ময় সত্তা হল সকল বস্তুর অমর প্রতিষ্ঠা,
সেখানে তোমার সমুচ্চ আসন গ্রহণ কর, হে শাশ্বতের সন্তান।
তুমি যদি চিন্ময় সত্তা আর প্রকৃতি তোমার বসন,
খুলে ফেল তবে নির্লোক তোমার, দেখাও তোমার নগ্ন আত্মা
অব্যয় অক্ষয় যে অমর সত্তা নিয়ে,
একক চিরতরে সেই মূক এককের মধ্যে।
ফিরে যাও ভগবানের কাছে, তাঁর জন্য বিসর্জন দাও সব জিনিস :
ভুলে যাও প্রেম, ভুলে যাও সত্যবান,
মুছে দাও আপনাকে অচল সেই শান্তির মধ্যে।
হে আত্মা, ডুবে যাও তাঁর স্তব্ধ রভসের মধ্যে।
মৃত্যু হানো আপনার পরে তবে তো পৌঁছবে গিয়ে ভগবানের শিখর পরে
আমি, মৃত্যু, অমরতার তোরণ আমি।"
সাবিত্রী উত্তরে কহে তার্কিক দেবতারে :
"আবার তুমি কি আহ্বান করবে জ্যোতিকে সত্যের নয়ন অন্ধ করে দিতে,
জ্ঞানকে করবে অজ্ঞানের জালে বদ্ধ করবার জন্য প্রলোভন এক
আর মহাবাক হবে শায়ক এক আমার জীবন্ত আত্মাকে বিদ্ধ করবার জন্য?
বরং হে রাজন্, দান কর তোমার বর সব শ্রান্ত চিত্তদের
হৃদয়দের যারা কালের ক্ষত বহনে অক্ষম,
দেহে ও মনের মধ্যে বদ্ধ যারা
তারা ছিঁড়ে ফেলুক ঐসব বন্ধন, প্রয়াণ করুক শুভ্র প্রশান্তির মধ্যে
আকুল কণ্ঠে আশ্রয় চেয়ে ভগবানের লীলা হতে দূরে,
তোমার বর সব নিশ্চয় মহান, কারণ তুমিও তো ভগবান।

কিন্তু আমি কি সকলে বিশ্রাম লাভ করি সীমাহীন শান্তির মধ্যে
আমার মধ্যে অধিবাসিনী যে জগৎজননীর রুদ্র শক্তি,
তাঁর দৃষ্টি ফিরেছে প্রহেলিকময় জগতের পাঠোদ্ধার তরে,
তাঁর ইচ্ছাশক্তি শাণিত প্রজ্ঞাসূর্যের দাহনে
আর তাঁর প্রেমিক-হৃদয়ের সমিদ্ধ নীরবতা হতে?
জগৎ হল এক আপাতবিরোধী আধ্যাত্মিক সত্য
অগোচরের প্রযোজন এক যাকে সৃষ্টি করেছে,
জীবের ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে তা দুর্বল প্রতিরূপ এক
সেই মহাবস্তুর চিরকাল যা অতিক্রম করে রয়েছে ভাবকে, বাক্যকে,
প্রতীক এক যা প্রতীকে ধরা দেয় না কখনও,
এ এক ভাষা ভ্রান্ত উচ্চারণে, ভ্রান্ত বানানে, সত্য তবু যা।
তার সার্থকতা সব এসেছে চিরন্তন শিখর হতে,
অবগাহন করেছে গিয়ে নিশ্চেতন অস্ফুট অতলে,
উঠেছে আবার সেখান হতে তাদের অপরূপ কর্মসাধনের জন্য।
জীবাত্মা হল অনাদ্যন্তের মূর্তি এক,
মনের প্রয়াস অচিন্ত্যকে চিন্তার মধ্যে আনবে,
জীবনের প্রয়াস অমর্ত্যকে মর্ত্য জন্মের মধ্যে ডেকে আনবে,
দেহের প্রয়াস অসীমকে দেহবদ্ধ করবে।
সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন নয় সত্য হতে ভগবান হতে।
বৃথা তুমি খুঁড়ে দিয়েছ এই অন্ধকার সেতুহীন গহ্বর,
বৃথা তুমি গড়ে তুলেছ এই অন্ধ দ্বারহীন প্রাচীর:
মানুষের আত্মা পার হয়ে যায় তোমার ভিতর দিয়ে স্বর্গে
ঊর্ধ্বের সূর্য পথ করে চলে মৃত্যু ও রাত্রির ভিতর দিয়ে
তার আলো দেখা যায় আমাদের সত্তার প্রান্তসীমায়।
আমার মন হল মশাল এক প্রজ্বলিত হয়েছে চিরন্তন সূর্য হতে,
আমার প্রাণ নিঃশ্বাস এক গ্রহণ করেছে অমর অতিথি এখানে,
আমার মর্ত্যদেহ চিরন্তনের ভবন।
এরই মধ্যে মশালটি হয়ে উঠেছে অনির্বাণ শিখা,
এরই মধ্যে প্রাণবায়ু হয়ে উঠেছে অমরের শক্তি,
গৃহ হয়ে উঠেছে গৃহপতির অংশ এবং একই তার সঙ্গে।
কেমন করে বলবে তুমি সত্য কখনও আলোকিত করবে না মানুষী মনকে,
আনন্দ কখনও মানুষী হৃদয়কে অধিকার করবে না
কিংবা ভগবান কখনও তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে অবতরণ করবেন না?
অর্থহীন মহাশূন্যে সৃষ্টি যদি উঠে থাকে,
অদেহী শক্তি হতে জড় যদি জন্মে থাকে,
প্রাণস্রোত যদি উঠে থাকে অচেতন তরুলতা মাঝে,

সবুজ পুলক যদি ফুটে ওঠে হরিৎ মরকত পত্রাবলী মাঝে
আর তার সৌন্দর্যের হাস্য যদি বন্তরিত হয় ফুলের মধ্যে,
ইন্দ্রিয়ানুভব জাগে যদি নাড়ীর, স্নায়ুর, কোষের মধ্যে,
চিন্তাধারা যদি অধিকার করে মস্তিষ্কের ধূসর উপাদান,
আর অন্তঃপুরুষ তার গোপনস্থান হতে দৃষ্টি হানে রক্তমাংস ভেদ করে,
তাহলে কেন অনামা জ্যোতি সহসা অবতরণ করবে না মানুষের মধ্যে,
আর অজ্ঞাত শক্তি সব জেগে উঠবে না প্রকৃতির সুপ্তি হতে?
এখনও জ্যোতির্ময় সত্যের ইঙ্গিত সব নক্ষত্রের মত
উদয় হয় অজ্ঞানের মানস-জ্যোৎস্নার বহিমাতলে
এখনও মৃত্যুহীন মহাপ্রেমিকের স্পর্শ অনুভব করি আমরা
আমাদের ভবনদুয়ার যদি সামান্য অবধি খোলা থাকে
ভগবানের নিঃসাড়ে প্রবেশপথে কি দেবে বাধা,
কেই-বা জানাবে নিষেধ সুপ্ত অন্তরাত্মাকে তিনি যদি দেন তাঁর প্রেম-চুম্বন?
এখনই এসে গিয়েছে ভগবান সন্নিকটে, মহাসত্য সমীপে আমাদের
তামস নাস্তিক দেহ জানে না তাকে,
তবে কি জ্ঞানী স্বীকার করবে না আলো, দ্রষ্টা তার অন্তরাত্মা?
আমিতো বদ্ধ নই চিন্তা আর ইন্দ্রিয় আর আকারের মধ্যে
আমার নিবাস অসীমের মহিমায়,
আমি প্রতিবেশী অনামার, অজ্ঞেয়ের,
অনির্বচনীয় এখন আমার গৃহ-সহচর।
শাশ্বতের জ্যোতির্ময় প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি
আবিষ্কার করেছি জগৎ হলেন তিনি;
আত্মাকে দিয়ে মহান আত্মার সত্তাকে দিয়ে মহান সত্তার সাক্ষাৎ করেছি,
আমি ভালবেসে ফেলেছি ভগবানের শরীরকে অবধি।
আমি তাঁকে অনুসরণ করেছি তাঁর পার্থিব রূপের মধ্যে।
নিঃসঙ্গ মুক্তি তৃপ্তি দেয় না,
হৃদয় আমার এক হয়ে গিয়েছে সকল হৃদয়ের সঙ্গে
আমি হলাম উন্মুখী জগতের আস্পৃহা,
আমার আত্মচেতনার মুক্তি আমি সকলের জন্য কামনা করি।"

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৪শ সূক্ত

১। আ হোতা মন্দ্রো বিদথান্যাস্থাৎ সত্যো যজা কবিতনঃ স বেধাঃ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহসস্পুত্রো অগ্নিঃ শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ ॥১॥

আ (+আস্থাৎ)—লাভ করেছে
হোতা—আহ্বায়ক, আহ্বাতা
মন্দ্রঃ—মোদিত, আনন্দময়
বিদথানি—জ্ঞানের বিষয় সব
(আ+) আস্থাৎ—লাভ করেছে
সত্যঃ—সত্যময়
যজা—যজ্ঞকৃৎ
কবিতনঃ—পরমদ্রষ্টা
সঃ—সে
বেধাঃ—দ্রষ্টা
বিদ্যুৎ-রথ—বিদ্যুৎ তাঁর রথ
সহসঃ—বলের
পুত্রঃ—পুত্র
অগ্নিঃ—অগ্নি
শোচিঃ+কেশঃ—প্রজ্বলন্ত কেশ তাঁর
পৃথিব্যাম্—পৃথিবীতে
পাজঃ—তেজোপুঞ্জ
অশ্রেৎ—অর্জন করেছেন

আনন্দময় আহ্বানকর্তা তিনি, জ্ঞানের বিষয় সব অধিকার করে রয়েছেন, সত্যময় তিনি, যজ্ঞকৃৎ, পরমদ্রষ্টা তিনি, দ্রষ্টা তিনি, বিদ্যুৎ তাঁর রথ, বলের পুত্র তিনি, জ্যোতির্ময় কেশভার তাঁর, অগ্নি এই পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত তেজ অর্জন করেছেন ॥১॥

২। অয়ামি তে নমউক্তিং জুষস্ব ঘৃতাবন্ত্ভ্যং চেততে সহস্বঃ।
বিশ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নি ষৎসি মধ্য আ বর্হিস্তয়ে যজত্র ॥২॥

অয়ামি—উপস্থিত আমি, এসেছি আমি
তে—তোমার কাছে

নমঃ+উক্তিম্—প্রণতিময় বাক্য আমার
ভরস্ব—গ্রহণ কর
ঋতবঃ—ঋতময়
তুভ্যম্—তোমার কাছে
চেততে—চেতনাদায়ী, চেতনাদাতা
সহস্বঃ—বলশালী
বিদ্বান্—জ্ঞানী তুমি
আ+বক্ষি—বহন করে আনো
বিদুষঃ—জ্ঞান আছে যাদের
নি+আ+ষৎসি—উপবেশন কর
মধ্যে—মধ্যস্থলে
আ+বর্হি—কুশাসনে
উতয়ে—আমাদের বৃদ্ধির জন্য
যজত্র—যজ্ঞরক্ষক, যজ্ঞাধিপতি

আমি তোমার কাছে এসেছি, গ্রহণ কর আমার প্রণতি-বাক্য, হে ঋতময়, হে বলীয়ান, তুমি হলে জ্ঞানদাতা। জ্ঞানী তুমি, জ্ঞানীজনের মধ্যে এসে পুণ্য কুশাসনে উপবেশন কর, আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য, হে যজ্ঞাধিপতি ॥২॥

৩। ভ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ।
যৎ সীমঞ্জন্তি পূর্ব্যং হবিভির্বন্ধুরেব তস্থতুর্দুরোণে ॥৩॥

ভ্রবতাম্—ধেয়ে আসে যেন তারা
তে (+অচ্ছ)—তোমার দিকে
উষসা—দিন ও রাত্রি
বাজয়ন্তী—প্রাচুর্যপূর্ণ, পূর্ণতাপূর্ণ
অগ্নে—হে অগ্নি
বাতস্য—বায়ুর
পথ্যাভিঃ—পথসকল ধরে
যৎ—যখন
সীম্—চারিদিক ঘিরে
অঞ্জন্তি—অভিসিঞ্চন করে
পূর্ব্যম্—সর্বাদি
হবিভিঃ—আহুতি দিয়ে
আ (+তস্থতুঃ)—স্থান নিয়েছে, প্রবেশ করে তারা
বন্ধুরা ইব—যুগবদ্ধ হয়ে যেন (জোয়ালের মত) দুটিতে সংযুক্ত হয়ে
(আ+) তস্থতুঃ—স্থান নিয়েছে, প্রবেশ করে তারা
দুরোণে—গৃহদ্বারে

হে অগ্নি, উষা ও রাত্রি তাদের পূর্বতা নিয়ে বেয়ে চলে যেন বায়ুর পথ ধরে তোমার অভিমুখে যখন তারা আহুতি দিয়ে এই আদিদেবকে অভিষিক্ত করে রথযুগের মত তারা আমাদের গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত ॥৩॥

৪। মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণঃ সহস্বোঽগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চন্।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ন্‌ৎ সূর্যো নৃন্ ॥৪॥

মিত্র+চ—মিত্র ও
তুভ্যম্—তোমাকে
বরুণঃ—বরুণ
সহস্বঃ—হে বলীয়ান, হে বলবান
অগ্নে—অগ্নি
বিশ্বে—যাবতীয়
মরুতঃ—মরুৎশক্তিরা
সুম্নম্—আনন্দময় মন্ত্র
অর্চন—অর্চনা করে
যৎ—যখন
শোচিষা—অনন্ত দীপ্তি দিয়ে
সহসঃ+পুত্র—হে বলের পুত্র
তিষ্ঠাঃ—তুমি দাঁড়িয়ে আছ
অভি+ক্ষিতীঃ—সকল মানুষের উপরে
প্রথয়ন্—প্রসারিত করে
সূর্যঃ—সূর্য (যেন)
নৃন্—তার কিরণমালা

হে অগ্নি, মূর্ত বল তুমি, তোমাকে মিত্র আর বরুণ আর মরুৎগণেরা আনন্দময় স্তোত্র দিয়ে অর্চনা করে, যখন, হে বলের পুত্র, তুমি তোমার অনন্ত দীপ্তি নিয়ে পৃথিবীর জনসংঘের উর্ধ্বে সমাসীন সূর্য যেন ছড়িয়ে দিয়েছে তার শক্তিমালা ॥৪॥

৫। বয়ং তে অদ্য রবিনা হি কাম্যমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবানগ্নেধত্ত মন্মনা বিপ্রো অগ্নে ॥৫॥

বয়ম্—আমরা
তে—তোমার, তোমাকে
অদ্য—আজ
রবিম্—দান করি
হি—নিশ্চয়ার্থে
কাম্যম্—কাম্য
উত্তানহস্তা—ঊর্ধ্বহস্তে

নমসা—প্রণতি দিয়ে
উপ-সদ্য—উপস্থিত হয়ে, সন্নিকটে গিয়ে
যজিষ্ঠেন—পরম যজ্ঞসাধক
মনসা—মনস্ শক্তি দিয়ে
যক্ষি—যজ্ঞসাধন কর
দেবান্—দেবতাদের
অয়েধতা—পদভ্রষ্ট হয় না, অব্যাহত
মন্মনা—চিন্তাব্যক্তি দিয়ে
বিপ্রঃ—জ্ঞানদীপ্ত
অগ্নে—হে অগ্নি

আজ আমরা তোমার কাম্য তোমাকে প্রদান করি, ঊর্ধ্বহস্তে প্রণতি নিয়ে উপস্থিত আমরা তোমার কাছে : তোমার পরম যজ্ঞসাধক মনঃশক্তি দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর, হে অগ্নি, জ্ঞানদীপ্ত তুমি তোমার অভ্রান্ত চিন্তাধারা দিয়ে ॥৫॥

৬। ত্বদ্ধি পুত্র সহসো বি পূর্বীর্দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং নোঽদ্রোঘেন বচসা সত্যমগ্নে ॥৬॥

ত্বৎ—তোমার থেকে
হি—নিশ্চয়ার্থে
পুত্র—হে পুত্র
সহসঃ—মহাবলের
বি (+যন্তি)—প্রসারিত হয়
পূর্বীঃ—বহুল
দেবস্য—দেবশক্তির
(বি+)যন্তি—প্রসারিত হয়
বাজাঃ—পরিপূর্ণতা, প্রাচুর্য
ত্বম্—তুমি
দেহি—দাও
সহস্রিণং—সহস্রধা
রয়িম্—সম্পদ
নঃ—আমাদের
অদ্রোঘেন—অবিদ্রোহী, বিদ্রোহভাবনামুক্ত
বচসা—বাক্যের দ্বারা
সত্যম্—সত্যকে
অগ্নে—হে অগ্নি

তোমা হতে, হে বীরপুত্র (মহাবলপুত্র, বলের পুত্র), প্রসারিত হয় দেবশক্তির বহুল

অভয়শক্তি আর প্রসারিত হয় প্রাচুর্য যত . দাও আমাদের সহস্রধা সম্পদ, সত্যকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করে না যে রাজা তার সহায়ে এনে দাও সত্যকে, হে অগ্নি ॥৬॥

৭। তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।
ত্বং বিশ্বস্য সুরথস্য বোধি সর্বং তদগ্নে অমৃত স্বদেহ ॥৭॥

তুভ্যম্—তোমার জন্য
দক্ষ—হে বিচারবুদ্ধি
কবি-ক্রতো—হে দ্রষ্টা-এষণা বা ইচ্ছাশক্তি
যানি—যা কিছু, যত কিছু, যে সব
ইমা—এই
দেব—হে দেবতা
মর্তাস:—মর্ত্যজীবেরা
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়
অকর্ম—কর্ম আমরা করেছি
ত্বম্—তুমি
বিশ্বস্য—যাবতীয়
সুরথস্য—সুচলিত গতিধারা নিয়ে
বোধি—সচেতন, সজ্ঞান হও, জ্ঞান নিয়ে জাগ্রত হও
সর্বম্—সব
তৎ—সেই
অগ্নে—হে অগ্নি
অমৃত—হে অমরদেবতা, হে অমৃতময়
স্বদ —আস্বাদন কর
ইহ—এখানে (এসে)

তুমি বিবেকবুদ্ধি, হে চক্ষুষ্মান ইচ্ছাশক্তি, তোমার জন্যেই এই যজ্ঞযাত্রায় আমরা মর্তজীবেরা যা-কিছু করেছি : হে দেবতা, সেই সব সুচালিত গতিধারা নিয়ে সচেতন হও, সে সবই হে অমরদেব অগ্নি, এখানে এসে আস্বাদান কর ॥৭॥

মায়ের আলাপ

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

(Les Bases du Yoga pp. 84-88 ed. Ashram)

প্রশ্ন : মা, এখানে লেখা রয়েছে, "সূর্য এবং জ্যোতি সাহায্য করতে পারে এবং করবে...।"

শ্রীমা : স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কেউ একজন তার কোন অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিল, যাতে সে কেন সূর্য এবং আলোর সংযোগ লাভ করেছিল এবং তার সাধনায় যাতে সাহায্য হয়, সেইজন্যে সে সবের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিল। ও হল, সেই অভিজ্ঞতার বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের উত্তর।

প্রশ্ন : মা, কামনা কি সংক্রামক ?

শ্রীমা : অবশ্যই, বাছা, ভীষণভাবে সংক্রামক। দূষিত ব্যাধির চেয়েও বেশী সংক্রামক। তোমার পাশে যদি কেউ থাকে আর তার অন্তরে যদি একটা বাসনা থাকে, তৎক্ষণাৎ সেটা তোমার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর ঠিক এই ভাবেই বেশীর ভাগ কামনা মানুষের মধ্যে ঢোকে। একজনের থেকে আর একজনের মধ্যে এটা চারিয়ে যায়— কামনা সাংঘাতিক ভাবে ছোঁয়াচে। এতই প্রবল তা, যে মানুষ টেরও পায় না, এটা সংক্রামক। হঠাৎ তার বোধহয় যেন তার ভিতরে একটা কিছু বাসনা জেগে উঠছে! এ আর কিছুই নয়, কেউ একজন দয়া করে ওটি তার ভিতরে রেখে দিয়েছেন। অবশ্যই একথা শুনে বলতে পার, "তাহলে কেন, যাদের মধ্যে বাসনা কামনা প্রবল তাদের থেকে অন্যদের সরিয়ে রাখা হয় না ?" কিন্তু তাহলে ত সবাইকেই সকলের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, (মা হাসতে লাগলেন)

প্রশ্ন : বাসনা আসে কোথা থেকে ?

শ্রীমা : বুদ্ধদেব বলতেন, বাসনার উৎপত্তি অজ্ঞান থেকে। প্রায় তাই। মানুষের মধ্যে একটা কিছু আছে যার ধারণা তার আর একটা কিছু চাই যেটা পেলে সে খুশী হবে। আর এটা যে অজ্ঞান তার প্রমাণ, মানুষ যখন তার সেই অংশটিকে খুশি করল, তখন সে আর ওটার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। একশর মধ্যে অন্তত ষাড়ে নিরেনব্বুই বারই এমনটা হয়। আমার বিশ্বাস, এ হল, পরিণতি লাভের জন্যে একটা অন্ধ প্রয়োজনবোধ, এ রয়েছে একেবারে আদি উৎপত্তিতে। ঠিক যেমন অতি নিম্নতম স্তরের জীবনে প্রেমের প্রকাশরূপ হল গিলে ফেলার, আত্মসাৎ করার, অন্যকোন একটা জিনিসের সঙ্গে সংযুক্ত হবার প্রয়োজন বোধ। নিম্নতম আকারে জীবনে প্রেমের আদিমতম রূপ হল এই। কেবল নিজের জন্যে টেনে নেওয়া আর আত্মসাৎ করা। আর এই নেবার যে প্রয়োজন সেটাই হল বাসনা। আমরা যদি নিচে বহুদূরে, অচেতনার একেবারে নিম্নতম অতলে চলে যেতে পারতাম, তাহলে বলতাম, বাসনার উৎপত্তি প্রেম থেকে। বাসনা হল প্রেমের প্রাথমিক অন্ধকারময় এবং চরম-

অচেতনার রূপ, একটা কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াই তার প্রয়োজন, একটা আকর্ষণ, অধিকার করার প্রবৃত্তি।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক....ধর তুমি একটা কিছু দেখলে, তোমার বোধ হল সেটা অতিশয় সুন্দর, খুবই সঙ্গতিপূর্ণ খুবই পরিতৃপ্তিকর। এখন তোমার যদি সত্যিকারের চেতনা থাকে, তাহলে তুমি এই দেখার দ্বারা আনন্দ উপভোগ করলে, এমন একটা কিছু দেখলে, যা অপূর্ব সুন্দর অদ্ভুত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সচেতন ভাবে তুমি তার সঙ্গলাভের সুযোগ পেলে, ব্যস ওই পর্যন্ত। ওইখানেই শেষ। দেখে তোমার যে আনন্দ হল, তার কারণ, এমন একটা অপূর্ব বস্তু যে আছে তা তুমি জানার সুযোগ পেলে। এখন যারা শিল্পী, সত্যিকারের সৌন্দর্যবোধ যাদের আছে, তাদের ক্ষেত্রে এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে। যেমন ধর, একজন শিল্পী, যদি একটি সুন্দরীকে দেখার সুযোগ পায়, তাহলে তার মধ্যে সে তার সৌন্দর্য, তার লাবণ্য, তার ছন্দময় গতিভঙ্গি প্রভৃতি সমস্ত কিছু দেখে আনন্দ উপভোগ করবে, তারিফ করবে, আর সেটাই তার সব। সেখানেই শেষ। সে পরিপূর্ণ ভাবে খুশি হল, আনন্দ পেল, কারণ সে যথার্থ সুন্দর একটা কিছু দেখতে পেয়েছে। এখন ধর, একটা অতি সাধারণ চেতনার মানুষ, একেবারেই সাধারণ,—সাধরণ চেতনার সকল মানুষই যেমন হয়ে থাকে, তেমনি সম্পূর্ণ স্থূল প্রকৃতির—যেই সে সুন্দর কিছু একটা দেখল, সেটা কোন জিনিসই হোক বা কোন জীবন্ত মানুষই হোক, তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে উঠবে। বলবে, "আমার ওটা চাই।" এটা বড়ই শোচনীয় ব্যাপার, নয় কি? উপরন্তু সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দটাই তার কাছ থেকে অন্তর্ধান করে, কারণ সে তখন বাসনার অস্বস্তিকর তাড়নাতেই ভরপুর। আনন্দটি সে হারায়, অথচ তার বদলে কিছুই পায় না। কারণ কোন কিছুকে আত্মসাৎ করবার বাসনার মধ্যে পরিতৃপ্ত হবার কিছু নেই। ও কেবল তোমার মধ্যে অতি অপ্রীতিকর একটা অবস্থার সৃষ্টি করে।

বুদ্ধদেব বলেছেন, বাসনা চরিতার্থ করার থেকে বাসনাকে জয় করায় ঢের বেশী আনন্দ আছে। এই অভিজ্ঞতাটি লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। আর সত্যিই এটি হল অতিমাত্রায় উপভোগ্য অভিজ্ঞতা, সত্যিই চমৎকার।

প্যারিসে একবার একটি "অপেরার" প্রথম উদ্বোধন রজনী উপলক্ষ্যে এক ভদ্র-মহিলা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেটি ছিল "অপেরা—কবিক (Massenet) মাসেনে"র রচনা। সম্ভবত তাই, এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বিষয় বস্তু ছিল সুন্দর, রচনাও মনোরম, সঙ্গীত পরিবেশনও মোটামুটি ভালই। এই প্রথম দিন বলে সরকারী ললিতকলা বিভাগের মন্ত্রীর বিশেষ আসনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটিকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সরকারী রঙ্গালয়ের প্রত্যেক প্রথম উদ্বোধন রজনীর আয়োজনে উক্ত মন্ত্রীর বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ছিল। ঘটনাক্রমে ললিতকলা বিভাগের এই মন্ত্রীটি ছিলেন অতিশয় সরল প্রকৃতির গ্রাম্য মানুষ; বয়সে বৃদ্ধ। প্যারিসে তাঁর বসবাস খুব বেশী দিনের নয়, আর তাছাড়া এই মন্ত্রী-বিভাগে তিনি সবে এসেছেন। নতুন কিছু দেখলে তিনি সত্যিই শিশুর মতন আনন্দ উপভোগ করতেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর আচার আচরণ ছিল অতিশয় মার্জিত, এবং সেদিন তিনি একজন ভদ্রমহিলাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন বলে, তাঁকে সামনে বসতে দিয়ে নিজে তাঁর পিছনে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু তিনি বড়ই

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কারণ সবটা তিনি ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি খুব সাবধানে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে কিছুটা দেখতে চেষ্টা করছিলেন। মহিলাটি সামনে বসেছিলেন, তাই সেটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। "অপেরাটি" তাঁরও খুব ভাল লাগছিল, তিনি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এমন নয় যে তাঁর ভাল লাগছিল না, তাঁর খুবই ভাল লাগছিল এবং অভিনয়টি তিনি খুবই উপভোগ করছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, মহিলা বেচারী ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না বলে কতখানি কষ্ট পাচ্ছেন। তখন ইনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে, নিজের চেয়ারটি হঠাৎ একটু পিছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলেন, যেন অন্য কিছু একটা ভাবছেন এই ভাবে। বেশ খানিকটা সরে গেলেন, আর তখন ভদ্রলোকটি এগিয়ে বসলেন, সব কিছু দিব্যি ভাল করে দেখতে লাগলেন। মহিলাটি যখন পিছিয়ে বসে অভিনয় দেখার বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর ভিতরটা আনন্দে ভরে উঠল। তিনি সব কিছুর প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ এবং পরম শান্তি উপভোগ করতে লাগলেন। তিনি যে স্বার্থপরের মতন নিজে উপভোগ করার বদলে আর একজনের জন্যে কিছু করতে পেরেছেন, তাতে অন্তরে এতখানি তৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন যে, সেদিন পুরো অপেরাটি শুনে এবং দেখে যে আনন্দ পেতেন তার চেয়ে অনন্তগুণে বেশী আনন্দে তাঁর অন্তর ভরে গেল। এটি যথার্থই সত্যঘটনা, কোন বইয়ে পড়া গল্পকথা নয়। আর ঠিক সেই সব দিনেই ভদ্রমহিলা বৌদ্ধ অনুশাসন অভ্যাস করছিলেন, এবং বুদ্ধদেবের বাণী অনুসরণ করেই তিনি এইটি পরীক্ষা করে দেখলেন।

আর সত্যিই অভিজ্ঞতাটি ছিল এতই বাস্তব, এতই প্রত্যক্ষ, যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর চোখের সামনে থেকে থিয়েটারের সেই অভিনয়, সেই সঙ্গীত, সেই সব অভিনেতা, আর দৃশ্যপট এবং ছবি, সব কিছুই অন্তর্ধান করল, সেগুলি সম্পূর্ণ গৌণ, সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে গেল। নিজের মধ্যে একটা কিছুকে জয় করতে পারার আনন্দ এবং নিঃস্বার্থভাবে কিছু একটা করতে পারার যে পরিতৃপ্তি সেটাই তাঁর সমগ্র সত্তাকে এক অতুলনীয় প্রশান্তিতে ভরে রইল। সে এক পরম আনন্দময় অভিজ্ঞতা—এটা নিছক একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র নয়, যারাই চেষ্টা করে দেখতে চায়, তাদেরই এমনটা হতে পারে।

যে মুহূর্তে কেউ স্বেচ্ছায় তার ভিতরকার কোন একটা কামনাকে বর্জন করে, তৎক্ষণাৎ তার চৈত্যপুরুষের সঙ্গে এমন একরকমের অন্তরের সংযোগ হয়, যার ফলে সে কামনাকে চরিতার্থ করলে যে আনন্দ পেত তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দলাভ করে। আর তাছাড়া, সাধারণত প্রায় ক্ষেত্রেই কেউ যখন তার একটা বাসনাকে চরিতার্থ করল, তখন তার ভিতরে কোথাও একটা তিক্ততার ভাব থেকে যায়।

এমন কোন বাসনা নেই, যেটার পরিতৃপ্তির পরে তিক্ততার ভাব না আসে, যেমন ভীষণ মিষ্টি একটা কিছু খেলে মুখটা তেতো তেতো হয়ে যায়। ব্যাপারটা ওই রকমই। তোমাকে অকপটে চেষ্টা করতে হবে। তাই বলে বাসনাকে এক কোণে লুকিয়ে রেখে ভাণ করলে চলবে না যে তুমি বাসনা মুক্ত হয়েছ, কারণ স্বভাবতই তাতে ঢের বেশী কষ্ট পাবে। তোমাকে সম্পূর্ণ অকপট হয়ে চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন চৈত্যপুরুষের প্রয়োজন কি ভাবে সিদ্ধ হয়?

(শ্রীমা নীরব)

শ্রীমা আমি শুনেছি ঠিকই, কেবল তোমার প্রশ্নের মানেটা ঠিক ধরতে পারছি না।

প্রশ্ন : কেউ যখন মন দিয়ে উপলব্ধি করে?

শ্রীমা ও! না, না, মোটেই তা নয়। "চৈত্যপুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়," অর্থাৎ তুমি কি জানতে চাইছ, "কি ভাবে সিদ্ধ হয়? কি ভাবে বাহ্যজীবনে তা আত্মপ্রকাশ করে?" "সিদ্ধ হয়" বলতে, কি বলছ? সেটাই পরিষ্কার নয়, তোমার চিন্তাতেই ওটা পরিষ্কার হয়নি। প্রথমত "চৈত্যপুরুষের প্রয়োজন" বলতে কি বুঝছ? চৈত্যপুরুষকে জানবার প্রয়োজন, না-কি চৈত্যপুরুষের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন?

প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস্য চৈত্যপুরুষের আত্ম-প্রকাশের প্রয়োজন।

শ্রীমা চৈত্যপুরুষ নিজেকে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, নিজেকে প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন কি ভাবে?

শ্রীমা অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য, তাকে মনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় কি না? ভগবান রক্ষা করুন, না। তা মোটেই নয়, কারণ সেটা একটা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠবে। চৈত্যপুরুষের প্রয়োজন হল দিব্যকরুণার অভিব্যক্তি, এবং তা দিব্যকরুণার দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়।

এই বিশ্বে চৈত্য-জীবন হল দিব্য-করুণার একটি প্রত্যক্ষ সত্তা। চৈত্যপুরুষের পরিণতি হল দিব্যকরুণার ব্যাপার, আর বাহ্যসত্তার উপর চৈত্যপুরুষের যে অন্তিম পূর্ণপ্রভাব তাও হবে দিব্য-করুণার কাজের ফল। আর মন যদি কোনভাবে সাহায্য করতে চায়, তাহলে তার একমাত্র কাজ হবে খুব শান্ত থাকা, যতখানি নীরব হওয়া তার পক্ষে সম্ভব তা হওয়া, কারণ সে যদি মধ্যস্থতা করে, তাহলে সে সব কিছু নষ্ট করে দেবে, এ একেবারে জানা কথা।

প্রশ্ন : তাহলে মনের থাকার কোন দরকারই নেই?

শ্রীমা রক্ষা কর। আমি বলিনি যে মনকে দরকার নেই। কিন্তু মনের কাজ অন্য। মন হল রূপ দেওয়ার আকার দেওয়ার এবং সংগঠন করার যন্ত্র। আর সে যদি চৈত্যপুরুষের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয় তার কাজ করবার জন্যে, সেটা ত খুবই ভাল হবে। কিন্তু মন নিজে চৈত্যপুরুষকে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করবে না, একের কাজ অন্যে করবে না। চৈত্যপুরুষ পরে যখন মানুষের বাহ্যচেতনাকে সম্পূর্ণ অধিকার করবে, মন তখন চৈত্যপুরুষের আত্মপ্রকাশের যন্ত্র হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু তার আগে প্রায়ই নয়। সাধারণত মন হল একটা পর্দা এবং একটা বাধা। সে কখনই দিব্য অভিব্যক্তির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না। মন যদি তার নিজের সঠিক জায়গায় থেকে নিজের নির্ধারিত কাজেকর্মে আত্ম-নিয়োগ করে, তবেই সে সাহায্য করতে পারে। আর সে যদি চৈত্যপুরুষের সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে তারই প্রেরণায় চলে, তাহলে সে মানুষের জীবনকে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে

পারে, কারণ গড়ে তোলা, সুব্যবস্থিত করা, এটাই হল মনের সত্যিকারের কাজ, তার অস্তিত্বের মূল হেতু। কিন্তু তার আগে চৈত্যপুরুষকে সমগ্র রাজ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করতে হবে, তাকেই হতে হবে বাড়ির গোদকর্তা। তেমনটা যখন হবে, তারপরে সব কিছুরই সুব্যবস্থা করা যেতে পারবে।

বাহ্যসত্তার পক্ষে মাত্র একটি পথই খোলা আছে। প্রথমে বাহ্য-সত্তার কথাই ধরা যাক,—বেচারী এই ক্ষুদ্র দেহময় সত্তাটি, এই বাহ্যসত্তাটি, এ কিছুই জানে না, নিজে থেকে এ কিছুই করতে পারে না। তার পক্ষে চৈত্যপুরুষকে প্রকাশ হতে দেবার মাত্র একটিই উপায় আছে, তাহল শিশুর প্রাণবন্ত অকপটতার দ্বারা (মা এখানে খুবই কোমলভাবে বলতে লাগলেন) দেহময় সত্তাকে প্রাণখুলে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, তাকে প্রার্থনা করতে হবে, চাইতে হবে তার সকল শক্তি দিয়ে, ইচ্ছা করতে হবে, কিন্তু কোন রকম যুক্তি তর্ক থাকবে না, বোঝবার কোন রকম চেষ্টা থাকবে না। মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না, বিচার বিবেচনা, যুক্তি তর্ক, বোঝবার জন্য এই যে চেষ্টা, এ যে উপলব্ধির পথে কি প্রকাণ্ড বাধাই না সৃষ্টি করে। কোন এক শুভমুহূর্তে যখন তুমি প্রায় এমন একটি অবস্থা লাভ করতে চলেছ, যখন একটা নতুন কিছু ঘটবার মতন হয়েছে, যখন সত্তার চেতনাতে কোন স্পন্দনের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে...তোমার অন্তর যখন অভীপ্সায় উদ্‌গ্রীব, এবং সে অভীপ্সাকে তুমি অবিকম্পিত ভাবে ধরে রয়েছ একটা সাড়া পাবার অপেক্ষায় আছ, তখন যদি এই হতভাগা মনটা নড়াচড়া করতে আরম্ভ করে, যদি কৌতূহল প্রকাশ করে, "তাইত, কি হচ্ছে? কি হবে? কখন হবে? কি ভাবে হবে? ব্যাপারটা এ রকম কেন? কি ধারায় সব কিছু প্রকাশ পাবে?" ব্যস, তাহলেই সব শেষ, তখন তুমি উঠে গিয়ে তোমার ঘর ঝাঁট দিতে পার। ও ছাড়া অন্য কিছু তোমার দ্বারা হবার নয়।

প্রশ্ন : মা, চৈত্যপুরুষ কি মন, প্রাণ এবং দেহকে ছাড়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে?

শ্রীমা চৈত্যপুরুষ অনুক্ষণ ওদের বাদ দিয়েই আত্মপ্রকাশ করছে। কেবল সাধারণ মানবসত্তা যাতে তাকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারে, সেই জন্যেই সে এদের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কারণ সাধারণ মানুষের সরাসরি চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সংযোগ নেই। তা যদি থাকত, তাহলে সাধারণ মানুষ চৈত্যচেতনাতেই অভিব্যক্ত হত,...আর তাহলে ত সব কিছুই অতি অপূর্ব হয়ে উঠত। কিন্তু চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সংযুক্ত নয় বলে, সে জানেই না চৈত্যপুরুষ কি বস্তু, সে হতভম্ব হয়ে মনে মনে ভাবে, না জানি ও আবার কি ধরনের জীব হবে। তাই সাধারণ মানুষের এই রকম চেতনার পক্ষে বোধগম্য হবার জন্যে চৈত্যপুরুষকে সাধারণ উপায় অবলম্বন করতে হয়, অর্থাৎ মন, প্রাণ এবং দেহের মধ্যে দিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়।

ওদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে চলা যায়, কিন্তু শেষেরটিকে কোনমতেই না। কারণ তাহলে মানুষ একেবারে কোন কিছুর সম্বন্ধেই সচেতন হবে না। সাধারণ মানব সত্তা কেবল তার দেহতেই সচেতন। হয়ত কদাচিৎ কোন বিরল মুহূর্তে সে তার মনের সম্বন্ধে সচেতন হয়, তার চেয়ে খানিকটা বেশী তার প্রাণের সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু এ সব তার চেতনাতে তালগোল পাকিয়ে আছে, আর তা এতখানিই, যে সে একেবারেই

বলতে পারবে না, "এই প্রেরণাটা আসছে মনে থেকে, এইটা আসছে প্রাণ থেকে আর এইটা আসছে দেহ থেকে।" নিজের ভিতরে বিভিন্ন প্রেরণার উৎপত্তিস্থলকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝতে পারার জন্যে তার চেতনার দস্তুর মতো বিকাশ হওয়া চাই। আর সে সব এতই মিশে থাকে, যে চেষ্টা করলেও গোড়ার দিকে সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ করে আলাদা আলাদা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়।

এ যেন গোটা চার পাঁচ রঙ্ নিয়ে একই জলের পাত্রে ফেলে, সেগুলোকে একসঙ্গে মেশানোর মতন। জিনিসটা তখন এক রকমের ঘোলাটে অপরিষ্কার গোলায় পরিণত হয়, কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তখন কোন্‌টা লাল, কোন্‌টা নীল, কোন্‌টা সবুজ আর কোন্‌টা হল্‌দে তা তুমি বুঝতে পারবে না। সেটা তখন একটা ঘোলাটে কিছু, নানা রঙের সংমিশ্রণ। তখন প্রথমে, একে একে সেগুলোকে আলাদা করতে হবে, লাল, নীল, হল্‌দে সবুজ, এইভাবে প্রত্যেকটিকে তার জায়গায় রাখতে হবে। ব্যাপারটি বড় সহজ নয়।

এমন কেউ কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, যাদের ধারণা তারা অসাধারণ বুদ্ধিমান, অনেক কিছু জানে। আমি যখন তাদের কাছে সত্তার বিভিন্ন অংশের বিষয় বললাম, তারা অবাক হয়ে (মা ভঙ্গি করে দেখালেন) আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি সম্বন্ধে বলছেন?" তারা একেবারেই কিছু বুঝল না। যাদের কথা বলছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে তাদের খ্যাতি আছে, কিন্তু একেবারেই বোঝে না। তারা বোঝে কেবল চেতনা, শুধুই তাই,—এ হল চেতনা—"এটা আবার চেতনা"—তারপর আছে প্রতিবেশীর চেতনা। তারপর আবার এমন সব জিনিস আছে, যেগুলোর চেতনা বলে কিছু নেই। আমি যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, পশুদের চেতনা আছে কি? তখন তারা মাথা চুল্‌কতে লাগল। বল্‌ল, "হয়ত আমরাই আমাদের চেতনা পশুর মধ্যে সঞ্চারিত করি, যখন আমরা তাদের লক্ষ্য করি",—এই ভাবের সব কথা...

প্রশ্ন : মা, চৈত্যপুরুষ যখন সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে, তখন কি আর তার মনকে দরকার হবে?

শ্রীমা চৈত্যপুরুষ পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতেই পারবে না, যদি না সত্তার সকল অংশ সহযোগিতা করে। কিন্তু আমার ত মনে হয় না, মনের সৃষ্টি হয়ে ছিল তাকে অবলুপ্ত করা হবে, এই জন্যে। সমগ্র মানব আধারের একটা অংশই হল মন।

ভেবে দেখ, তোমার মন যদি না থাকত, তাহলে তোমার দেহটির কি অবস্থা হত? সে ত দিশেহারা হয়ে পড়ত। হয়ত তখন, সে দেহের চেয়ে গাছের মতন হত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি যা কিছুই কর, তার মধ্যে এমন কোন্‌টি আছে যার মধ্যে মনের কাজ নেই?

প্রশ্ন : কিন্তু চৈত্যপুরুষ যদি তাকে পরিচালিত করে?

শ্রীমা : চৈত্যপুরুষ যদি মনকে পরিচালিত করে, তাহলে মন চৈত্যপুরুষের ভাবে কাজ করবে। সে ক্ষেত্রে তা হবে অতি অসাধারণ মন, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে তখন ঠিক ভাবে ঠিক জিনিসটি করবে।

আর প্রাণের বেলাতেও তাই। সম্পূর্ণ একই রকমের ব্যাপার। মানুষের মধ্যে প্রাণ এখন যে অবস্থায় রয়েছে তাতে বলা হয়, যত কিছু বাধাবিঘ্ন আর কষ্টের জন্যে সে-ই দায়ী। প্রাণই হল সকল কামনা বাসনা, আবেগ উত্তেজনা, বিদ্রোহ প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। কিন্তু প্রাণ যদি চৈত্যপুরুষের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তাহলে ত সে এক অতি অপূর্ব যন্ত্র হয়ে উঠবে। উৎসাহ, বল, উপলব্ধির শক্তি, প্রেরণা, সৎসাহস প্রভৃতির সে হবে প্রতিভূ।

তারপর বাকি থাকে বেচারী দেহটি...এতকাল ধরে এ বেচারীকে যতকিছু দুঃখ কষ্টের জন্যে দায়ী করে আসা হয়েছে। আগেকার কালে চিরদিন বলা হত, এই রকম জড়, অন্ধকারময় বস্তু, যার মধ্যে গ্রহণসামর্থ্য প্রায় নেই বললেই হয়, তাকে দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দেহটিও যদি চৈত্যপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে এ ঠিকঠিক বস্তু ঠিকঠিকভাবে করতে পারবে, আর এ-ও তখন এর মত কাজেকর্মে স্থায়িত্ব লাভ করবে, শান্ত হবে, এবং এতই নিখুঁত হবে, যে-গুণগুলো সত্তার অন্যান্য অংশে নেই। কারণ দেহছাড়া নিখুঁতভাবে যথাসময়ে কাজকর্ম সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। দেহটি যখন সামান্য একটু ক্লান্ত হয়, একটু অসুস্থ বোধ করে, তখন একবার লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, মনের এবং প্রাণের দিক থেকে দৃঢ় ইচ্ছা এবং গভীর একাগ্রতা থাকা সত্ত্বেও কত কাজ তখন তুমি আর করে উঠতে পার না। কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে যার নিখুঁত জ্ঞান আছে সে-ও, দেহটি যদি একটু বিগড়েছে ত আর কিছুই করতে পারবে না। এমন কি, আমি বলব, কিছু লেখালেখির কাজ, যেটা পুরোপুরি দেহের কাজ নয়, তা পর্যন্ত মানুষ বন্ধ রাখবে।

তোমার যদি একটু মাথা টিপটিপ করল বা সর্দির মতো কিছু হল, তখন দেহকে দিয়ে ভাল করে কাজ করানো বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়। কেমন যেন একটা অবসন্নতা, একটা অস্পষ্ট আবছা ভাব পেয়ে বসে। সঠিক ভাবে কোন কিছুর ধারণা করতে পারা যায় না। আরও সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। ধারণাগুলোকে প্রকাশ করতে পারার আগেই সব গুলিয়ে যায়, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, পরস্পর প্রতিবাদ করে, কোথায় সব এই ভাবে (ভঙ্গি করে দেখালেন) একত্রিত হবার চেষ্টা করবে, তা-না-করে তারা এই রকমটা করে (অঙ্গ ভঙ্গি করে দেখালেন)। তাতে বিশৃঙ্খলা বাড়ে। তখন যদি এটাকে ধরতে চেষ্টা কর ত সেটা পালায়, ওটার দিকে এগিয়ে যাও ত সেটা হপ্ করে দৌড় মারে। আর এসবের কারণ কি, না, একটু জ্বর হয়েছে, তাতেই সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে, অথবা হয়ত একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। তোমরা জান, মাথায় ঠাণ্ডা লাগা কাকে বলে? সেটার দরুণই দেহের ভিতরকার কাজকর্ম-গুলো একটু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। যদি এসবের উর্ধ্বে উঠে যাও ত দেখবে, তুমি হয়ে উঠেছ একেবারে স্বচ্ছ, পরিপূর্ণভাবে সচেতন এবং একেবারে পরিষ্কার। সে অবস্থায় যদি তোমার সাংঘাতিক অসুখ করে থাকে, তাতেও কিছুই যায় আসে না। উর্ধ্বে, ওখানে তুমি সব কিছুই পুরোপুরি জানতে পার, সব কিছুই পুরোপুরি দেখতে পাও, সব কিছুই পুরোপুরি বুঝতে পার, কোনই পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু সেগুলোকে যদি লিপিবদ্ধ করতে চাও, যদি কাগজ-পেনসিল নিয়ে লিখতে এবং রূপ দিতে চেষ্টা কর, ত দেখবে বেশ একটি ছোট্ট অসুবিধায় পড়বে। কারণ যে কথা এই মাত্র বললাম, মানুষটার স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় যেভাবে জিনিসগুলো

সব একত্রে সংযুক্ত হয়ে ফুটে উঠতে থাকে, সেভাবে না হয়ে, কতকগুলো এই ভাবে চলে, বা আর একভাবে চলে (অঙ্গভঙ্গি করে দেখালেন), তাতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ঘটে...আশ্চর্য-ভাবে সেগুলো অতিআধুনিক ছবি আঁকার মতো দেখায়। ব্যাপারটা ওই রকম।

প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, যে সব শিল্পী এই ধরণের ছবি আঁকে, তাদের নিশ্চয়ই তখন প্রচণ্ড জ্বরের অবস্থা, একেবারে গা পুড়ে যাবার মতন। জিনিসগুলো আসে এইভাবে। আর যখন তুমি সে গুলোকে যুক্তিসংগত ভাবে একত্রিত করতে চেষ্টা কর, তখন সর্বদাই তার মধ্যে থেকে কতকগুলো ছিটকে পালায় বা লুকিয়ে থাকে, বা ওইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করে, আর এই সব মিলে একটা অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয়।

অতিআধুনিক হালফ্যাসানের ছবি আঁকার পক্ষে, অবশ্যই এটা সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা। জ্বরে বোধহয় তখন তাদের গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার খুবই সন্দেহ হয় যে ওরা কৃত্রিম উপায়ে ওই সব ছবি আঁকে। ভগবান জানেন, কোন্ নেশা তারা করে বা কি ধরণের ভাঙ্ বা গাঁজা খায়, বা সেটায় ধূমপান করে, হয়ত কোন আফিমের নেশায় তারা স্বপ্নের ঘোরে থাকে। যারা আফিমের ধূমপান করে, তারা বলে তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সূক্ষ্ম দর্শন হয়। নিশ্চয় ওই ধরণের কিছু একটা হবে (সকলের হাস্য)।

আমি তোমাদের এ সব কথা বললাম, তার কারণ, হয়ত শীঘ্রই তোমাদের কতকগুলো রঙিন্ ফটো দেখানো হবে। সেগুলো একজন ফটোগ্রাফার আমাদের পাঠিয়েছে, বোধহয় ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে। লস্ এঞ্জেলেস্ ক্যালিফোর্ণিয়ায়, তাই ত? (মা পবিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন) আমার ভূগোলের জ্ঞান এখনও মনে আছে!

কে বলবে যে এগুলো একেবারে অতিআধুনিক চিত্রশিল্প নয়! অথচ সত্যিই ফটো-গ্রাফ্। ওর মধ্যে কোন আঁকা ছবি নেই, সত্যিই ফটোগ্রাফ। এগুলো নেগেটিভ, রঙকরা ফটোগ্রাফির কাগজে ছাপা। রঙের বাহার অতি চমৎকার। আমি জানি না এমন চিত্রশিল্পী কেউ আছে কি না, যে এত সুন্দর এত জীবন্ত, এত ঝলমলে রঙ্ ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু এর রচনারীতি একেবারে অতি-আধুনিক। এখানে যেটা সব চেয়ে বেশী...তাইত, বরং বলা যাক, "যুক্তিসংগত"—(আমি যদি বলি "যুক্তিসংগত" লোকেরা তৎক্ষণাৎ ভেবে বসবে, "তাহলে নিশ্চয়ই ওটা কদর্য," কিন্তু সত্যিই তাই, একদিক থেকে দেখলে ওটা সত্যিই তাই, (সে যাহোক) যেটা সব চেয়ে যুক্তিসংগত, তবুও যেটা কদর্য হবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিসংগত নয়, আমার বোধহয়, সেটা হচ্ছে, ফটোশিল্পীর নিজের ছবি। ঠিক জানিনা, কারণ লোকটা বলছে না যে এটা তার প্রতিকৃতি। কিন্তু সে একটা ছোট্ট নাম দিয়েছে, "অমুক অন্তর্মুখী হয়ে রয়েছে", বোধহয় তাই বা এই রকম একটা কিছু, "কেউ একনিবিষ্ট হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা করছে, আত্মস্থ হচ্ছে", সম্ভবত এই রকম কিছু একটা। শিরোনামাগুলো বড় সুন্দর, সেগুলোও অতি আধুনিক। এর পরে আমরা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছি। একটু পাতলা, কৃশ, যেন একটা পর্দার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে, খুবই হাল্কা পর্দা, কিন্তু তবু ওটা মানুষেরই মাথা। বেশ দেখা যাচ্ছে, ওটা একটা মানুষের মাথার ফটো, আর ছবিটা বিকৃত হয়ে যায় নি, ওটা পুরোপুরি রয়েছে, কেবল একটু যেন পিছন দিকে চলে গেছে, তারপর আবার সোজা সামনের দিকে খুব উজ্জ্বল যত রেখা রয়েছে, এঁকা-বেঁকা আকারের, আড়াআড়িভাবে কতকগুলো

জিনিস, অন্য আবার কতকগুলো রয়েছে, ঠিক যেন নতুন গজানো শাঁস। আর পাত্রসজ্জার, খুবই উজ্জ্বল রঙের। এ সমস্তই একেবারে সামনের দিকে, তার কারণ, দেখছ, লোকটা স্টুল থেকে বেরিয়ে এসে পিছন দিকে গিয়ে নিজের মধ্যে প্রবেশ করছে, একেবারে নিজের মধ্যে—ঠিক তাই, এই যত সব এঁকাবেঁকা, তোবড়ানো দুমড়ানো প্রস্ফুটনের ব্যাপার। আর তার রঙটা একেবারে অদ্ভুতভাবে নিখুঁত চমৎকার। ইনি হচ্ছেন, "শ্রীযুক্ত অন্তর্মুখী হচ্ছেন।" এটাই আমরা সবচেয়ে ভাল করে বুঝতে পারি, বেচারী আমরা, যারা অতিআধুনিক নই, আমরা ওটা সবচেয়ে ভাল করে বুঝি। আরও অনেক কিছু আছে। অবাক্ লাগে, ছবিটাতে শিরোনামা দিয়েছে কেন? রচয়িতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তোমাদের সেটা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এটা সত্যই সুন্দর, হয়ত এতই সুন্দর যে আমি বললাম, আমাদের একটি প্রদর্শনী থাকলে কত ভাল হত। এই ধরণের ফটোগ্রাফি করার ভাব আমার এল এই থেকে...আমি নিজে করব না, ফটোগ্রাফির আমি কিছুই জানি না। কিন্তু একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে এই ধরণের ফটোগ্রাফ করাবার ধারণা আমার মধ্যে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর পিছনে একটা অভিপ্রায় রয়েছে। সুতরাং সেটা একেবারেই অতি-আধুনিক হবে না। আমি যাকে বলি, ভাবমূলক, গভীর অর্থব্যঞ্জক—তেমন কিছু কেউ যদি বের করতে পারে, এইভাবে, এই সব রঙকে ব্যবহার করে সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তা অতি চমৎকার খুবই অদ্ভুত হয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন জিনিস সৃষ্টি করতে বছরখানেক, হয়ত তার চেয়েও বেশী সময় লাগতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত, তার জন্যে দায়ী হলেন এই ভদ্রলোকটি আর তাঁর ফটোগ্রাফি।

ইনি নাকি সারা পৃথিবীময় বিখ্যাত—কিন্তু আমি এ সবের কিছুই জানিনা। আর এধরণের কিছু সৃষ্টি করতে প্রচুর সময় লাগবে। অবশ্য এ সব হল নেগেটিভের "সুপার-ইমপোজিসন" খুবই জটিল কাজ। এ ব্যাপারের আমি কিছুই বুঝি না। সুতরাং আমি তোমাদের এ বিষয়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছিনা। তবে শুনলাম, এর পিছনে প্রচুর খাটুনি দিতে হয়েছে, খুবই খাটুনি। এর জন্যে অতিমাত্রায় জটিল যন্ত্রসংযুক্ত কলা-কৌশলের নিপুণ দক্ষতা থাকা চাই, আর এর চরম পরিণতি লাভ করতে, আজ পর্যন্ত কেউই সফলকাম হয় নি। এগুলো হল রঙিন ফটো, প্রকাণ্ড বড়, রঙিন ফটোর পক্ষে প্রকাণ্ড বড়। আর ভিতরে একটা লাল রঙ রয়েছে...এমন অদ্ভুত লাল রঙ কেবল ফুলের মধ্যে আর সূর্যাস্তের মধ্যে প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পেরেছে—এটা তার চেয়ে আরও সুন্দর। কিন্তু কি করে যে লোকটা করেছে তা আমি জানি না। এর মধ্যে ধূসর আছে, সবুজ আছে, হলদে আছে, আরও নানা রকমের জিনিস আছে। কতক আরও সুন্দর, কতকগুলো কিছু কম, আর মিশ্র রংও আছে, যেগুলো অল্পবিস্তর উপভোগ্য। কতকগুলো ফটো রয়েছে, যেগুলো দেখতে মনে হয় যেন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। অনন্তগুণে ক্ষুদ্র সব বস্তু, যেগুলো বড় আকার ধারণ করেছে, অসাধারণ দেখাচ্ছে এই ধরনের সব জিনিস। আর স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে একটার উপর আর একটা ছবি চাপানো হয়েছে, কিন্তু তার ফলে অসাধারণ রঙের প্রতিফলন হয়েছে। যাক, ব্যাপারটা এই রকম।

জানিনা, ওরা কবে তোমাদের সেগুলো দেখাবে। হয়ত কয়েক দিনের মধ্যেই যদি না আবার ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। জানিনা আমি, খোঁজ নেব।

আমি বেশ জানি, আমি বলছিলাম, যেন তোমাদের দেখানো হয়, কারণ আমি ওগুলোকে খুবই উচ্চস্তরের বলে মনে করি, ভাগ্যিস এখানে তোমাদের মাঝে কেউ চিত্রশিল্পী নেই (সবাই হাস্যমুখর)... আধুনিক চিত্রশিল্পের চেয়ে ভাল, আর তা কি-না ফটোগ্রাফি, কারণ আধুনিক ছবিগুলোতে এই রকম স্বচ্ছতা আর ঔজ্জ্বল্য সমেত রঙের ব্যবহার এখন পর্যন্ত কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। এ সবের পাশে জলে রঙ্ গুলে আঁকা ছবিগুলোকে খুবই নিষ্প্রভ, ন্যাড়মেড়ে দেখায়। চিত্রগুলো যেন কাদার মতো। জানলার শার্সির কাচে রঙ্ করা ছবিগুলো হয়ত কিছুটা করতে পারে। কিন্তু সেখানে আবার পিছন থেকে সূর্য খেলা করছেন, তিনিই হলেন মহাশিল্পী। কিন্তু সেটা আরও কঠিন।

শার্সির কাচ ব্যবহার করার কথা আমি ভেবেছিলাম। আমি যেটা চেয়েছিলাম, তা হল সূক্ষ্মদর্শন, যা আমি দিতে চাইতাম। আমি বার কয়েক চেষ্টা করেছিলাম, ছবিতে সূক্ষ্মদর্শন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু তা বড়ই উল্টট হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ, প্রকাশের কৌশলটা ছিল খারাপ। শার্সির কাচের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু ওগুলো হল রঙ্করা কাচের ছোটছোট টুকরো, সেগুলোকে জুড়তে হয়। ছোট ছোট সিসের সুতো দিয়ে তাদের জোড়া হয়, কিন্তু তা অতি কদর্য। সেই সব ছোট ছোট সিসের সুতো, দেখা যাবে। তা একেবারেই ভয়াবহ।

কিন্তু এটা বেশ ভাল, এর দ্বারা কিছু সৃষ্টি করতে পারা যাবে।

বেশ, তাহলে আজ এই পর্যন্তই।

বিদায়, বাচাধনরা !

(নূল ফরাসী থেকে)

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্যসহ

৪—আমি জ্ঞানী* নই, কারণ আমার কোনই জ্ঞান নেই—আছে ততটুকু জ্ঞান যতটুকু তিনি দেন তাঁর কর্মের জন্য। কেমন করে জানব আমি, যা আমি দেখছি তা সুবুদ্ধি না মূঢ়তা? না, দুটির একটিও তা নয়; কারণ যা আমি দেখছি তা হল সত্যমাত্র, তা মূঢ়তাও নয়, সুবুদ্ধিও নয়।

আমি জ্ঞানী নই...। জ্ঞানী হল তারাই যারা জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে চলে, যারা শুধুমাত্র জ্ঞানের সহায়েই চায় যোগসিদ্ধি, যারা শুষ্ক বুদ্ধির পথে অগ্রসর হয় তার অতীত কিছুতে পৌঁছবার সংকল্প নিয়ে, লাভ করতে সেই জ্ঞান যা আর বুদ্ধিগত নয়, অধ্যাত্মগত। আর শ্রীঅরবিন্দ বলছেন "আমি জ্ঞানী নই...আমি জ্ঞানের অন্বেষু নই; আমি ভগবানের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি তাঁর কর্মসাধনের জন্য, এবং ভাগবত প্রসাদে, প্রতি মুহূর্তে সেই কর্মসাধনের জন্য যা জানতে হবে তা আমি জানি।"

এ এক অপরূপ অবস্থা, এ হল মনের পূর্ণ শান্তি। তখন আর অর্জিত জ্ঞানসব, অধিগত ভাবসব একত্র করবার প্রয়োজন নেই যার অনুসরণে চলতে হবে, কর্মসিদ্ধির জন্য, শিক্ষাদানের জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান যখনই চাই ইচ্ছানুযায়ী লাভ করতে হাজার হাজার জিনিস দিয়ে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করবার প্রয়োজন নেই। মস্তক নীরব, মস্তিষ্ক নিশ্চল, সবকিছুই শূন্য, শান্ত, প্রসন্ন, আর, যখনই প্রয়োজন হয়, ভাগবত প্রসাদে, চেতনার মধ্যে এসে পড়ে এক বিন্দু আলো, এবং যা জানবার তা জানা হয়ে যায়। মনে রাখবার জন্যে উদ্বেগই-বা থাকবে কেন, কেনই-বা চেষ্টা হবে সে-জ্ঞান ধরে রাখবার? যে দিন যে মুহূর্তে তার প্রয়োজন হবে, তখনই তা পাবে। প্রতিমুহূর্তে তুমি রয়েছ সাদা পাতাটি যার উপর যা লেখা উচিত তাই লেখা হচ্ছে—পূর্ণ গ্রহিষ্ণুতার শান্তি, স্বস্তি ও নীরবতার মধ্যে।

যা জানা প্রয়োজন তা তুমি জানবে, যা দেখা উচিত তা তুমি দেখবে, আর যেহেতু যা জানতে হবে বা যা দেখা উচিত তা আসছে সোজাসুজি পরমের কাছ থেকে, তা হবে সত্য-স্বরূপ, আর তা সুবুদ্ধি বা মূঢ়তার যত ধারণার পুরোপুরি বাইরে। যা সত্য তা সত্যই—ব্যস্। তা সুবুদ্ধি না মূঢ়তা এ ধরনের প্রশ্ন তুলতে চাইলে বেশ খানিকটা নিচে নেবে আসতে হবে।

নীরবতা আর বিনয়নম্র, নিরহঙ্কার সদাজাগ্রত গ্রহিষ্ণুতা। জাহির করবার বা এমন-কি হয়ে ওঠবার জন্যেও কোন উদ্বেগ নেই: অত্যন্ত বিনম্র, অত্যন্ত নিরহঙ্কার, অত্যন্ত সরল-

---

* জ্ঞানী যিনি প্রেমের পথ বা কর্মের পথ ছেড়ে জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে চলেন।

ভাবে হতে হবে যন্ত্রটি যে নিজে কিছুই নয়, জানেও না কিছু, শুধু প্রস্তুত সে সবকিছু গ্রহণ করতে এবং সবকিছু তার নিজের মধ্য দিয়ে যেতে দিতে।

প্রথম শর্তটি হল নিজেকে ভুলে যাওয়া, পূর্ণ আত্মদান, অহংশূন্যতা।

আর তখন দেহ পরমপ্রভুকে বলে "তুমি যা চাও আমি হই, তাই হব আমি ; তুমি যা চাও আমি জানি, তাই জানব আমি ; তুমি যা চাও আমি করি, তাই করব আমি।"*

৩-১০-৫৮

* *Pensées et Aphorismes avec Commentaire de La Mère* থেকে
অনুবাদ : শান্তদা

সাবিত্রী—কাব্যের বিন্যাস

সুধা বসু

সাবিত্রী কাব্যের আখ্যানভাগে কবি মহাভারতের কাহিনীর তদ্বাংশ তাঁর অসামান্য প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। অনেককাল পূর্বেকার কাহিনী যেটা ঘটেছিল; তার ভেতর দিয়ে যখন কোনও সত্য প্রকাশিত হয়, তখন কাহিনীটি হয় প্রতীক (a legend and a symbol)। সে জীবনের সঙ্গে তত্ত্ব ও কাব্য জড়িয়ে আছে। কাব্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের যে ব্যঞ্জনা, তা নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে, লোকান্তরে লোকোত্তরে, অগমলোকে।

প্রথম ভাগেই মূল কথাগুলি ' Book of Beginning খুবই অর্থপূর্ণ, Symbol Dawn-এ আরও গভীর ব্যঞ্জনা, সৃষ্টির গোড়াকার রহস্যাতে সম্পুটিত-বাণী। কাব্যের নিষ্কর্ষ প্রথমেই এতে সংক্ষেপে সূত্রের আকারে বর্ণিত হয়েছে। ভূমিকায় সাবিত্রীই প্রথমে এলেন, তিনি সবিতার শক্তি, সেই সবিতা কে?

আকাশে আধিদৈবত দৃষ্টিতে যখন দেখি প্রথম উষার আলোর উদ্ভাস সে এক "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়"। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে সূর্যোদয়ের কালের স্তরগুলি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্ধকারের বুকের থেকে উৎসারিত সেই আলোর যাত্রা সুরু হয় মধ্যরাত্রের অন্ধকার থেকে, আর তার পরাকাষ্ঠা মধ্যাহ্নের সৌরনহিমায়, সূর্য তখন মধ্যগগনে, মাথার উপর। অন্তরলোকেও তেমনি অন্ধকার অজ্ঞান থেকে, তমসা থেকে, জ্যোতির্মুখ এষণায় যাত্রা সুরু হয়। প্রথম পদক্ষেপে দেবতা অগ্নিস্বয়। ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলেছে তনোভাক্ অগ্নি, অন্ধকারের জ্যোতি। যদি কেউ জেগে থাকতে পারে, নিশার গাঢ়তম সেই অন্ধকারে দেখতে পাবে আলোর চলা...। তিনি এগিয়ে দিলেন তার পুরোভাগে জ্যোতির্ভাক্ অগ্নিকে। এগিকে আকাশ ধূসর বর্ণ হল, না আলো না অন্ধকার। এই ধূসর আকাশই রাশনের (গাধা) প্রতীক চিহ্নে বিবৃত। তারপরই পূর্বাকাশে আগুন ধরে গেল। এই দ্বিতীয় পদক্ষেপের দেবতা উষা, অন্তরে দেবীধার তিনি খুলে দেন, প্রাতিভসংবিতের দেবী তিনি। এই আবির্ভাবই শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটিয়ে তোলে। আলোর এই আভাস সূর্যোদয়ের আশ্বাস বহন করে আনে। তার পরের পদক্ষেপে সবিতার আবির্ভাব। সূর্য তখন দিকচক্রবালে সন্ধানী আলোর দৃষ্টি মেলে দিয়েছে, দিগ্‌দিগন্তরে আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে, দেবতা বাহু মেলে দিয়েছেন। সূর্যোদয় তখনও পুরোপুরি হয়নি, পৃথিবীতে অন্ধকার কিন্তু দ্যুলোকে আলোর ছটা আকাশ প্লাবিত করে উঠে আসছে। সবিতার প্রচোদনা গভীরের মাঝে চাপ সৃষ্টি করে নিঃশব্দ সঞ্চারে আলোর সরণি ছকে দিয়ে গেল, আদিতা চেতনার উন্মেষ সুরু হল। এই কালবিদ্যুতে সাবিত্রীর আবির্ভাব। চেতনার চরম এক সন্ধিক্ষণে, গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত এক মুহূর্ত থেকে যে আলোর পিপাসা তীরের মত ছুটে আসছিল, এবার নিশ্চিত আলোর পথে তার যাত্রা শুরু হল। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীর আবির্ভাবে সবিতার সেই দিব্যশক্তি সুদূর অনৃত জ্যোতির অবতরণ ঘটিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর অন্ধকারকে স্বীকার

করে নিয়ে আলোর পথে জীবকে প্রচোদিত করে নিয়ে চলেছেন। অন্ধতমিস্রার বজ্রবাধা বিদীর্ণ করে অমৃতচেতনার বিজয়, এ অমৃত সবার জন্য সবার নভ্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমা যখন শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম দর্শন করেন, তাঁর অনুভব যে অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা স্মরণীয় ও তুলনীয়। তিনি বলছেন..."ধীরে ধীরে দিগ্বলয় পরিষ্কার হয়ে উঠছে, পথ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রতিমুহূর্ত এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় হতে আরো-নিশ্চয়ের দিকে।

"শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত র'য়ে থাকে—কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি, তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে, যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্য-সত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।"

তার পূর্বেই বলেছেন..."আমি জানি যে-জিনিস আমাকে ধারণায় আনতে হবে, তার তুলনায় যে-জিনিষ এখন আমার ধারণায় উর্ধ্বতন মহত্তর শুদ্ধতর তা এখনো অন্ধকারাবৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন। কিন্তু এ অনুভূতি আমাকে হতাশ করে না, বরং আমার আস্পৃহাকে, আমার সামর্থ্যকে আমার ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, সবল করে যাতে আমি সকল বাধা জয় করতে পারি ; যাতে অবশেষে তোমার দিব্যবিধানের সঙ্গে, তোমার কর্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি"

এই তো সাবিত্রীশক্তির আবির্ভাব, সাবিত্রীর তপস্যা নতুন করে শুরু হল নতুন পর্যায়ে, ভগবানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে, ভাগবতী ইচ্ছার প্রকাশ, সত্যসঙ্কল্পের বিজয় অভিযান।

কবি গুহাহিত হয়ে সাবিত্রী কাব্য রচনা করেছেন, এ তাঁর আত্মপ্রকাশের আকুতি, ব্রহ্মের বাঙ্ময়ী প্রকাশ। তিনি সাবিত্রী সম্পূর্ণ করতে পারেননি, চিঠিপত্রে কিছু কিছু বলেছেন কিন্তু ভূমিকা লেখা হয়নি। চিঠিতে যা আভাস দিয়েছেন, তা অমূল্য। মানস-ভূমির উর্ধ্বে বিজ্ঞানের চেতনা সামান্য তত্ত্বকে বিরাটের (universal) দৃষ্টিতে দেখে। যা কিছু আমার তা সবের মধ্যে, এবং সবের সবকিছু আমার মধ্যে—এই তার বিশ্বরূপ দর্শন। এই ব্যাপ্তি ও মুক্তি কাব্যের সাধারণ লক্ষণ।

সাবিত্রী overhead poetry বা মূর্ধণ্য চেতনার কাব্য। অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি যা মস্তিষ্ককে ছাপিয়ে যায়, কিন্তু প্রয়োজনমত বুদ্ধিকে ও হৃদয়কে ব্যবহার করবে। এই জীবনের রূপকল্পগুলি ব্যবহার করতে হলে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের স্তরগুলিকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, তা মানসচেতনার উর্ধ্বে। বিজ্ঞানচেতনার দৃষ্টিতে (vision) এই লোকোত্তর অনুভূতি প্রকাশিত। তিনি এক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন..."আমার কাছে যে বাণী, সবই overmind থেকে এসেছে তা নয়, চেতনার অন্যস্তর থেকেও এসেছে।" কবির হৃদয় সবার হৃদয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। সাধারণ ব্যাপারের পিছনে রয়েছে নিগূঢ় ব্যঞ্জনা, তাই চেতনার ভূমিগুলির পরিচয় জেনে ও মেনে নিতে হবে। মূল অদ্বৈত-চেতনার ভূমি চারটি, যাদের Life Divineএ বলেছেন, উত্তরমানস (Higher mind), প্রভাসমানস (Illumined mind), বোধিমানস (Intuitive mind), ও অধিমানস (Overmind)—একরসের মধ্যেই চিদ্‌বিলাস।

উত্তরমানসের গড়ন ও ভাবন এমনই যে, সর্বত্র একদর্শন করে চেতনার সমরস সৃষ্টি

করে। এ হল, মূর্ধায় বহন করা, যোগের ভাষায় বায়ুর ঊর্ধ্বগামী হওয়া। তা হলেই তার লক্ষণ একরস ও অখণ্ড ভাবনা। উত্তরমানসের বৈশিষ্ট্য হল, চেতনা তাতে আবিষ্ট হলে বস্তুর পশ্চাতে তা ভাবকে আবিষ্কার করবে। একদিকে অন্তরে রূপোল্লাস, চেউয়ের পরে আলোর বিলাস আর কবিতা সেখান থেকে নির্ঝরের ধারার মত ঝরে পড়ছে। বাহিরে যা দেখি সবই আছে, সঙ্গে আছে রসচেতনা। এটাই মূল ভিত্তি, কবিকৃতির এটাই মূল কথা। ভাষার মাঝে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা রয়েছে, তাকেই ধ্বনির বাধ্যমে, সীমার মাঝে অসীমের রূপোল্লাসকে হিল্লোলিত করা। অরবিন্দের বহুর ব্যাখ্যান এমনই হয় Mystic যখন descriptive হয়, এমনতর ঘটে থাকে।

প্রভাসমানসে (Illumined mind) চেতনার মাঝে উদ্ভাসনতা ভাস্বর হয়ে ওঠে। সৌরবিশ্বে পারার তরলতা (টলটলানি)—যাকে বলে ব্রহ্মক্ষোভ, তা চেতনার যখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, সেটাই এই চেতনার ভূমি। বিবিক্ততা আছে কিন্তু জমাট-বাঁধা যেন একের মধ্যে অপরের অনুপ্রবেশ হয়ে রয়েছে। সহৃদয়তা না থাকলে এর আবেদন শ্রোতার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই রসগ্রাহীকে অনুভূতির ভূমি তুলে নিতে হবে।

এরপর বোধি—সেখানে সাযুজ্য বা সাদ্বাত্য বোধ। বোধ এবং যে বোধ করছে, তা একাকার হয়ে উৎসারিত। অতি ক্ষিপ্র বেগে আলোর আড়াল ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে, অপ্রত্যক্ষ ভাস্বরকে স্পর্শগোচর করে দিচ্ছে। কবি-চেতনায় এর আবেশে কাব্য হয় মন্ত্র। যথার্থ তেজস্ক্রিয় (dynamic) এই স্ফুরত্তা যে কত উচ্চগ্রামের তা অবর্ণনীয়।

এরও উর্ধ্বে রয়েছে অধিমানস। সর্বোচ্চ ভূমি অতিমানস ও অধিমানস এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তিচেতনা ও বিশ্বচেতনার মত একটু বিভেদের ভাব আছে। মূল কারণের সঙ্গে একাকার হলে যে অন্বয়চেতনা ফোটে সেটি অতিমানসচৈতন্য—Supramental Consciounsess. সে-দর্শনে মহাজীবনের মর্মসত্য এমনভাবে ব্যঞ্জিত যে বিদ্যুৎ চমকের মত তা অথচ সবস্তটাই একটা সৌষম্যের মাঝে বিধৃত। এই অধিমানসের কাব্য (Overmental poetry) সবস্তের অধিষ্ঠান অতিমানস।

সাবিত্রীতে জীবনের ব্যাপ্তির দিক দিয়ে যে বিশালতা, তাতে মহাকাব্য যেমন একদিকে, অপরদিকে বেদ ও উপনিষদের বিশালত্বের মত তা শুধুমাত্র ব্যাপ্তির দিক নয়, উদ্ভূদতা ও গভীরতার দিকও ভাবের ব্যঞ্জনা রেখে স্বল্পবাক্যে প্রকাশিত।

* * *

প্রথম পর্বে দুটি চরিত্র সাবিত্রী ও অশ্বপতি। প্রথম সাবিত্রীর প্রকাশ ভূমিকাতেই, পরে অশ্বপতির কথা। তাঁরই তপস্যার ফলে সাবিত্রীর জন্ম। সাবিত্রী অশ্বপতির আত্মজা। অশ্বপতির যোগ এখনকার রাজযোগ, Yoga of the King। প্রথম পর্বে যে যোগসাধনা করছে, সে মুমুক্ষু নয়। তার মহিমা আছে, আছে আত্মচৈতন্যের দীপ্তি। দ্বিতীয় পর্বে অশ্বপতির ভুবন-পরিক্রমা—Traveller of the worlds, এও যোগের পথ। এতে পাওয়া যায় এক প্রতিষ্ঠার ভূমি। তারপর শক্তিযোগে লোকোত্তরে উত্তরায়ণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রচলিত যোগে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা কৈবল্যই লক্ষ্য। কিন্তু এই কৈবল্য থেকেই তো বিভূতির সৃষ্টি এবং সে বিভূতি জগতের সঙ্গে উল্লসিত হয়। তখন এক শক্তি-সঞ্চারের পর্ব ঘটে।

এখন অম্বপতির যোগ কিভাবে বিন্যস্ত দেখা যাক। প্রথম পর্বেই The Yoga of the King: The Yoga of the Soul's Realese (1)
The Secret Knowledge (2)
The Yoga of the King: The Yoga of the Spirit's Freedom and Greatness...

প্রথমেই নিজেকে মুক্ত করা, এ কিন্তু কৃচ্ছ্রতা সাধনে নয়। সাধক দু'রকমের—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। অধিকারী ভেদে তাদের চিনে নিতে হয়। আরুক্ষু সাধকই বেশী, শক্তিপাতে চেতনা জাগে ও অগ্রসর হতে থাকে, ধীরে ধীরে বৃহৎভাব আসে। অম্বপতি কিন্তু প্রথম থেকেই বরণীয় (chosen), তিনি ঈশ্বরকোটি বিধিনির্দিষ্ট ভগবৎ-প্রেরিত। তাঁর যা লক্ষ্য বা পরিণাম তা প্রথমেই আভাসে ফুটে ওঠে, পরে ধীরে ধীরে আবরণ ভেদ করে সার্থক হয়ে চলে। জড়ের স্তর থেকে প্রাণের স্তরে উত্তীর্ণ হলে সাধনা শুরু হয়। অনাসব বাধা ও বৃত্রের বাধা পার হয়ে সাধক দ্যুলোকে উঠে যায়। আলোর অভিযান শুরু হয়। চেতনার এই অভিযান আত্মবিস্ফারণ ঈশ্বরকোটি সাধকের। তাতে প্রথমেই ঘটে আত্মবিমুক্তি। রাজযোগের প্রথমেই তাই দেখি আত্মআবিষ্করণ।

সবস্ত যোগেই তিনটি ধাপ বা পদক্ষেপ আছে। নিজেকে জানা প্রকৃতিকে জানা এবং লোকোত্তরে উত্তরণ। প্রকৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে অসহযোগ হয়। পরে কৈবল্য-মুক্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতি বিধাবিভক্ত, এইভাবে যুগজ্ঞানলাভ হয়। এই বিশ্ব ভুবনের সব কিছু জানা হয়ে গেল, অবিবেক থেকে মুক্ত পুরুষ যিনি, তিনি যখন কর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, তাঁর বিমুক্তিই (release) স্বাতন্ত্র্য। এই মুক্তিতে শক্তিলাভ হয় ও শক্তির উল্লাসে তাঁর স্বাতন্ত্র্য (freedom) আসে। শিব-শক্তির এই যুগনদ্ধতায় শক্তির উল্লাসে ও বিলাসে আত্মার মহিমা অনুভব করা যায়। যদি সেই আত্মমুক্তিই তার লক্ষ্য হত, অম্বপতি এখানেই থেমে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তখন ভুবন-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন—ব্যাপ্ত বৃহৎ সংসারের হাটের মাঝখানে। জগতের সব কিছু অভিঘাত এসে পড়ছে, কিন্তু তাতে তাঁর ভয়ের বা সেসব থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। জিজ্ঞাসা আছে, তাই আত্মপ্রকৃতির অগন রহস্য পরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ফুটে ওঠে। প্রথমে আসে আত্মোপ-লব্ধি ও পরে শক্তিসঞ্চার। নিজেকে ঐভাবে দেখার পালা ও বিশ্বের সকল জীবের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ—এই পর্বটি দীর্ঘ পনের সর্গে বিবৃত। প্রথমেই দেখা যায় সোপান-পরম্পরা বা সরণি, তাতে আরোহ ও অবরোহ চলেছে, এর মাঝেই তো আত্মার দীপনী। দুটি শক্তি-সঙ্গম ঘটে যাচ্ছে, চিন্ময় সব কিছু আবার গুহাহিত হয়ে পড়ছেন।

অম্বপতি প্রথমে অবতরণ করলেন জড়ের জগতে, তার দিব্য অনুভূতি ও তার বিকার দেখলেন। তারপরই ভূতসূক্ষ্ম (Subtle Matter)—তার রাজ্য যা কিনা বোধগ্রাহ্য। এই লোক যখন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়, তখন এক অপরূপ উল্লাসের অনুভব হয়। এরপর অম্বপতি উত্তীর্ণ হলেন প্রাণলোকে—প্রথমটি অবর প্রাণ, অপরটি উর্ধ্বপ্রাণ বা গন্ধর্ব লোক—দেবগন্ধর্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব।

গন্ধর্বলোকে প্রাণের যে পরিচয় পাই, তার প্রত্যেকটিতে আলোর পাশে পাশেই ছায়া এসে পড়ে। সাধকের আধারে আনন্দের উল্লাস, কিন্তু অতর্কিত এক আঘাতে সে আনন্দ

ভেঙে যায়। তখন প্রাণের আনন্দ বস্তুনিষ্ঠ আর থাকে না, হয় ভাবনিষ্ঠ, তা আনন্ত্যকে স্পর্শ করে। তাই এটি হল দেবগন্ধর্বলোক।

রসচেতনা অনেক সময় বিভ্রান্ত করে, যেমন অপ্সরচেতনার স্তরগুলি। এরই পাশাপাশি এক লোক আছে, আলোর পাশে কালো, তাকে গাঢ় বর্ণে চিত্রিত করেছেন। অশ্বপতির প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়। তখন অচিতির সেই অন্ধকার অবিদ্যার জগৎ, যা বিভ্রান্ত করে, সেখানে ঝাঁপ দিলেন। তারপর দেখা দেবে সত্যকার গন্ধর্বলোক, সেটাই স্বর্গ—প্রাণের ও মনের সন্ধিস্থল। প্রাণের সম্ভোগে মনের আলো এসে পড়েছে, সব নিশ্চিন্ত মজ। অশ্বপতির যোগে এই ভূমিগুলির পরিচয় Little Mind ও Greater Mind এই দুই ভাবে এসেছে। পূর্বে প্রাণলোকেও যেমন ক্ষুদ্রপ্রাণ (Little Life) ও বৃহৎ প্রাণের (Greater Life) ভূমি দেখে এসেছেন, এখানে তেমনই দেবলোক সব আছে, দেখলেন। যথাক্রমে Godheads of Little Mind এবং Greater Mind সব দেখেশুনে তাঁর সঙ্কোচও যেন ভেঙে গেল। দুই লোকের সন্ধিতে আবার ভাব ও বস্তুর মিলন ঘটে যাচ্ছে। দুইকে মিলিয়ে নিতে পারলে ভাবলোকে আত্মআস্বাদন করা যায়। চিদ্‌বস্তুকে আস্বাদনের কালেও কিন্তু সাযুজ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে না। Self of Mind-এর বোধ নিয়ে যখন অশ্বপতি আত্মচৈতন্যে প্রবিষ্ট হলেন, তখন আবার এক নির্বিশেষ অনুভব। বিবেক এখানে উজ্জ্বল, তাই অপরা প্রকৃতি থেকে যেমন, পরা প্রকৃতি থেকেও তেমনই যেন বিবিক্ত। এই অবস্থাই অনেকের সাধ্য-শিরোমণি। এখানেই রাজা থেমে যেতে পারতেন কিন্তু থামলেন না। তিনি গেলেন বৃহত্তর জ্ঞানে (Greater Knowledge) —সিদ্ধির এক পরম ভূমি হলেও চরম ভূমি নয়, সেই লোক। বৌদ্ধ সাধনশাস্ত্রে আছে আভাস্বর ব্রহ্মলোকের কথা যা কিনা সব কিছু বোধকে যেন ধাঁধিয়ে দেয়, তা থেকে অকনিষ্ঠাবচর ভূমিতে অভিযান—সেই রকম তার মাঝে ঝাঁপ দিলেন। সেই প্রসঙ্গে এই সব ভূমির কথা কথা আছে, এরও পরে ধ্যানের অষ্টমভূমি। পূর্বে অকিঞ্চন যার পরে আর কিছু বলা যায় না, কোনও সংজ্ঞা দেবার নয়। তারও পরে মহাপরিনির্বাণ—কিন্তু তখন তো আর কোনও চেষ্টা থাকে না। যিনি বিধিনির্দিষ্ট, তার মাঝে যা হবার তাই হয়। অশ্বপতির সাধনা সে তুলনায় মহাযানী বৌদ্ধদের মত। তিনি মায়ের দর্শন পেলেন ও বিশ্বমুক্তির বর চাইলেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পেলেন। প্রথম অংশে অশ্বপতির যোগ এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন, সাবিত্রীর আবির্ভাবের উৎসমুখে। মূল প্রতিপাদ্য প্রথম সর্গের দুটি কথা উষালগ্ন (Symbol Dawn) যার প্রতীক।

দ্বিতীয় ভাগে কাব্য তত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত হলেও কাব্যের দিকটাই প্রধানত পরিস্ফুট। সাবিত্রীর জন্ম, তাঁর জীবনের মাঝে লোকোত্তরের আলো এসে পড়েছে। কিন্তু তাও সুস্থ, সেখানে কোনও কৃচ্ছ্রতা নেই। স্বমহিমায় পবিত্র অগ্নিশিখা বেড়ে চলেছে, যেন আকাশ ছোঁওয়া তার দীপ্তি। পরমা প্রকৃতি তিনি, তাঁর বরণীয় পুরুষের সন্ধানে তিনি পরিব্রাজিকা—তাকে যেমন দেখলেন, তখনই বরণ করে নিলেন। আত্মার মিলনে, তাঁর মনে হল, এই তো পরম পাওয়া। দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে তাঁর মর্ত্য আধার সুধায় ভরে গেল। কিন্তু তারপর পিতামাতার অনুমোদন গ্রহণ করতে গৃহে ফিরে এসে শুনলেন মৃত্যুর নিদারুণ ভবিষ্যৎ বাণী—fate। তা সত্ত্বেও তাদের মিলন ঘটল—সতী পতিগৃহে এলেন।

Book of Yoga-এ মিলনের যে আনন্দ, তা দিব্য প্রবাহ রূপে শাশ্বত। কিন্তু কিন্তু সাবিত্রী একাই শুধু জানেন যে, এখানে তার শেষ আছে, স্বল্প তার আয়ু, তাই তার মনের গভীরে তৃপ্তি নেই। পরমা প্রকৃতির পুরুষ পৃথিবীতে মৃত্যুগ্রস্ত। কেন?

সাবিত্রীর সাধন সুরু হল, কেমন করে অবধারিত মৃত্যুকে তিনি অতিক্রম করবেন। তাঁর প্রেম যে মৃত্যুঞ্জয়, সে অমৃত তিনি জীবনেও হারাতে পারবেন না। এইখানে 'ইহৈব' তাঁকে সেই অমৃতশক্তি লাভ করতে হবে। তিনি অন্তরের গভীরে ডুব দিলেন, ভিতরে গভীর ভাবনা, বাহিরের আচরণে সুনিপুণা গৃহিনী, গৃহবধূ। কাহিনীর এই অংশে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগবীর্যে যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে কাব্যাংশ হয়েছে অপরূপ।

সাবিত্রী জীবনের তিনটি পরাশক্তিকে দেখলেন তিনটি প্রতিরূপে (Comp. —O Savitri, I am thy secret Soul)। সে শক্তি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে বাঁচাতে চাইছেন, কিন্তু পুরোপুরি পেরে উঠছেন না। প্রথম করুণা দেবী, কিন্তু তিনি অক্ষম। Law of Sympathy করুণা দেবীর প্রসাদ। কিন্তু সংবেদন যদি বীর্যহীন হয়, তাহলে তার তো বিশেষ মূল্য নেই। তারপর দেখলেন, শক্তিরূপ। জ্যোতিরূপে প্রজ্ঞারূপে এ শক্তি জড়ের বাধা প্রাণের বাধা সব জয় করে মনের মাঝে ফুটতে চাইছে, কিন্তু পুরোপুরি পারছে না বা স্থায়ী হতে পারছে না। এই দুই ভাবনার প্রতিক্রিয়া যে ভূমিতে সেখানে শান্তি (Quiessence) পেলেন, কিন্তু তাতেও তাঁর সমস্যার সমাধান হল না। তারপর, আরও গভীরে গেলেন। এই পর্বের শেষেরটিতে নাম নেই।

ষোড়শী সপ্তদশী অষ্টাদশী ভূমিগুলি সব তাঁর চেতনাতে প্রস্তুতি এনে দিল। অলৌকিক বেদনার ভার বুকে নিয়ে চরম দিনটির জন্য তাঁর বেদনাবিধুর প্রতীক্ষা, সেই সন্ধিক্ষণটি কি করে পার হওয়া যাবে! এরপর অরণ্যযাত্রা (forest) জগদারণ্য, তারই মাঝে মৃত্যু চরে বেড়াচ্ছে। সেই challenge—শপিত আহ্বান তিনি গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় ভাগে সাবিত্রীর লোকোত্তর যাত্রা—উত্তরণ। মৃত্যুর গভীরের গহনে গহনে তাকে জয় করার সঙ্কল্প নিয়ে তাঁর সমুখ সমরে বীর অভিযান। চেতনার বিনাশ, জরা ব্যাধি মৃত্যু কবলিত এই মর্ত্য চেতনা তিনি দেখছেন। চেতনা তখন যেন নিভে যায়, আবার চেতনার উন্মেষ হয়। এই উত্তরণের পথ চলা যায় যেমন প্রজ্ঞাবীর্যের সহায়ে, তেমনই আবার প্রেমের বীর্যে।

প্রজ্ঞার পথ যেমন বুদ্ধ প্রবর্তিত পুরুষের পথ, প্রজ্ঞাবান পুরুষ মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর পরপারে অমৃত পুরুষে সত্তা নিমজ্জিত, তারই মাঝে অবস্থান করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া। মৃত্যু তাহলে ঘটে প্রকৃতিতে, পুরুষ অমৃত। কিন্তু প্রকৃতির শক্তি কি শুধুই মৃত্যু, নিভে যাওয়া ডুবে যাওয়া আর কিছু নয়? প্রকৃতিও তো স্বরূপে অমৃতা। তিনি জয় করেন মৃত্যুকে আর এক ভাবে প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণ দিয়ে, কেন না, তাই যে তার ধর্ম। প্রাণ মৃত্যুগ্রস্ত, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রদীপ্ত করে প্রেম দিয়ে মরণকে জয় করেন। অন্তরে যার এক দিকে আছে প্রবহমানতা, তাতে প্রেম সঞ্চার করে অমৃতময়ী করে তুলতে পারেন এক পরমা প্রকৃতি নিজে। এই ভাবে অবক্ষয় বা মৃত্যুকে বাধা দিয়ে প্রেমই বিজয়িনী, তার ওপরে রয়েছে প্রজ্ঞাচক্ষু।

এরপর সাবিত্রীর অভিসার মৃত্যুর তিমিরে। সে আঁধারেও আত্মদীপ জাগ্রত রেখে আলো ঠেলে ঠেলে তিনি চলেছেন। অন্ধকারের শক্তিও বেড়েও চলেছে...।

পরিশেষে আলোর আভাস পাওয়া গেল, সেখায় আলো-আঁধারির খেলায় এক গোধূলি সন্ধির অবস্থা। সবই পাবেন এই মর্ত্যলোকে, কিন্তু বাঁচানো যাবে কি? এর পিছনে যে মৃত্যুর ছায়া আবার রয়েছে—আবার একটা স্বপ্নকুহেলির (dream-twilight) অবস্থা, সেখানে মরণের সঙ্গে প্রেমের যেন এক অন্তিম সংঘর্ষ, চূড়ান্ত শক্তির পরীক্ষা। তাতেই দেখা গেল, যমই রূপান্তরিত হয়ে যায় বৈবস্বত তনুজে, তিনিতো বিবস্বান হতেই জাত...। আবরণ পড়ল ঘুচে, দেখা দিল আলোঝলমল তার উৎস, সেই পরমপ্রকাশ সূর্য, যার অন্ত নেই।

The Book of everlasting day, সেখানে সাবিত্রী ফিরে পেলেন সব কিছু। তার সঙ্কল্প, সতী সঙ্কল্প ও ভগবৎ ইচ্ছা যে একই। অপরাজিতা তার শক্তি।

এরপর উপসংহারে সব tension হাল্কা করে দিয়ে কবি তপস্বিনীর পরিচয় তপোবনে উন্মুক্ত করে দিলেন। অনুভব্য প্রেমের ভার বহন করে অভিসারে চলেছেন মহাপ্রকৃতি, সকল জীবকে মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ করবেন জীবধাত্রী তিনি স্বয়ং। ফিরে এলাম আবার সেই উৎসমুখেই দিব্য উষার পরম লগ্নে...

সিদ্ক

বিয়োগান্ত-মিলনাত্মক নাটক

পীয়ের কর্ণেই
Pierre Corneille

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রাসাদের একটি কক্ষ

প্রথম দৃশ্য

দন আরিয়াস, কাউন্ট

কাউন্ট। তোমার কাছে স্বীকার করি,
আমার হঠকারি রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল একটা কথায়,
গিয়েছিলাম একটু মাত্রা ছাড়িয়েই ;
কিন্তু যা হয়েছে তা হয়েছে : আঘাতের আর প্রতিকার নেই।

দন আরিয়াস। রাজ-ইচ্ছার কাছে তোমার উগ্র মতি নোয়াও।
এতে দারুণ বিচলিত তিনি,
তাঁর উদ্রিক্ত ক্রোধ তোমার উপর আনবে চরম দণ্ড।
তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সামনে
কোনো ন্যায়সঙ্গত কথাও নেই বলতে পার আত্মসমর্থনে ;
কাজটা হয়েছিল রূঢ়, বৃদ্ধ বন্দী মহাশয় ব্যক্তি ;
মানুষে মানুষে সম্বন্ধ রক্ষা করে যে সাধারণ নিয়ম
এই সঙ্কোচ দাবির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বিবেচিত হবে না।

কাউন্ট। রাজা আমার জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।

দন আরিয়াস। দুষ্কার্যের সঙ্গে রাগদ্বেষ যোগ করছ তুমি।
রাজা এখনো তোমাকে ভালোবাসেন ;
তাঁর রোষ শান্ত করো ;
জান তো তাঁর ইচ্ছা—অবাধ্য করবে না তো ?

কাউন্ট। সামান্য একটু অমান্য করা কিছু পাপ নয়,
তাতে যদি আমার একান্ত বাঞ্ছিত যশ রক্ষা হয়।
যদিই বা তা হয় তাহলেও আমার বীরত্বময় সেবা বিবেচনা করে
তা উপেক্ষা করা উচিত।

দন আরিয়াস। কীর্তি যতই উজ্জ্বল ও মহৎ হোক,
রাজা কখনো প্রজার কাছে দেনদার হতে পারেন না।
অন্যের চেয়ে তুমিই তো বেশি জানো
রাজার প্রতি সহজ কর্তব্য যে করে যায়,
সে-ই তার সবচেয়ে ভালো সেবা করে;
এই উদ্ধত আত্মপ্রত্যয় তোমার কাছ থেকে চরম মূল্য
আদায় করবে।

কাউন্ট। যখন সে-মূল্য দিতে হবে তখনই বিশ্বাস করব তোমার কথা।

দন আরিয়াস। রাজার চরম ইচ্ছাকে তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত।

কাউন্ট। একদিনের অসন্তুষ্টি পার হয়েও বাঁচতে পারি আমি।
সমস্ত রাষ্ট্র সশস্ত্র হয়ে থাকুক আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে
আমাকে বিপন্ন করলে স্পেনেরই পতন হবে!

দন আরিয়াস। কি! সাহস তোমার সেই পরম ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে।

কাউন্ট। সেই রাজদণ্ডধারীকে ভয় করব কেন
যখন তার হাতের মুঠি আমার চেয়ে দুর্বল?
আমার মূল্য তিনি জানেন;
আমার শির ধরাশায়ী হলে তাঁর রাজমুকুটও খসে পড়বে।

দন আরিয়াস। যুক্তি দিয়ে সংযত করো তোমার কর্ম; উপদেশ শোনো।

কাউন্ট। আর কোনো উপদেশ চাই না যথেষ্ট বলা হয়েছে!

দন আরিয়াস। রাজসমীপে কিছু বলতে হবে তোমার হয়ে?

কাউন্ট। নিজের যাতে অসম্মান হয় তেমন কিছুতেই আমি রাজী নই।

দন আরিয়াস। মনে রেখ, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালীর বিপক্ষে যাচ্ছ।

কাউন্ট। শর ত্যাগমুক্ত, বৃথা বাক্যব্যয়ে লাভ নেই এখন

দন আরিয়াস। তোমার মত তো বদলাতে পারব না, তাহলে বিদায়।
তোমার জগনালা-শোভিত শিরেও বজ্রপাত হতে পারে।

কাউন্ট। ভয়লেশহীন চিত্তে সেজন্য অপেক্ষা করছি।

দন আরিয়াস। তোমাকে তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিচে।

কাউন্ট। বুড়ো দিয়েগ বেশ খুশি হবে তাহলে।
যার মৃত্যুভেয় নেই, সে হুমকির পরোয়া করে না।
আমার গর্বিত সংকল্প দুর্বল অবমাননার কাছে মাথা নোয়াবে না;
আমার ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা, নামযশ ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে
কিন্তু শুধু আমিই স্বয়ং আমার সম্মান খোয়াতে পারি।

রাজপ্রাসাদের সামনে খোলা জায়গা

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাউন্ট, দন রোদ্রিগ

দন রোদ্রিগ। অনুমতি দিন কাউন্ট, একটা কথা বলি।

কাউন্ট। বলো।

দন রোদ্রিগ। দিয়েগকে জানেন আপনি?

কাউন্ট। অবশ্য।

দন রোদ্রিগ। শুনুন তাহলে,
একটু নিচু গলায় কথা বলা যাক।
আরো জানেন কি
তাঁর এখনকার অশক্ত বাহু
একদা ছিল স্পেনের শ্রেষ্ঠ সম্মান বীরত্ব মহিমা?

দন রোদ্রিগ। আমার এই দু'চোখে জলন্ত আগুন
জ্বালিয়ে দিচ্ছে উভয়ের এক রক্ত;
তা জানেন?

কাউন্ট। তাতে আমার কী এসে যায়?

দন রোদ্রিগ। কাউন্ট, এখান থেকে চার পা সরে গিয়ে
আপনাকে শিখিয়ে দেব তাতে কী এসে যায়।

কাউন্ট। বকাটে ছোকরা।

দন রোদ্রিগ। আস্তে কথা বলুন দয়া করে।
কাউন্ট, আমার বয়েসের বছরসংখ্যা কম
কিন্তু বিশেষজনের জীবনে গৌরব আর বীরত্ব প্রায়ই অভিন্ন।

কাউন্ট। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তুমি!
তুমি বাক্‌সর্বস্ব আনকোরা উদ্ধত ভুঁইফোড়?
বালোচিত গলাবাজি তোমার থামাও!

দন রোদ্রিগ। আমার ইস্পাতফলক দ্বিতীয় প্রমাণের অপেক্ষা করে না
প্রথমই যথেষ্ট।

কাউন্ট। তুমি জান কার সঙ্গে কথা বলছ?

দন রোদ্রিগ। বেশ জানি।
আমি ছাড়া কেউ হলে আপনার নাম শুনে মূর্ছা যেত.
আপনার জয়ের মুকুট তো হওয়া উচিত—
সেটাই স্বাভাবিক—
আমার কাছে নিজের মৃত্যুঘোষণা।
তবু আপনার অপরাজিত বাহুকে বাধা দেব আমি:
যেখানে সাহস দিশারী সেখানে শক্তিও পাব।
পিতৃসম্মান আমার ত্রিফলা বর্ম,
অজিত হলেও অপরাজেয় আপনি নন।

কাউন্ট। তোমার ভয়শূন্য কথা দেখিয়ে দেয়
তার পিছনে নির্ভীক হৃদয়।
তোমার দৈনন্দিন উন্নতি আমি লক্ষ করে আসছি,
আশা ছিল তোমার মধ্যেই দেখব কাস্তিলের ভবিষ্য মহিমা,
গর্বিত হৃদয়ে দিচ্ছিলাম তোমার হাতেই আমার কন্যার হাত।
তোমাদের প্রেম আমার অজানা নেই,

আরো মুগ্ধ হলাম যে কর্তব্য তব তোমার কাছে প্রিয়তর প্রতিমা,
নয়ন আবেগ রণোৎসাহ স্তিমিত করে না।
চেয়েছিলাম আমার ছেলে হবে মহদাশয় বীর,
তোমাকে পছন্দ ক'রে তাতে আমার ভুল হয়নি।
কিন্তু তোমার কথা শুনে ভিতরে আমার দয়ার উদ্রেক হচ্ছে;
তোমার তরুণ চেহারায় এ-দুঃসাহস মানায় না;
তোমার প্রথম প্রয়াসকে শেষ প্রয়াস করতে যেও না
এমন অসম দ্বন্দ্বে আমি রাজি নই;
সমূহ বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে জয়লাভ
তুচ্ছ বিজয় লাভ,
আর এরকম দ্বন্দ্ব আমার উপযুক্ত নয়।
কেউ স্বপ্নেও ভাবে না তুমি এক মুহূর্ত টিঁকবে আমার বিরুদ্ধে,
আর সারা জীবন আমার অনুতাপ থাকবে
তোমার এই তারুণ্যে নির্বোধ মৃত্যুর জন্য।

ডন রোড্রিগ। আপনার অনুকম্পা আপনার ঘৃণার চেয়ে বেশি অপমান করছে আমাকে;
আপনি আমার বাহুকে ভয় পান
অথচ আমার সম্মানকে আঘাত করতে রাজি।

কাউন্ট। দূর হও এখান থেকে!

ডন রোড্রিগ। কথায় কাজ কি, কাজে নেমে পড়া যাক।

কাউন্ট। জীবনে বৈরাগ্য এল নাকি?

ডন রোড্রিগ। তাহলে মরতে ভয় আছে আপনার?

কাউন্ট। চলে এস।
তোমার কর্তব্য পালন কর,
সে-পুত্র নরাধম যে পিতার যশ ভাঙিয়ে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকে।

রাজকুমারীর গৃহে
তৃতীয় দৃশ্য
রাজকুমারী. সিমেন. লেওনোরা

রাজকুমারী। না, কেঁদোনা। শোক সংবরণ কর সিমেন।
এই দুঃখ তোমার আত্মার শক্তি দেখিয়ে দেবে।
এই ক্ষণস্থায়ী ঝড়ের পরে নেমে আসবে স্থৈর্য,
এখন যে দুরুহ ও মেঘাচ্ছন্ন শান্তি
তা বৈপরীত্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।
কেঁদোনা।

সিমেন। বাধায় জীর্ণ আমার হৃদয়ের আর কোনো আশা নেই।
এমন আচমকা ও মারাত্মক ঝড়
আমার তরীকে ডুবাডুবির ভয়ে আতঙ্কিত করছে।
আমার হাসিখুশি দরিয়ার বুকে পাল তুলে চলার আগেই
বন্দরে ডুবে গেলাম।
যাকে এত ভালোবেসেছিলাম তারও ভালোবাসা পেয়েছিলাম;
আমাদের অভিভাবকরাও সম্মতি দিয়েছিলেন;
আর ঠিক যখনই বলছিলাম আমার মধুর কাহিনী
তখনই শুরু হয়ে গেছে কলহ,
তাতে আমার কথা শোনায় শোকালাপ বলে।
হায় সর্বনাশা দুরাকাঙ্খা। ক্রোধের উন্মত্ততা!
যে অহংকার আমার ইচ্ছার প্রতি নির্মম
তারই স্বেচ্ছাচার মহত্তম চরিত্র শাসন করে।
দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুপাতে কঠিন মূল্য দিচ্ছি আমি।

রাজকুমারী। তোমার ভয় গিলে ফেলেছে তোমাকে;
ও ভেবেচিন্তে বলা কথা নয়;
ক্ষণিকের কলহ ক্ষণিকে মিলায়।
রাজা ইতিমধ্যেই শান্তির জন্য উৎসুক
আর তুমি তো জান
তোমার অশ্রু মোছাতে ও দুঃখ ঘুচাতে
আমি অসম্ভব চেষ্টা করতেও প্রস্তুত।

সিমেন। কোনো নিটমাট সম্ভব নয়।
এ-আঘাত মর্মান্তিক;

কোনো রাজা রাজপুত্রের কাছে নরম গরম সব বাচনকলাই ব্যর্থ।
একটা লোক-দেখানো শান্তি আনা যেতে পারে,
তবু হৃদয়ে চেপে রাখা বিদ্বেষের আগুন
শেষনেষ শিখা বিস্তার করবেই।

রাজকুমারী। প্রেম যখন শিবেন ও রোদ্রিগকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বেঁধেছে
তখন বিদ্বেষ চলে যাবেই :
তাদের পিতারাও ভুলে যাবেন,
মধুমধুর মিলনে সুখ নীরব করে দেবে সংঘর্ষ।

শিবেন। আমি তো তারই অপেক্ষায়,
তবে ভরসা পাই না আশা রাখতে।
দু'টি গর্বিত জনের সমান দম্ভ :
কেউ হার মানবে না,
জানি ওদের আমি—কান্নাই আমার কপালে।

রাজকুমারী। কী ভয় কর? একটি বৃদ্ধের দুর্বলতা?

শিবেন। বীর পিতারা জন্ম দেয় বীর পুত্রের,
রোদ্রিগ দুঃসাহসী।

রাজকুমারী। সে নবকুমার মাত্র।

শিবেন। এমন লোকেরা মহৎ-হৃদয়।

রাজকুমারী। তার সাহসে অতিরিক্ত ভয় পেওনা ;
সে তোমাকে ভালোবাসে,
তোমাকে আঘাত দিতে পারে না ;
তোমার অধরনিঃসৃত একটি কথা তার ক্রোধ নিবৃত্ত করবে।

শিবেন। কী করে বলব তা?
যদি সে না শোনে,
আমার বুকের উপর আর এক পাষাণভার তা ;
যদি সে শোনে তাহ'লে লোকে তাকে বলবে কী—
বাপের বেটা, বাপের পতন দেখেও
প্রতিশোধে তর্জনী পর্যন্ত তুলল না?

ওই সংকটে বিভ্রান্ত আমি,
জানি না কী করা করা উচিত
তার অতি দুর্বল প্রেম কিংবা অতি কঠোর প্রত্যাখ্যান।

রাজকুমারী। শিবেন, তোমার মহৎ হৃদয়ে
তোমার অনুপযুক্ত কোনো চিন্তা থাকতে পারে না
কিন্তু এই বিপদ পার না হওয়া পর্যন্ত
যদি এই পরাক্রমী যুবককে বন্দী করে রাখি,
তুমি যে আশংকা করছ তা ঠেকিয়ে,
তাহলে কি তোমার প্রেমাকুল হৃদয়
অপরাধ নেবে আমার?

শিবেন। আঃ, দেবি তাহলে দুশ্চিন্তা আমার দূর হয়।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজকুমারী, শিবেন, লেওনোরা, দূত

রাজকুমারী। দূত, রোদ্রিগকে ডাক এখানে: আমি দেখা করতে চাই।

দূত। তিনি এবং গোরমাজের কাউন্ট...

শিবেন। সর্বনাশ, হায়, এস শিগগির!

রাজকুমারী। কী? খুলে বলো!

দূত। তাঁরা দু'জনে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেছেন।

শিবেন। নিঃসঙ্গ?

দূত। আজ্ঞে, রাগে গরগর করছিলেন দু'জনে।

শিবেন। তাহ'লে হাতাহাতি হয়েছে! কথায় আর কোনো ফল নেই।
মহাশয়া, মাপ করবেন এই ক্ষয়—
হৃদয় আমার চুরমার হয়ে যাবে।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজকুমারী, লেওনোরা

রাজকুমারী। হায়। এমন দুশ্চিন্তা আমার
ওর দুঃখে কেঁদে মরি অথচ রোদ্রিগ এখনো নুড়ি করে;
শান্তি আমার গেছে, নিভন্ত আগুন জ্বলে উঠছে ফের।
যে নিয়তি শিমেনকে তার প্রেমিকের থেকে দূরে সরায়
তা আমার দুঃখ ও আশাকে সমান জাগায়,
নিঠুর হলেও তাদের বিচ্ছেদ
আমার ভিতরে উস্কে দেয় এক গোপন সুখ।

লেওনোরা। আপনার আত্মার মহৎ গুণ
এত শীঘ্র নিশ্চয় কামনার নীচ সুড়সুড়ির কাছে আত্মদান করবে না।

রাজকুমারী। না, এরকম ব'লো না,
আমার দৃঢ় ও বিজয়ী হৃদয়ে
আমার ইচ্ছাকে তা-ই সংযত রাখে।
আমার প্রেমকে সম্ভ্রম ক'রে চ'লো,
আমার একান্ত প্রিয় তা;
আমার মহত্তর মর্যাদা বারণ করলেও
আমি আশায় আছি।
একটা এমন বিভ্রান্তিকর পাগলামির বিরুদ্ধে অরক্ষিত হৃদয় আমার
ছুটে চলে যে-প্রেম হারিয়েছে শিমেন তার কাছে।

লেওনোরা। তাহ'লে আজও প্রতিজ্ঞা আপনার ভুলো হল তো?
যুক্তি তার রাজদণ্ড নামিয়ে রাখল?

রাজকুমারী। আঃ, এমন মধুর বিষ যখন হৃদয় চাটিয়ে তোলে
তখন যুক্তির ফল বড় কঠিন ও কঠোর;
রোগী তার যন্ত্রণাদায়ক রোগ ভালোবাসে
স্বেচ্ছায় নিরাময়ের নিদান গ্রহণ করতে চায় না।

লেওনোরা। প্রেমের কোমল প্রগলভতায় মোহগ্রস্ত হবেন না,
রোদ্রিগ যে আপনার নিম্নতর কুলের তা সকলে বিলক্ষণ জানে।

রাজকুমারী। আমারও বিলক্ষণ জানা উচিত,
কিন্তু হৃদয় আমার স্তাবক প্রেমের গুঞ্জন শুনছে
এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে রোদ্রিগ যদি জয়ী হয়ে ফেরে
আর এই মহাবীর যদি তার অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হয়
তাহলে প্রেমের ওকালতির পক্ষে অন্য ছুতোর কী প্রয়োজন?
জয়ীর জয়ীকে কে রাখতে পারে!
আমার কল্পনা তো তার কীর্তির কোনো সীমা পায় না;
গোটা গোটা রাজ্য তার শাসনে এসে যাবে;
আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে প্রাসাদের প্রাচীন সিংহাসনে উপবিষ্ট;
মুর প্রজারা থরহরি তার আদেশ পালন করছে;
গর্বিত আরাগঁ মেনে নিয়েছে তাকে রাজা ব'লে,
পর্তুগাল বরণ করেছে তাকে,
সপ্তসিন্ধু লেপে লেপান্তরে তার মহিমা পৌঁছে দিয়েছে।
তার বিজয়মাল্য আফ্রিকার রক্তে রঞ্জিত হবে,
মহত্তম নেতার সম্বন্ধে যা-কিছু শোনা গেছে
এই বিজয়ের পর রোদ্রিগের নামের সঙ্গে তা শুনতে পাচ্ছি;
তখন তার প্রেমে আমার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা।

লেওনোরা। না, মহাশয়া, কল্পায় স্বপ্ন দেখছেন
সেই সব বিজয়ের যার সূচনারও সম্ভাবনা নেই।

রাজকুমারী। রোদ্রিগ রাগান্বিত; কাউন্ট দুরাচার করেছেন;
দুজনে বেরিয়ে গেছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে
আর কি চাই?

লেওনোরা। অতি উত্তম, দুজনে দ্বন্দ্বে ব্রতী হবে তাহলে—
যেমনটি তুমি চেয়েছ:
রোদ্রিগ কি ততদূর যেতে পারবে যতদূর তুমি যাবে?

রাজকুমারী। কী বলতে চাও? দুর্বল আমি;
মূঢ় মন আমার পাগলপারা
আমার মতো শিকারদের জন্য প্রেম ফাঁদ পাতে।
এস আমার ঘরে
সেখানে সান্ত্বনা দাও আমার দুঃখে,
বিপদকাল পার না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে যেওনা আমাকে।

রাজবাড়ীতে

ষষ্ঠ দৃশ্য

দন ফেরনান্দ, দন আরিয়াস, দন সাঞ্চো

দন ফেরনান্দ। বলো তো, এই রগচটা কাউন্টের কোনো বুদ্ধিবিবেচনা আছে?
সে কি বলে করে তার দুষ্কৃতি উপেক্ষা করা চলে?

দন আরিয়াস। ওকে আমি বলেছি আপনার কঠিন মনোভাব;
দীর্ঘ ও আন্তরিক অনুনয়ের উত্তর কিছুই পেলাম না।

দন ফেরনান্দ। কী সর্বনাশ! দেশে আমার প্রজা আছে
এমন হঠকারি যে আমার ইচ্ছা অবজ্ঞা করে?
আমার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধানতম সভাসদকে সে অপমান করে
তারপর সেই অপার ঔদ্ধত্য নিশানা করে আমার দিকে!
আমার রাজসভার আইন সে সেধে ডাকছে:
নেতা যোদ্ধা আর যত মহৎ সে হোক
তার দুর্বিনীত আত্মারামটিকে একটা জবর শিক্ষা দেব।
রণদেবতা বা মূর্তিমান বীরত্ব হলেও
নিজের রাজাকে তার আনুগত্য দিতেই হবে।
তেমন উচিত শিক্ষা প্রাপ্য হলেও
ভেবেছিলাম লঘুদণ্ড দেব।
অনুগ্রহকে যখন সে তাচ্ছিল্য করে
তখন এই মুহূর্ত থেকেই সে বন্দী,
তার কোনো প্রতিরোধে ফল হবে না।

দন সাঞ্চো। দেখুন, রাজাধিরাজ, খানিকটা সময় দিলে শান্ত হতে পারে তার মন।
কলহক্ষেত্র থেকে সদ্য নিষ্ক্রান্ত
রাগে গরম তাকে সম্বোধন করা হয়েছিল।
রাজন, এত হঠকারি এমন সাহসী লোক
আবেগের প্রথম দোলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে
অচিরে সে জানবে তার দোষ,
যদিও এখন পর্যন্ত স্বীকার করতে পারে না সে দোষী।

দন ফেরনান্দ। চুপ করো, সাঞ্চো, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।
যে দোষীকে সমর্থন করে সেও দোষের ভাগী।

দন সাল্লো। আজ্ঞে মহারাজ, আপনার আদেশ পালন করব আমি.
তবে দয়া ক'রে আর একটি কথা বলতে দিন তার স্বপক্ষে।

দন ফেরনান্দ। এমন অবিবেচকের হয়ে কী বলার আছে?

দন সাল্লো। মহৎ কার্যে অভ্যস্ত মহাপ্রাণের উপযুক্ত জিনিস দয়া নয়;
সে সম্মান না খুইয়ে বশ্যতার কথা ভাবতে পারে না।
উচ্চশির নত ক'রে বিটমাটে আসা তার সম্ভব নয়;
যে ভূমিকা তাকে দিয়েছেন তা অতি নগণ্য;
নিকৃষ্টতর লোক হলে সে মানত আপনার আদেশ।
রণক্ষেত্রের বিপদের মধ্যে দিয়ে পরিণত তার বাহুকে
আদেশ দিন সম্মানের রক্ষকে ওই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে।
যে দুঃসাহসী বীর তার তরবারির সামনাসামনি হবে
তারই আহ্বানে সায় দিয়ে ক্রত প্রায়শ্চিত্ত করবে।

দন ফেরনান্দ। যথাযথ সম্মান দেখাতে তুমি ত্রুটি করলে.
কিন্তু যৌবন বেপরোয়া.
তাই উৎসাহের আতিশয্যে কৃত তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম।
বিবেচনাই রাজার নায়ক,
প্রজার তিনি জীবননৃত্যের অধিনায়ক।
নিজের ভাগ্য যেমন সযত্নে সাগ্রহে রক্ষা করি
তেমনি সর্বাধীপ হিসাবে আমার জনসাধারণকেও সযত্নে দেখি।
সুতরাং তোমার যুক্তি আমার যুক্তি নয়;
তুমি কথা বলছ সৈন্যের মতো,
আমাকে কাজ করতে হয় রাজার মতো।
তাছাড়া. কাউন্ট যা-খুশি ভাবুক,
রাজার কাছে আনুগত্য তাকে মহৎই করে তোলে।
সে আমার বিরোধিতা করেছে,
সে আমার পুত্রের আচার্যকে রূঢ়ভাবে অসম্মান করেছে।
তাকে আঘাত করা
সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে আঘাত হানা ছাড়া কিছু নয়।
আর কোনো কথা শুনতে চাই না।
শোনো! দশটি শত্রুজাহাজকে নিশান উড়িয়ে আসতে দেখা গেছে,
নদীর বুকে প্রকাশ্যে এসে পড়তেও স্পর্ধা হয়েছে তাদের।

দন আরিয়াস। মুররা প্রাণের দায়ে আপনাকে চিনে নিয়েছে;

বার বার বিজিত হয়ে কী সাহস থাকতে পারে তাদের
বিজেতার মুখোমুখি হবার ?

দন ফেরনান্দ। আন্দালুসিয়ার উপর আমার আধিপত্য
তারা ঈর্ষাহীন দৃষ্টিতে কখনো দেখবে না।
এমন সুন্দর দেশ বহুদিন তাদের অধীনে ছিল.
চিরকাল তার উপর তাদের লুব্ধ সতর্ক দৃষ্টি।
ঠিক এই কারণেই বহু বছর আগে
প্রাচীন সেভিল-য়ে কাস্তিলের সিংহাসন পেতেছি আমি.
কাছাকাছি থাকার জন্য
এক প্রয়োজননতো বিদ্রোহ বা আক্রমণ প্রতিহত করতে।

দন আরিয়াস। অনেক অনেক মহাবীরের মূল্যে ওরা জানে
আপনার উপস্থিতিই সেই বিজয়ের মূল।
আপনার কিছুতে ভয় করার নেই।

দন ফেরনান্দ। অবহেলাও কিছুতে করতে পারি না
প্রত্যয় বিপদের সার্থক বন্ধু।
তুমি বেশ জানো. জোয়ারের একটি প্রবল টানে
তাদের সব এনে ফেলতে পারে আমাদের প্রাচীরোপান্তে।
এটা গুজব মাত্র ;
তবে ত্রাস ছড়াতে দিও না.
মিথ্যা বিপদ রটিয়ে নিরর্থক ভয় বাড়িও না।
রাত্রিকালে শহরে হুলুস্থুল বাধিও না ;
কিন্তু দ্বিগুণ জোরদার কর প্রাচীর আর পোতাশ্রয়।
আর বেশি না জানা পর্যন্ত এই যথেষ্ট।

সপ্তম দৃশ্য

দন ফেরানন্দ, দন সান্চো, দন আলন্সো

দন আলন্সো। কাউন্ট মৃত।
বিরেগ পুত্রের দ্বারা প্রতিশোধ নিয়েছে।

দন ফেরনান্দ। যখনই অপমানের কথা শুনেছি

তখনি ভেবেছি প্রতিশোধের কথা।
হয়ত আমিই জাগিয়ে দিয়েছিলাম সেই মারাত্মক ক্রোধ!

দন আলনসো। শিমেন আসছেন,
কি করুণ অশ্রুতে অভিসিক্ত,
আপনার চরণে হয়ত বিচার দাবি করবেন।

দন ফেরনান্দ। বেচারীর দুর্ভাগ্যে হৃদয় আমার করুণায় উদ্বেলিত.
তবে এও মনে হয়,—
কাউন্টের উদ্ধত কর্ম এই তিরস্কার ডেকে এনেছে।
তবু যতই ন্যায়সঙ্গত হোক তার এই দুর্ভাগ্য
আমার দুঃখ যে হারালাম সমর্থ ও যথার্থ এক বীরকে.
সে দিয়েছে আমাদের রাজ্যকে দীর্ঘকালব্যাপী সেবা.
হাজার বার রক্ত ঢেলে দিয়েছে আমাদের জন্য.
তার অহংকার আমার ক্রোধ জাগায়.
কিন্তু আমার সিংহাসন তার মৃত্যুতে যেমন দুঃখার্ত তেমনি হীনবল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দন ফেরনান্দ, দন দিয়েগ, শিমেন, দন সাঞ্চো, দন আরিয়াস, দন আলনসো

শিমেন। ন্যায়বিচার, মহারাজ, ন্যায়বিচার।

দন দিয়েগ। মহারাজ, আমাকে বলতে দিন।

শিমেন। আপনার চরণাশ্রিত আমাকে দেখুন।

দন গিয়েগ। আপনার জানু স্পর্শ করছি।

শিমেন। আমার দাবি সুবিচার।

দন দিয়েগ। আমার স্বপক্ষে ভাষা শুনুন।

শিমেন। এই সাহসী যুবকের ঔদ্ধত্যকে শাস্তি দিন।
আপনার রাজ্যের প্রধান সহায়কে এ আঘাত হেনেছে।
এ বধ করেছে আমার পিতাকে!

ডন দিয়েগ। নিজের আঘাতের প্রত্যুত্তরে!

শিমেন। প্রজার রক্ত রাজার কাছে সুবিচার দাবি করে।

ডন দিয়েগ। ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ শাস্তি চায় না।

ডন ফেরনান্দ। ওঠো, শান্তভাবে সব শোনা যাক।
শিমেন, আমার গভীরতম সহানুভূতি জেগে উঠছে,
তোমার চেয়েও বেশি দুঃখ আমার হৃদয় মথিত করছে।
(দিয়েগের প্রতি) তুমি কথা বলবে পরে,
ওর নিবেদনে বাধা দিও না।

শিমেন। মহারাজ, পিতা আমার মৃত;
স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর দেহের পাশ থেকে ঝরছে রক্তধারা;
যে-রক্ত কত কতবার আপনার প্রাকার রক্ষা করেছে;
যে-রক্ত বহুবার আপনাকে সংগ্রামে বিজয় এনে দিয়েছে;
সেই ক্ষরিত রক্তে ক্রুদ্ধ উত্তাপ
এখনো আপনি ছাড়া অন্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগে প্রস্তুত।
যুদ্ধের মারাত্মক নরমেধযজ্ঞ যা কখনো পারে নি
রোদ্রিগের হাত আপনার মাটিতে সেই রক্তপাত ঘটাল।
রুদ্ধশ্বাসে রক্তশূন্যভাবে সেই জায়গায় পৌঁছালাম;
দেখলাম তাঁকে নিষ্প্রাণ।
মহারাজ আমার অশ্রুবিসর্জন মার্জনা করবেন;
এই করুণ আখ্যান বর্ণনায় ওষ্ঠে আমার কথা যোগাচ্ছে না;
যা বলতে পারি না দীর্ঘশ্বাসেই তা প্রকাশ পাবে।

ডন ফেরনান্দ। বাছা, সাহসী হও;
এখন থেকে তোমার রাজাই তোমার পিতা
যাকে হারিয়েছ তার জায়গায়।

শিমেন। মহারাজ, আমার দুঃখে এমন সম্মান আমি দাবি করিনি;
বলেছি তাঁকে দেখলাম নিষ্প্রাণ;
দগদগে ক্ষত আর তা থেকে নিঃসৃত রক্তধারা,
আর মলিন ধুলাবালির সঙ্গে তার মিশ্রণ
দেখিয়ে দিল আমার কর্তব্য,
অবিলম্বে নিয়ে এল এখানে;

সেই ভয়ংকর বিস্ফারিত মুখ আমার গলা দিয়ে কথা বলছে,
এবং সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ রাজাকে তা শুনতেই হবে।
মহারাজ, আপনার রাজছত্রতলে আপনার চক্ষের সামনে
এরকম স্বৈরাচার যেন অবাধে না চলে,;
যাতে মহত্তম যাঁরা তাঁরা যেন উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত বালখিল্যদের
আঘাত না পান,
যাতে তাঁদের উপর বিজয়ে হামবড়া ছোকরা এক বাহাদুরি না ফলায়,
তাঁদের রক্তে স্নান করে তাঁদের বিদ্রূপ না করতে পারে।
একজন বীর যোদ্ধা হত্যার প্রতিবিধান না হলে
অন্য বীরাগ্রগণ্যদের উৎসাহ নিতে যাবে।
মহারাজ! আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ-বিধান হোক!
আমার বেচারা হৃদয়ের চেয়ে আপনার সিংহাসনেরই তার প্রয়োজন বেশি।
তার পদ ছিল উচ্চ, তাঁর মৃত্যুতে আপনার সমূহ ক্ষতি;
মৃত্যুর বেতন দিন মৃত্যু দিয়ে,
রক্তের প্রতিশোধ রক্ত নিয়ে।
আমার জন্য নয়,
আপনার রাজমুকুটের জন্যই আমি চাই,
মূর্তিমান আপনার কাছে, মহারাজের কাছে, আমি ভিক্ষা চাই প্রাণদণ্ড,
এক প্রাণদণ্ড যা রাজ্যের সকলকে দেখিয়ে দেবে
দুর্বিনীত কর্মের উন্মত্ততা।

ডন ফেরেনান্দ। দিয়েগ, কী বলবে তুমি?

ডন দিয়েগ। সে ঈর্ষার বিষয়
যে জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হারিয়ে চিরবিদায় নিতে পারে।
বার্ধক্যের দুর্বলতা তো বহৎ জীবনের সায়াহ্নে
শোচনীয় নিয়তি আনে।
আমার যে গর্বিত তরবারিতে অঙ্কিত নানা কীর্তি
আমার যে শিরে বারংবার পড়েছে জয়ের মাল্য
সেই আমি অতি দীর্ঘকাল জীবনে দাঁড়িয়ে
আজ অবমানিত ভূলুণ্ঠিত অথর্ব।
যা কোনো অবরোধ কোনো ঘাটিকা-আক্রমণ,
আপনার যাবতীয় শত্রু, আমার যতেক ঈর্ষান্বিত বন্ধু,
আরাগঁ বা স্পর্ধিত গ্রাণাদা পারেনি
তা পেরেছে ওই কাউন্ট আপনার প্রজা,
আপনার নির্বাচনে দিংসার্কিষ্ট যে,

বার্ধক্যের বিরুদ্ধে যৌবনে দুর্দম যে
আর তা আপনারই সভামধ্যে, আপনারই দৃষ্টির তলায়।
এই কেশকেশর, মহারাজ, সংগ্রামের কঠিন পেষনে শুভ্রায়িত,
আপনার হিতার্থে ক্ষরিত এই রক্ত,
জীবনভর শত্রুদের আতংক এই বাহু,
তলিয়ে যেত এক অলক্ষিত কবরে
যদি না পুত্র পিতার উপযুক্ত বলে প্রমাণ দিত,
তার দেশ ও রাজার যোগ্য বলেও।
পিতার তরবারি নিয়ে সে কাউন্টকে বধ করেছে
সে আমার সম্মান কলঙ্কমুক্ত করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।
যদি সাহস ও তীব্র বিরাগ দেখানো
যদি প্রতিশোধের আঘাত শাস্তিযোগ্য
তবে আপনার ক্রোধের বজ্র পড়ুক আমার উপর।
হাত যখন ভুল করে তখন মাথা শাস্তি গ্রহণ করে।
এই যা নিয়ে কথা হচ্ছে তা যদি দোষ হয়
তবে, মহারাজ, হাতটি তার এবং ইচ্ছাটি আমার।
শিবেন তাকে বলছে তার পিতার হত্যাকারী ;
কর্নটি আমার ; আমি চেয়েছিলাম তার স্থান নিতে।
আপনার সিংহাসনের জন্য রেহাই দিন তরুণ ও সবল বাহুকে,
বধ করুন এই দলপতিকে যার অস্তিম কাল আসন্ন।
বুড়ো সৈন্যের রক্তে যদি শিবেন শান্ত ও তৃপ্ত হয়
তাহলে এই এখনই সে নিতে পারে
এমন কঠোর আদেশে শোক না করে
মহনীয় মৃত্যুতে উৎফুল্ল হব আমি।

ধনঞ্জয়নাথ। এ কর্ম গুরুতর তাৎপর্যপূর্ণ,
পূর্ণ মন্ত্রণাসভায় তা বিবেচিত হবে।
কাউন্টের কন্যাকে বাড়ি নিয়ে যাও ;
আর দিয়েগ তুমি থাকবে তোমার কথানুযায়ী বন্দী।
রোদ্রিগকে আনা হোক ;
আমি ন্যায় বিচার করব।

শিবেন। মহারাজ, হত্যাকারীর প্রাণ যাবেই, এই ন্যায়বিচার।

ধনঞ্জয়নাথ। শোক সংবরণ কর, বাছা, বিদ্রুহ নাও গে।

শিবেন। নীরবতা যখন চিন্তাকে দমিত করে তখন যন্ত্রণা বাড়ে।

(ক্রমশঃ)

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ১·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

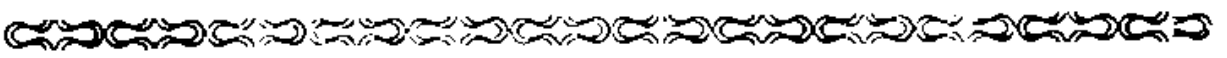

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street

Calcutta-25

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

- 7 SEP 1973

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বহুভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা পুরোণো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশিত মূল্য—১০০ টাকা (সডাক ১৫০ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫০ টাকা (সডাক ৫০০ টাকা)

[শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

॥ গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ॥

১। ১০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকদের জমা ১০০ টাকার অঙ্কে হিসাবনিকাশ করা হবে।

যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ লেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

বর্তিকা

২রা নভেম্বর, ১৯৭৯

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৯)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৪
মায়ের আলাপ	...	২৯
আত্ম-সংসিদ্ধি	অরিন্দম বসু	৩৬
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	...	৪১
সাহিত্য-সংস্কার	শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ	৪৪
একটি কবিতা	...	৫৪
সিদ্ধ (নাটক)	পিয়ের রণেঁই	৫৫

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathmondir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Ponicherry-2

5-3-59

Turn your mind completely away from your difficulty, concentrate exclusively on the Light and the Force coming from above; let the Lord do for your body what He does. Hand over to Him totally the entire responsibility of your physical being.

This is the cure

With my blessings

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

১০ম পর্ব—৪র্থ সর্গ

ধ্বনিত হয়ে ওঠে পুনরায় মৃত্যুর গভীরতর কণ্ঠ এক।
আপনি যেন বন্ধ্যা বিধানের তলে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে
হয়ে নিপীড়িত আপনার উগ্র অর্থহীন সঙ্কল্পে,
অবজ্ঞাপূর্ণ ক্লান্ত সহৃদয়,
ধরে রাখে নাই আর তার পুরাতন নির্বন্ধ সুর—
মনে হয় এ যেন জীবনেরই অগণিত পথধারার প্রতিরূপ,
চিরকাল প্রয়াস করে চলেছে, কোন সিদ্ধি আনে নাই
জন্ম আর পরিবর্তনের ফলে, সেই বর্তাশক্তি যত যার আশ্রয়ে
বর্তে চলে সে, স্থির সীমানা-দণ্ডের চারিদিকে
লক্ষ্যহীন তাকে চলতে হয় বিপুল আবর্তনে—
ধাবনপথ তার দ্রুততর হয়ে চলেছে চিরতরে অথচ রয়েছে একই রূপে।
নিয়তির, আকস্মিকের, মহাকালের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ লীলা চলেছে,—
লীলার ব্যর্থতা স্থিরনির্দিষ্ট জয় হোক পরাজয় হোক,
অজ্ঞানের, সন্দেহের ভারে বিচূর্ণ সে
জ্ঞানের সঙ্গে আত্মপ্রসারের সঙ্গে তা অধিকতর হয়েছে,
পার্থিব মন ডুবে চলেছে, হতাশ হয়ে পড়েছে,
তা হয়ে পড়েছে যেন বৃদ্ধ, শ্রান্ত, নিরাশ তার কর্ম সম্বন্ধে।
তবে কি কিছুই হয়নি, ব্যর্থ সব অর্জন?
মহান কার্য কিছু করা হয়েছে, একটা আলো, একটা শক্তি
মুক্তি পেয়েছে বিশাল নিশ্চেতনার মুষ্টি হতে:
উঠে এসেছে তা রাত্রিগর্ভ থেকে; চেয়ে দেখছে তার উষার আগমনী
আবর্তিত হয়ে আসছে চিরকাল যদিও চিরস্থায়ী নয় কোন উষাই।
এই সুর-পরিবর্তন দেবতার সুদূরগামী কণ্ঠে ধরা দিল;
তার রূপবিভীষিকায় এল পরিবর্তন, স্বীকার করে নিল যেন
শাশ্বতের জন্য আমাদের ক্ষণস্থায়ী প্রয়াস,
তবে সন্দেহ ছড়িয়ে দিল আর যা-কিছু হতে পারত তাদের প্রসঙ্গে
একটা অসম্ভব দিনের মহিমাময় ইঙ্গিতের উপর।
বিপুল কণ্ঠ তবে উদ্বেলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে কহে চাহি সাবিত্রীরে
"তুমি এখন পেয়েছ সেই জ্ঞান যা অতিক্রম করে গিয়েছে

রূপের আবরণ এবং রূপের নিরাবরণ উভয়ই,
উঠে এস, চক্ষুষ্মান দেবতারা বুক্তি দিল তোমাকে।
তুমি যদি তোমার মনকে মুক্ত রাখতে জীবনের রুদ্র পীড়ন হতে
তবে তুমি তাদের মত হয়ে উঠতে পারতে সর্বজ্ঞ, প্রশান্ত।
কিন্তু তোমার প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হৃদয় বাধা দেয়।
এ হল যেন অন্ধাচক এক অপশক্তির ঝঞ্ঝাপ্রিয় বিহঙ্গের মত
ইচ্ছা যার জগৎকে টেনে ধরে তার কাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে
নিয়তির অবোধ্য ভাগ্যলিপি,
মৃত্যুর শাসন আর বিধি আর অজ্ঞেয় ইচ্ছাশক্তি।
কর্মে অতিরা তাদের, ভগবৎ বিধি খণ্ডন করবে তারা
মহান সেইসব সত্তারা অতিমাত্র প্রেম হৃদয়ে যাদের,
তারা গঠিত তোমারই মত, তুমি হলে উভয়ধর্মী,
এসেছে তারা জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে
তাদের বিশাল প্রকৃতি নিয়ে কালক্রম উৎক্রান্ত হয়ে।
শক্তির পূজারী তারা জানে না প্রতিক্রিয়া শক্তির,
তাদের বিরাট ইচ্ছাশক্তি বিক্ষুব্ধ যুগক্রম আপনবশে চালিয়ে নেয়।
জ্ঞানী যারা তারা প্রশান্ত নীরব সমুন্নত গিরি
উঠে যায় অবিরত অসাধ্য গগনের দিকে,
চিরস্থির প্রতিষ্ঠার পরে আসি তাদের, মস্তক তাদের
স্বপ্নশূন্য স্বর্গের অব্যয় লোকের মধ্যে।
উন্নুখী শিখরের পরে, বহিরাবয় নিস্তব্ধ,
উর্ধ্বগামী অন্তঃপুরুষকে স্বর্গের অভিমুখে অর্ধপথে তুলে ধরে
সহায়ক শক্তিবৃন্দ রয়েছে তৃপ্ত
দেখে যায় কেবল তারকামণ্ডলীর আবর্তন।
আপনারা নিশ্চল চলেছে তারা পৃথিবীর গতিবেগে,
দেখে চলে যুগচক্র চলেছে, সবরূপে রয়েছে চিরদিন।
জ্ঞানীজনের চিন্তা চলে যুগচক্রের আবর্তনে, শোনে তারা পদক্ষেপ
দূরান্তরের জিনিসের; ধীর, অচঞ্চল ধরে রাখে তারা
তাদের শঙ্কাপূর্ণ জ্ঞান আপনাদের গভীর অন্তরে দমন করে,
পাছে মানুষের ভঙ্গুর দিন সব অজ্ঞাতের গর্ভে ডুবে যায়
জাহাজের মত তার সঙ্গে আবদ্ধ এক অতিকায় অনন্তর আকর্ষণে
বিপুল সাগররাজির অতলগর্ভে।
দেখ, চঞ্চল হয়ে ওঠে কেবল সকলে দেবতাদের পদক্ষেপ অতিনিকটে আসে যখন।
সকলই অস্থির, বিপদমজ্জিত, ব্যথিত, দীর্ণ, উৎক্ষিপ্ত।
ধরমান যুগান্ত স্খলিতপদে ছুটে চলবে অতিদ্রুত
স্বর্গের সামর্থ্য অকস্মাৎ নেমে আসে যদি অসম্পূর্ণ পৃথিবীর পরে

আর নিত্যাবরণ জ্ঞান হানে আঘাত এইসব অপরিণত জীবেদের।
দেবতারা তাদের নিদারুণ শক্তিকে পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছে
ভগবান লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর চিন্তাকে, এমনকি মনে হয় ভ্রান্তি
অবধি তিনি করে থাকেন।
শান্ত থাক, স্থিরভাবে চল এই মন্থরগামী বিশ্ব জগতের মধ্যে।
শক্তিময়ী তুমি, ভয়ঙ্করী দেবীশক্তি যখন তোমায় অধিকার করেছেন,
যাঁর কাছে তুমি আকুল নিবেদন জানিয়েছ প্রত্যূষে অস্ফুট মনভূমি প্রান্তে।
শক্তি তোমার প্রয়োগ করবে না উদ্দাম আসুরী সত্তাদের মত।
স্পর্শ করবে না স্থির লিপিমালা, প্রাচীন শাস্ত্রবিধান,
সমীহ করে চলবে মহান দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্থির বস্তুসমূহকে।"
কিন্তু সাবিত্রী উত্তরে কহে বিপুল দেবতাকে
"এই যে প্রশান্তি তুমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর, কি সে বস্তু, হে ধর্মরাজ, হে মৃত্যু?
নয় কি এ তবে অন্ধপ্রায় জড়িমাময় পদক্ষেপ
সেই সব বিকট মহাবলদের বাঁধা রয়েছে যারা কঠোর এক চক্রাবর্তে
আত্মাহীন পাষাণচক্ষু যন্ত্রবৎ স্বপ্নরাজি?
ব্যর্থ আশা জীবাত্মার বিধানের ধর্মপরিবর্তন যদি না হয় কখনও
অতিনবের দিকে অজ্ঞানের দিকে ধেয়ে চলেছে
দ্রুতবেগে যুগযুগান্তর ভগবানকে প্রমাণিত করে।
পৃথিবীর যুগক্রমের অর্থ কি যদি ধূসর আবরণটি
ভেঙে ফেলা না হয়, মহিমা সব উৎক্ষিপ্ত হয়ে না আসে
তাদের অন্ধকার বীজাধার দীর্ণ করে আর মানুষেরও মন্থর জীবনধারা
শশব্যস্তে ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকে হঠাৎ সমুজ্জ্বল পল্লাসব ধরে
দিব্যবাণী আর মানুষী দেবত্বস্পর্শ প্রকাশ করে ধরেছে যাদের?
স্পর্শালু মন আর হৃদয়ের উপর আরোপ করবে না
যে তামস স্থিরত্ব বেঁধে রাখে প্রাণহীন বস্তু সব।
অচেতনার শাসন পশুর জীবনের পক্ষে যথোপযুক্ত,
তারা তৃপ্ত অটল যুগভার স্কন্ধে বহন করে;
মানুষ চায় উন্নততর গতিভঙ্গি, বীরমার্গ।
আমি তোমার বিধান আমার জীবন্ত পদতলে দলিত করি;
স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে উঠে দাঁড়াবার জন্য আমি জন্মেছি।
আমি যদি সমর্থ তবে আমার শক্তি অনবগুণ্ঠিত হোক
সমান সহচর চিরন্তন শক্তিদের সঙ্গে,
নতুবা আমার ব্যর্থ জীবাত্মা ডুবে যাক—
ভগবৎ-সত্তার অনুপযুক্ত সে—আদি সৃষ্টির মধ্যে।
মহাকালের কাছ থেকে আমি দাবি করি আমার স্বেচ্ছাশক্তির আনন্ত্য
ভগবানকে দাবি করি তাঁর নিমেষধারার ভিতর থেকে।"

যমরাজা উত্তরে বলেন, "সনুন্নত অমর ইচ্ছাশক্তি
কেন আনত হবে পৃথিবীর পরে তুচ্ছ ক্রিয়াকর্মের তরে,
ভুলে গিয়ে স্বাধীনতা আর শাশ্বতের পথ?
সামর্থ্যের চিন্তাশক্তির এই কি সমুচ্চ ব্যবহার,
মৃত্যুর কালের বন্ধনের সঙ্গে সংঘর্ষ
পরিশ্রমের অপচয় যার ফলে দেবত্বলাভ হতে পারে
আর সংগ্রাম আর ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণা
অধিকার করতে তুচ্ছ সুখভোগ সব পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব যা রক্ষা করে চলতে
তার তুচ্ছ বস্তুসংগ্রহের ক্ষুদ্র সিন্দুকে?
বৎস, তোমার পদতলে দেবতাদের দলিত করে এসেছ
শুধু কি পার্থিব জীবনের ছিন্ন খণ্ডসব সংগ্রহের জন্য
সেই মানুষের জন্য যাকে তুমি ভালবেসেছ প্রত্যাখ্যান ক'রে মহান নির্বুদ্ধি,
স্বর্গের আও মহানন্দ হতে তার অন্তরাত্মাকে বঞ্চিত করেছ
সহৃদয় দেবতাদের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও?
তোমার বাহুযুগল মধুরতর কি ভগবানের সান্নীপ্য হতে?"
উত্তরে সাবিত্রী: "ঋজু পদক্ষেপ আমার পথটি ধরে,
আমাদের সে পথ দৃঢ়হস্ত এক পরিকল্পনা করেছে, আমার জন্য প্রায় কেটে ধরেছে।
আমি ছুটে চলি যেখানে সেই মধুর ভীষণ কণ্ঠ নির্দেশ দেন,
আমি চালিত যে প্রগ্রহে তা ভগবানের হাতে রয়েছে।
বিরাট সব জগতের পরিকল্পনা বিশাল রূপ দিয়ে কেন তিনি অঙ্কিত করেছিলেন,
অসীমকে কেন তিনি ভরে দিয়েছিলেন তাঁর আবেগভরা প্রাণবায়ু দিয়ে?
কেনই-বা তিনি গড়ে তুলেছিলেন আমার মর্ত্যরূপ,
আমার অন্তরে বপন করেছিলেন তাঁর উজ্জ্বল গর্বিত বাসনাসব,
যদি-না তিনি চাইতেন সিদ্ধিলাভ করতে, নবরিত হতে আমার মধ্যে, ভালবাসতে,
তাঁর একটা মানস প্রতিমা উৎকীর্ণ করতে, তার আকার হবে ঐশ্বর্যময়
চিন্তায় আর বিশালতায় আর সোনালী সামর্থ্যে?
সুদূর স্বর্গ তার ধৈর্য ধরে আমাদের আগমনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।
স্বর্গ গড়ে তোলা সহজ ভগবানের পক্ষে।
পৃথিবী ছিল তাঁর কঠিন বিষয় এক, পৃথিবী এনে দিয়েছে
সমস্যাটির মহিমা এনে দিয়েছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ।
দেখা দিয়েছে বিকট মুখোশসব, বিভীষণ শক্তিসব;
সেখানেই মহত্ত্ব দেবতাদের সৃষ্টিকর্তা।
অন্তঃপুরুষ কি অমর নয়, মুক্ত নয় চিরদিন,
লাভ করেনি নিষ্কৃতি কালের মুষ্টি হতে?
কেন সে নীচে নেমে এল মর্ত্য আকাশতলে?
কর্মতার এক নিয়েছে সে মানুষের সমূর্ধ্ব চেতনার অন্তরে

লিখে দিয়েছে গুপ্তমনুষ্য এক প্রকৃতির চূড়ায় চূড়ায়।
এই হল স্বাধীনতা চিরন্তিত অন্তরাত্মার কাছে,
জীবনধারার সীমানার মধ্যেও বিশাল সে, সমর্থ সে জড়ের গ্রন্থিবাঁধে,
কর্মের মহান উপাদানসব জগৎ হতে গড়েছে সে
সূক্ষ্ম জাল সে প্রস্তুত করেছে স্থূল বিক্ষিপ্ত সূত্র হতে
আর প্রেম ও সৌন্দর্য মুক্ত এবং রাত্রি হতে,
অপূর্ব এই পণ, দিব্য এই লীলা।
কি সে স্বাধীনতা অন্তঃপুরুষের যে অনুভব করে না মুক্ত সে
একান্ত নগ্ন না হয়ে, আদরে চুম্বন করতে পারে না সেইসব শৃঙ্খল
পরমপ্রেমিক বেঁধে দিয়েছে তাঁর খেলার সাথীর অঙ্গে চারিদিকে,
তাঁর উৎপীড়ন স্বাগত করে, তাঁর আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হয়ে?
আরও সত্য করে তাঁর সেবার জন্য আপনার অসীম হৃদয় দিয়ে
নারী সে স্বীকার করে নিয়েছে প্রিয় বাহুযুগলের সীমানা পরিধি,
অবনত হয়েছে আনন্দে ভরপুর হয়ে তাঁর প্রবল করতল অধিকারে
তাঁর বিপুল বাধাবন্ধনে হাসা করে সে, বন্ধন যত তাঁর মুক্ত সে তত।
এই আমার প্রত্যুত্তর তোমার যত প্রলোভনে, হে মৃত্যু।"
অটল অচল মৃত্যুর প্রত্যাখ্যান তার কণ্ঠের প্রত্যুত্তরে আসে
"যতই শক্তিময়ী হও তুমি, যে গুপ্ত নামই তুমি বহন কর না কেন
উচ্চারিত যে নাম দেবতাদের গুপ্ত সভামাঝে,
তোমার হৃদয়ের ক্ষণিক আবেগ লীর্ণ করবে না
বাস্তব বস্তুর লৌহপ্রাচীর
মহান দেবতারা তুলে দিয়েছে যা আকাশপ্রসারে তাদের শিবিরের চারিদিকে।
যে-ই তুমি হও না কেন তোমার মানুষী ছদ্মবেশের অন্তরালে,
হও-বা তুমি বিশ্বের জননী,
তোমার দাবি তুমি প্রতিষ্ঠিত কর যদি আকস্মিকের রাজ্যে,
বিশ্ববিধান বলবত্তর তোমার সঙ্কল্প অপেক্ষা।
ভগবান অবধি আপনার রচিত বিধান মান্য করে চলেন
বিধি চিরস্থায়ী, তার কোন পরিবর্তন হয় না,
ব্যক্তি হল বুদ্‌বুদ মহাকালরূপ সাগরের বুকে।
পুরোধা তুমি আগামী এক মহত্তর সত্যের,
তোমার অন্তরাত্মা তার মুক্ততর বিধানের স্রষ্টা,
গর্ব তার পশ্চাতের শক্তি এক, নির্ভর করে তার পরে,
জ্যোতি ঊর্ধ্বে এক যা দেখেছ একমাত্র তুমি,
সত্যের বিজয়ের প্রথম ফল দাবি কর তুমি।
কিন্তু কাকে বল সত্য? তার আপন রূপ কোথায় তুমি পাবে
ইন্দ্রিয়াবলীর এই যত মায়াময় প্রতিমার মাঝে?

আর মনের যত অনুমান ভিড় করে আসে,
ছায়াচ্ছন্ন দ্বিধারাজি যত এই জগতের
চিন্তাধারার যত সন্দিগ্ধতার ভিড় যেখানে—তাদের মাঝে ?
কোথায় সত্য, কখন কোথায় শোনা গিয়েছে তার পদক্ষেপ
মহাকালের হট্টগোলের এই নিরবচ্ছিন্ন চিৎকারে,
তারই আপন কণ্ঠ কোন্ এই সহস্র কণ্ঠের মধ্যে
মস্তিষ্কের শ্রুতি অতিক্রম করে যায় আর অন্তরাত্মাকে প্রতারণা করে ?
অথবা সত্য নয় কি একটা সমুচ্চ তারকারাজ্যের নামমাত্র,
কিংবা অস্পষ্ট জ্যোতির্ময় বাক্যমাত্র যার আশ্রয়ে মানুষের মন
আপন প্রকৃতির নির্বাচনকে অনুমোদন করে পূজনীয় করে ধরে,
প্রাণের বাসনা জ্ঞানের পোশাকে আবৃত করে আপনাকে,
সঙ্কলনের মধ্যে সংকলিত যে প্রিয়তম ভাব,
অর্ধ-আলোকের সন্তানদের মধ্যে বুদ্ধির যে প্রিয়তম
উচ্চকণ্ঠে তার মনের খেলার মাঠে ডেকে আনে জনতার দল
অথবা তার সৃষ্টির আগারসব শিশুদের নিদ্রায় পরিপূর্ণ করে রাখে ?
সব জিনিসই এখানে দুলে চলে ভগবানের ইতি ও নেতির মধ্যে,
দুটি শক্তি সত্যকার, অসত্য কিন্তু পরস্পরের কাছে,
যুগল তারকাদুটি মনের চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল রাত্রিতলে
দৃষ্টি তাদের দুটি বিপরীত দিকবলয়ের অভিমুখে,
শুভ্র মস্তক কৃষ্ণ পুচ্ছ যেন লোকশ্রুত মাতঙ্গের,
বেগবান অথচ শক্ত পদযুগল, সদর্প ডানা অথচ ভগ্ন
ধারণ করে রয় একটা অনিশ্চিত জগৎকে,
একটা বিপুল সত্যাতীত অজগর আকাশ-প্রসারে।
তোমার যে সমুচ্চ গর্বিত সত্য তার জীবন বিপদসঙ্কুল,
জড়িত সে জড়ের মর্ত্য ক্ষুদ্রতার মাঝে।
এ জগতে সবই সত্য, অথচ সবই মিথ্যা
তার চিন্তাবলী মিশে যায় গিয়ে একটা চিরন্তন রিক্ততার মধ্যে,
তার কর্মাবলী উপচিত হয়ে মিলে যায় কালের বর্তুল শূন্যের সঙ্গে।
এই মানুষ যুগপৎ পশু আর দেবতা,
বৈপরীত্যের সমস্যা এক ভগবানের রচিত
অক্ষম সে অন্তরের ভাগবত রূপ মুক্ত করে দিতে,
আপনার হতে আপনি সে ন্যূনতর, বৃহত্তর কিছু তবু,
মুমুক্ষু পশু, ব্যর্থ দেবতা ;
তবু পশু নয়, দেব নয়, মানুষ সে,
তবে মানুষ বাঁধা কৃপালু পৃথিবীর শ্রমকর্মে, প্রয়াস করে আপনাকে
অতিক্রম করে যেতে,

উঠে যেতে বেয়ে ভগবানের সোপানাবলী উর্ধ্বতর মহাবস্তুসবের অভিমুখে।
বস্তুসব হল প্রত্যয় মাত্র, তাদের সত্য কেউ জানে না,
ভাবনা হল অজ্ঞান এক দেবতার অনুমান মাত্র।
সত্যের কোন আবাস নাই পৃথিবীর অবুঝ হৃদয়ের মধ্যে
তবুও বুদ্ধি ছাড়া জীবন হল একটা স্বপ্নের জট,
কিন্তু বুদ্ধি ঝুলে রয়েছে একটা আধ-আঁধার অতলের উপরে
আর তার শেষ আশ্রয় হল সন্দেহের পাদপীঠ।
শাশ্বত সত্য মর্ত্য মানুষের সঙ্গে বসবাস করে না।
অথবা যদি সে নিবাস করে তোমার মর্ত্য হৃদয়তলে
দেখাও আমাকে জীবন্ত সত্যের দেহখানি
অথবা এঁকে ধর আমার কাছে তার মুখের আকার
তাহলে আমিও তাকে মেনে চলব আর পূজা করব।
তখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব তোমার সত্যবান।
কিন্তু এই এখানে রয়েছে শুধু ঘটনা, আর লৌহবন্ধ বিধান।
যে সত্য আমি জানি তা হল সত্যবান মৃত,
তোমার মধুরিমা অবধি তাকে প্রলুব্ধ করে ফিরিয়ে আনতে পারে না।
সত্যের কোন যাদুই মৃতকে জীবন্ত করে ধরতে পারে না,
পৃথিবীর কোন শক্তি মুছে ফেলতে পারে না যে জিনিস একবার করা হয়েছে।
হৃদয়ের কোন আনন্দই মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকে না,
কোন মহাসুখ অতীতকে ফিরিয়ে আবার জীবন্ত করতে পারে না।
কেবল জীবনধারাই নূক শূন্যকে সান্ত্বনা এনে দিতে পারে,
চিন্তায় ভরে দিতে পারে মহাকালের রিক্ততা।
মৃতকে, হে সাবিত্রী, ত্যাগ করে চলে যাও, নিজে ফিরে যাও জীবনে।"
নারী কহে তখন বিরাট ছায়ামূর্তিকে,
তার কথার সঙ্গে মর্ত্যতা অদৃশ্য হয়ে গেল;
তার আপন দেবীমূর্তি নিজ দৃষ্টিতে ফুটে উঠল,
আলো জ্বলে উঠল তার মুখমণ্ডলে স্বর্গের স্বপ্ন যেন।
"হে মৃত্যু, তুমি ভগবান বটে কিন্তু সম্পূর্ণ তিনি নও,
তুমি হলে তাঁর পথপরে তাঁর কৃষ্ণছায়ামাত্র
ঘোরা রজনী পিছনে ফেলে যখন চলেছেন তিনি উর্ধ্বমুখী পথে
টেনে নিয়েছেন সঙ্গে তার মধ্যে সংযুক্ত যে নিশ্চেতন মহাশক্তি।
অচেতন ভগবানের তুমি ছায়াচ্ছন্ন মস্তক,
তাঁর অজ্ঞানের তুমি হলে শোচনাবর্জিত দুর্লক্ষণ,
বিপুল ঘোর অন্ধকার যে জঠর তার স্বভাবজ সন্তান,
তাঁর অমৃতত্বের পরে কলঙ্করেখা।
সব বৈপরীত্যই এক ভগবানের বিবিধ মূর্তি।

বহু হল অগণিত এক,
এক তার বুকে বহন করে বহুকে,
তিনি হলেন নির্ব্যক্তিক, দুর্ধর্ষ অদ্বিতীয়,
তিনি হলেন অনন্ত ব্যক্তি তাঁর জগতের সাক্ষী;
নৈঃশব্দ্য বহন করে সনাতনের মহান মূক স্বাক্ষর,
তাঁর জ্যোতি অনুপ্রাণিত করে সনাতন বাক্যকে;
তিনি হলেন অচলের অতল মৃত্যুহীন স্তব্ধতা,
তার শুভ্র লক্ষণহীন রিক্ত নেতিবর শান্তি,
তবুও দ্রষ্টা আত্মা অস্তি সেখানে, সর্বশক্তিময় ঈশ্বর
তিনি দেখে চলেন তাঁর ইচ্ছা সম্পন্ন হয়ে চলেছে দেবতাদের রূপের আশ্রয়ে
আর যে বাসনা অন্ধশাখাতে চালনা করে অর্ধচেতন মানুষকে
আর যে রাত্রি অনিচ্ছুক দৃষ্টিহারা।
এই যে একান্ত পৃথক ভগবানের প্রান্ত সব, এই বিপরীত শক্তিসব
এ হল ভাগবত তনুর বাম ও দক্ষিণ দিক
সৃষ্টি সনতা রেখেছে দুটি মহাভুজের কল্যাণে
মনকে বিভ্রান্ত করে তা চিন্তাধারার অমীমাংসিত গহ্বর সম্মুখে স্থাপন ক'রে।
নিম্নে অন্ধকার, তলহীন জ্যোতি উর্ধ্বে,
জ্যোতির মধ্যে সংযুক্ত, তবে বিচ্ছিন্ন ভেদকারী মনের কল্যাণে
দাঁড়িয়ে তারা মুখোমুখি, বিভিন্নদিকে, অচ্ছেদ্য,
দুটি বিপরীত তারা, তাদের প্রয়োজন তারই বিশাল সৃষ্টিব্রতের জন্য,
দুটি প্রান্ত যাদের প্রবাহধারা জাগিয়ে ধরে বিশাল বিশ্ব-শক্তিকে।
তাঁর আত্মাপুরুষের বিরাট গুপ্ত গহনে,
বিশ্বের উর্ধ্বে দুই সমান ডানার তলে আশ্রয় প্রসারিত করে দিয়ে,
তিনি একের মধ্যে উভয়ে আদিহীন অন্তহীন:
উভয়ই অতিক্রম করে তিনি প্রবেশ করেছেন নির্বিশেষে।
তাঁর সত্তা রহস্য এক মনের অতীতে,
তার গতিধারা মর্ত্য অজ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে;
সান্তকে ভাগ করে ছোটছোট গণ্ডির মধ্যে সাজান হয়েছে,
বিমূঢ় সে বিশ্বাস করে না ভগবানের হঠকারিতা,
দুঃসাহসে মনে করে সে কল্পনাতীত সর্বস্ব,
দেখে এবং কর্ম করে যেন সে হল একই অসীম।
মানুষী বুদ্ধির কাছে এই হল তার অপরাধ;
তাকে জানা হয় চিরদিন অজ্ঞেয়রূপে,
সব সে তবুও রহস্যময় সর্বাতীত সে,
নির্বিশেষ তবুও নিবাস তার কালের সবিশেষ জগতে,
চিরন্তন সর্বজ্ঞ, জন্মও স্বীকার করে,

সর্বশক্তিময়, লীলা করে চলে যদৃচ্ছার এবং নিয়তির সঙ্গে,
চিন্ময় তবু সে জড় আর মহাশূন্য,
সীমাহীন, নামের রূপের অতীত,
তবু নিবাস করে দেহের মধ্যে, এক এবং অদ্বিতীয়
পশু সে মানুষ সে দেবতা সে
প্রশান্ত গভীর সাগর, হাসি তার দুলে চলে ঊর্মিমালাভঙ্গে
বিশ্বরূপী সবকিছু সে,—বিশ্বাতীত, কিছু নয়।
মানুষের ন্যায়বোধের কাছে এই হল সেই অদ্বিতীয়ের বিশ্বজোড়া মহাপাপ,
সর্বশক্তিময় নিজে তিনি বসে রয়েছেন পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে
সজ্জনকে ছেড়ে দিয়েছেন এই দুষ্কৃত জগতে তাদের ভাগ্যের হাতে
পাপকে দিয়েছেন রাজ্যশাসনের ভার এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে।
লক্ষ্যহীন পরিশ্রম একটা, সামান্যই অর্থ তার,
মনে হয় যেন এ হল বিরোধ আর সংঘর্ষ আর আকস্মিকতা
সেই দৃষ্টির কাছে যা দেখে শুধু অংশ, সমগ্রটি হারায়ে ফেলে।
মানুষ চোখ বুলায়ে যায় কেবল উপরে উপরে, গভীর যা ধরা দেয় না তাদের সন্ধানে
স্ববিরোধী রহস্য এক তাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে,
হতাশাজনক যেন ঘৃণ্য এক ঘটন।
তবুও কিন্তু লক্ষ্যভেদী নিশ্চেতনার নির্ভেজাল কূট চালের মধ্যে,
বিশ্ব-অজ্ঞানের আকস্মিক ভ্রান্তির মধ্যে
একটা পরিকল্পনা, গুপ্ত বুদ্ধির খেলা ধরা দেয়।
প্রত্যেক পদস্খলন, প্রত্যেক পতনের রয়েছে একটা উদ্দেশ্য
প্রকৃতির একান্ত সহজ অঙ্গন্যাস একটা স্বেচ্ছাকৃত ভঙ্গি
লক্ষ্য তার একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ, একটা গভীর ফললাভ।
চতুর তান সব অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে একটা উদ্দেশ্যকৃত সুরবিন্যাসের মধ্যে,
এই যত লক্ষাধিক বিরোধী সুর গড়ে তুলেছে একটা সুসঙ্গত মর্মার্থ
বিশ্ববিকাশের বিপুল বহুল বিচিত্র নৃত্যনাট্যের।
পরম সত্তা এক বাধ্য করেছে এই জগতের সৃষ্টি,
আপনাকে আবৃত করেছে জড়ের মধ্যে যেন অবগুণ্ঠনতলে,
মৃত্যুর অবগুণ্ঠন, অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন।
বাধ্য করেছে যত সূর্যকে পুড়ে চলতে শুদ্ধ আকাশ পার হয়ে,
তারা যেন অনুপলব্ধ বীর্যশক্তির মশালচিহ্ন
ধ্যানপর বিপুল ব্যোমতলের অরূপ সমাহিতি মাঝে;
জ্ঞানকে সে দেখিয়েছে যেন একটা আবরণের অন্তরালে ক্লেশপরায়ণ জ্যোতির্লেখা,
পরমসত্তাকে যেন একটা জ্ঞানহারা বস্তু, নিরেট, মূক,
আর পরম আনন্দ বোধহারা জগতের সৌন্দর্য।
শান্ত বস্তুর মধ্যে সচেতন অনন্তের নিবাস

সুপ্তি নিমগ্ন সে জড়ের অসহায় সমাহিতির মধ্যে,
বিশ্বকে শাসন করে প্রসুপ্ত নিষ্ক্রিয় রিক্ততা হতে,
স্বপ্নে তার নিক্ষেপ করে সে বাহিরে মনকে হৃদয়কে অন্তরাত্মাকে
শূন্যে নিগৃহীত, নিবদ্ধ, কঠিন পৃথিবীর পরে ;
সমগ্র বস্তু সে বিচূর্ণ কাজ করে চলে বিক্ষিপ্ত যত কণার আশ্রয়ে ;
তার উদ্‌ভ্রান্ত খোলস সব হল মহাজ্ঞানের যেন হীরকদীপ্ত চিন্তাবল,
তার প্রতিরূপ ছায়াভাস হল আমাদের অজ্ঞান।
আরম্ভ তার হল নুড়ি পিণ্ড হতে সংখ্যাতীত স্থূলিল সব,
পুরুষ সত্তাকে সে গড়ে তোলে মস্তক হতে, স্নায়ু হতে,
আর আপন সুখ দুঃখ হতে অনুভবশীল জীব এক।
অস্ফুট অস্পষ্ট অনুভব সকলের একটা সমষ্টি সে, ইন্দ্রিয়গ্রামের একটা বিন্দু
বর্তে থাকে তবু ক্ষণতরে, জীবনের সংঘর্ষে সাড়া দিয়ে চলে,
তারপরে অবশেষে পিষ্ট হয়ে যায় অথবা শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে মৃতরূপ
পরিত্যাগ করে চলে যায়,
চলে যায় এই বিপুল বিশ্ব হতে যেখানে ছিল তার জীবন
একটা নিরর্থক অনাহূত অতিথিরূপে।
কিন্তু অন্তঃপুরুষ বৃদ্ধি পেয়ে চলে ভবনের গর্ভে লুক্কায়িত হয়ে ;
দেহকে সে দিয়ে চলে তার শক্তি তার ঐশ্বর্য
লক্ষ্য সে অনুসরণ করে চলে লক্ষ্যহারা জ্ঞানহারা জগতে,
অর্থ দিয়ে চলে পৃথিবীর অর্থহীন জীবনে।
অর্ধদেবতা পশু এক হয়ে উঠেছে চিন্তাশীল মানুষ।
কর্মতলে ওলটপালট করে, চিন্তায় তবু উঠে যায় স্বর্গের অভিমুখে ;
খেলা করে ভাবনা করে, হাস্য করে রোদন করে, স্বপ্ন দেখে চলে,
পূর্ণ করে তার তুচ্ছ যত সাধ পশুর মত ;
দৃঢ়নিবিষ্ট হয়ে জীবনের গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি দিয়ে।
এই যে জট বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়বোধের
এই যে সীমাবদ্ধ চিন্তাধারার সংকীর্ণ ঘের
ভেদ করে উঠে আসে সে অবশেষে, অবশেষে জেগে ওঠে অধ্যাত্ম মানসে ;
শুরু হয় তার এক সু-উচ্চ স্বাধীনতা, জ্যোতির্ময় অবকাশ
আভাস পায় শাশ্বতের, স্পর্শ করে অনন্তেরে,
দেখা পায় দেবতাদের মহান আকস্মিক মুহূর্তে,
অনুভবে পায় বিশ্বকে তার আপনার বৃহত্তর সত্তারূপে,
দেশ ও কাল হয় তার সুযোগ
সত্তার উচল এবং অতলকে সংযুক্ত করবার জন্য জ্যোতির মধ্যে,
হৃদয়ের গুহাগর্ভে গোপনে তার কথা হয় ভগবানের সঙ্গে।
কিন্তু এসব হল স্পর্শমাত্র সমুচ্চ মুহূর্তসব সাক্ষাৎ অনুভূত ;

পরম সত্যের ভগ্ন অংশ কিছু আলোকিত করেছে তার অন্তঃপুরুষকে,
সূর্যকিরণের প্রতিবিম্ব যেন স্থির জলাশয়ে।
অল্পজনে সাহসে ভর করে চেষ্টা করেছে শেষ পরম উত্তরণে
বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসতে ঊর্ধ্বের চোখধাঁধান জ্যোতির সীমানা,
অনুভব করতে মহত্তর বাতাসের প্রশ্বাস এক,
গ্রহণ করতে বৃহত্তর এক সত্তার বাণী
পরিণত হতে তার বিশাল সাক্ষাৎ বোধময় কিরণমালায়।
মনের শিখরে রয়েছে সমুজ্জ্বল তুঙ্গতাসব
অভিষিক্ত তারা অনন্তের জ্যোতিপ্রবাহে,
সত্যের আপন ভবনের পার্শ্ববর্তী এবং অন্তর্বর্তী আবাসসব,
মনের সমুচ্চতর স্থিতিসব, অনের তারা।
মানুষ সেখানে যেতে পারে দর্শনের জন্য, কিন্তু জীবনযাপনের জন্য নয়।
বিশ্বজনীন চিন্তা এক সেখানে প্রসারিত করেছে তার বিপুলতারাজি ;
তার ক্ষুদ্রতম অংশগুলিও এক এক দর্শনশাস্ত্র এখানে
স্পর্ধা জানায় তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিরাটত্ব নিয়ে,
প্রত্যেকটি জাহির করেছে বিশ্বের সর্বজ্ঞানময় পরিকল্পনা এক।
কিন্তু আরও ঊর্ধ্বে উঠে চলতে পারে ঊর্ধ্বগামী আলোক
রয়েছে সব বিপুলপ্রসার দৃষ্টি, রয়েছে শাশ্বত সূর্যমণ্ডলীসব,
অমর দীপ্তির মহাসাগর যত,
বহ্নিময় পর্বতসব—শিখর তাদের স্বর্গ অবধি গিয়ে আক্রমণ করেছে,
সেখানে ভবন হলে সবকিছুই হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ দৃষ্টির উজ্জ্বলন
প্রত্যক্ষ দর্শনের সন্নিদ্ধ শীর্ষ এক মনকে নিয়ে চলে,
চিন্তাধারা পিছনে ধীরে অনুসরণ করে যেন তার সুদীর্ঘ ধূমকেতুপুচ্ছ ;
হৃদয় বহ্নিমান, সমৃদ্ধ দ্রষ্টা,
ইন্দ্রিয়গ্রাম সমৃদ্ধ হয়ে একত্বে পরিণত।
ঊর্ধ্বতম উত্তরণ উঠে যায় এক গভীরতম দৃষ্টিমাঝে
তার সহজাত ব্যোমমণ্ডল খুলে যায় উদার প্রসারে
অন্তর্বোধির বিদ্যুৎমালা সমুজ্জ্বল দল বেঁধে যেন বিচরণ করে সেখানে
আবিষ্কার করে গুপ্ত সত্য যত লুকিয়ে রয়েছে তাদের গুহাগর্ভে,
তার পূর্ণদৃষ্টির অগ্নিময় শাণিত ধারা
কেটে চলে যায় অন্তঃপুরুষের যত দৃঢ়বদ্ধ অজ্ঞাত গোপন স্থান,
পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করে মস্তিষ্ক-গগনের কোণে কোণে,
আলোকিত করে ধরে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কক্ষসব।
তার আবিষ্কারের সূচ্যগ্র বর্শাফলক-আঘাত
ভেদ করে যায় নামের আবরণ, রূপের অবগুণ্ঠন,
উলঙ্গ করে ধরে যা-কিছু রয়েছে তাদের গুপ্ত অন্তরাত্মায়।

চিন্তা সেখানে ধারণ করেছে সাক্ষাৎ-জ্ঞানের সূর্যদীপ্ত নয়ন
বাক্য হয়ে ওঠে বিরাট অনুপ্রেরণাময় কণ্ঠধ্বনি,
প্রবেশ করে গিয়ে দিব্যসত্যের অন্তরতম গোপন কক্ষে,
দীর্ণ করে অবগুণ্ঠন ভগবানের, জীবনের উপর হতে।
তারপরে প্রসারিত সীমাহারা সাত্ত্বের শেষ প্রসার,
অধিমানসের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য,
কালের মধ্যবর্তী রাজ্য শাশ্বতের কিনারায়,
মানুষের অন্তরাত্মা সে বিশাল অভিজ্ঞতা ধারণে অক্ষম
সব এখানে সম্মিলিত হয়েছে হিরণ্ময় আকাশের তলে
যেসব মহাশক্তি বিশ্বকে গড়ে তোলে তারা তাদের যথাযথ স্থান গ্রহণ করেছে
অন্তহীন সম্ভাবনার এই মহর্লোকে।
প্রত্যেক দেবতা সেখান থেকে গড়ে তোলে তার আপন প্রকৃতির জগৎ;
ধারণাসব সেখানে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ওঠে দলভুক্ত সংখ্যাসমষ্টি যেন
চিন্তারাজি ভিড় করে আসে পুঞ্জে পুঞ্জে একটিমাত্র দৃষ্টির আকর্ষণে;
এক দেহ হল সকল কাল, আর মহাকাশ একখানি গ্রন্থ;
সেখানেই দেখা দেয় ভগবানের বিশ্বদৃষ্টি,
সেখানেই সীমানা আরম্ভ অমর মানসের
একই রেখা এখানে সীমারেখা ভাগ করে দেয়, যুক্ত করে দেয় দুটি লোকার্ধ,
ঘিরে তা রয়েছে দেবতাদের কর্মক্ষেত্রকে,
শাশ্বতকে পৃথক করে ঘিরে রাখে মহাকালের শ্রমধাত্রী হতে।
শাশ্বত জ্যোতির এই তার মহিমান্বিত সাম্রাজ্যে
সর্বশাস্তা, তারে শাসন করে না কেহ, পরমসত্য,
সর্বশক্তিময়, সর্বজ্ঞ ও একক,
হিরন্ময় রাজ্যে এক পরিচালনা করে সে তার অপরিমেয় ভবন,
সেখানে অলিন্দ-অভ্যন্তরে শোনে সে পদধ্বনি চলে আসে উঠে
অব্যক্ত হতে, ফিরে যায় না কখনও
যদবধি অজ্ঞাত জ্ঞাত না হয়, মানুষের চোখে ধরা না দেয়।
বিশ্বদৃষ্টির প্রসার এবং প্রজ্বলনের উর্ধ্বে,
বাকদ্বারা চিন্তার নীরবতার উর্ধ্বে,
অমর কৃপাবলীর অরূপ স্রষ্টা,
অনামা, বিভূষিত শুধু ভাগবত নামে,
কালগত নিমেষাবলী পার হয়ে, পার হয়ে কালশূন্যতা,
জগৎজননী আসীন তার জ্যোতির্ময় শান্তির মধ্যে,
ধারণ করে রয়েছেন আপন অঙ্কে সনাতন সন্তানকে,
অপেক্ষায় রয়েছেন যখন সে কথা বলবে নিয়তির সঙ্গে।
সেখানেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ আশার প্রতিমা;

সেখানেই রয়েছে সেই সূর্য সকল অন্ধকার যার অপেক্ষায়,
সেখানেই রয়েছে অক্ষয় সুষমা ;
সৃষ্টির বৈপরীত্য যত উঠে চলে জগৎজননীর অভিমুখে, সব তারা এক সেখানে :
সেখানেই সেই মহাসত্য যার ছিন্ন খণ্ড সব হল সৃষ্টির সত্য যত,
সেই মহাজ্যোতি সৃষ্টির অজ্ঞান যার ছায়া—
অবশেষে সত্য এসে অপহরণ করে এই ছায়া নিজে যা মেলে দিয়েছিল,
এখানেই সেই প্রেম আমাদের হৃদয় যাকে ডেকে নিয়ে আসে সকল দ্বন্দ্ব
নিরাময় করবার জন্য,
সেই মহানন্দ যার জন্য আকুল সৃষ্টির বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাথা যত :
সেখান থেকেই আসে সেই মহিমা যারে দেখা যায় কখনও কখনও পৃথিবীর পরে,
ভগবানের দর্শন মানুষী অন্তরাত্মার কাছে,
সেই সৌন্দর্য সেই স্বপ্ন প্রকৃতির মুখমণ্ডলে এসে যায় যা।
সেখানেই সে-পরমসৌষ্ঠব জন্ম যার শাশ্বতের মধ্যে
যা ডেকে নিয়ে আসে আপনার কাছে সেই মহাসৌষ্ঠব জন্ম যার কালক্রমে,
ভগবানের সত্য অকস্মাৎ এসে পড়ে মানুষী জীবন পরে,
ভগবানের প্রতিরূপ প্রতিগ্রহণ করে সান্তের আকারসব।
সেখানেই হল চিরন্তন জ্যোতির রাজ্য,
সেই হল অমর অতিমানসের লোকসব
সত্য এখানে আবৃত করে রাখে আপন দ্যুতি রহস্যের জালে
তার প্রহেলিকা বিচারবুদ্ধির কাছে অদ্ভুত বস্তু এক
জড় রূপের যে কঠোর গঠন তার মধ্যে,
সেখানে মহারহস্যময়ী রহস্যবর্জিতা জীবন্ত, অনবগুণ্ঠিত তাঁর মুখমণ্ডল,
সেখানেই পরাপ্রকৃতি, সেখানেই বস্তুরাজির সহজ বিধি।
শরীর সেখানে গঠিত চিন্ময়বস্তু দিয়ে,
অনির্বাণ অগ্নির বেদী-প্রস্তর,
কর্ম প্রস্ফুটিত করে চলে অন্তরাত্মার গতিসব,
চিন্তার পদক্ষেপ অভ্রান্ত অব্যভিচারী,
জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন পূজা-অনুষ্ঠান,
পরমোল্লাসের আত্মদান অদ্বিতীয়ের কাছে।
বিশ্বভূত দৃষ্টি, অধ্যাত্ম উপলব্ধি এক
অনুভব করে নিখিল অনন্ত নিবিষ্ট সান্ত রূপের মধ্যে
আর আলোকের স্পন্দিত পুলকের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে
তাই আবিষ্কার করে নিরাকারের সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল,
ক্ষণিকার সত্য মধ্যে, মুহূর্তের অন্তরাত্মায়
আস্বাদন করে সে শাশ্বতের মধু-মদিরা।
চিন্ময় সত্তা সে এক কেহ নয় অথচ অগণিত,

অদ্বিতীয় রহস্যময় অনন্ত পুরুষ সে তার জগতের,
বহুগুণিত করে ধরে সে আপন অগণিত ব্যক্তিরূপকে,
তার যাবতীয় দেহরূপের উপর এঁকে দেয় সে তার দেবত্বের পরিচয়,
আসন গ্রহণ করে প্রত্যেকের মধ্যে অবর, অনন্য।
অচল সে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেক দৈনন্দিন কর্মের পশ্চাতে,
আশ্রয়স্থল যেন গতিধারার এবং দৃশ্যাবলীর,
ধারণ করে রয়েছে সৃষ্টিকে তার শক্তির এবং প্রশান্তির উপরে
আর পরিবর্তনকে অপরিবর্তনীয়ের মৃত্যুহীন স্থিতির উপরে।
কালাতীত দৃষ্টিপাত করে তার চলমান নিমেষমালার আশ্রয়ে,
অনির্বচনীয় পরিধান করেছে বাচনের পোশাক
সেখানে সকল বাক্য গেঁথে তোলা হয় যেন যাদুময় সূত্রসব
চলে তারা সৌন্দর্য ছড়িয়ে, অনুপ্রাণিত করে তাদের দীপ্তি দিয়ে,
প্রত্যেকটি চিন্তা গ্রহণ করে তার যথানির্দিষ্ট স্থান
লিখিত যা বিশ্বের স্মৃতিপটে।
পরম সত্য, বিরাট ব্যক্তিত্বহীন
অভ্রান্তভাবে যথাযোগ্য হয়ে ওঠে কালের এবং ঘটনার সঙ্গে,
তার বস্তুসম্পদ বিশুদ্ধ সুবর্ণ চির-অমলিন
ঢালা হয় পাত্রের আকারে অন্তঃপুরুষের ব্যবহারতরে,
এই সুবর্ণই হয়ে ওঠে মদিরা-ভৃঙ্গার, পুষ্পপাত্র।
সব সেখানে পরম পূর্ণজ্যোতির আবির্ভাব
বিশ্ব-সুষমা প্রত্যেক ঘটনাকে অত্যাশ্চর্য করে ধরে,
বিশ্ব-সৌন্দর্য অলৌকিক সিদ্ধি প্রতিটি আকারে :
বিশ্বানন্দ উদ্বেল করে ধরে উল্লাসে হৃদয়ের স্পন্দন যত,
শুদ্ধ স্বর্গের আনন্দ হল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে।
প্রত্যেক জীব সেখানে পরম-আত্মার অঙ্গ,
অগণিত চিন্তাবিভূষিত বিশ্বসত্তার এক অংশ,
কালাতীত একত্বের অধিকারী সে,
বহুলের মাধুর্য, বিবিধের হর্ষ
শাণিত তীব্র যা অদ্বিতীয়ের অন্তরঙ্গতায়।
কিন্তু কে তোমাকে দেখাবে সত্যের মহিমাময় মুখমণ্ডল ?
আমাদের মানুষীবাক্য ধরে দেয় শুধু ছায়াটি তার।
চিন্তাশক্তির কাছে সে মহাদেবী হল জ্যোতির অচিন্ত্য উল্লাস,
বাচনের কাছে তা হল অনির্বচনীয় বিস্ময়।
হে মৃত্যু, তুমি যদি স্পর্শ কর সেই পরম সত্য
তুমিও তাহলে সহসা হয়ে উঠবে জ্ঞানী, হারিয়ে বসবে তোমার সত্তা।
আমাদের অন্তরাত্মা যদি দেখে, ভালবাসে, আলিঙ্গন করে ভাগবত সত্যকে

তবে তার অসীম দীপ্তি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করবে,
আমাদের সত্তা গড়া হবে ভগবানের রূপ দিয়ে
আর পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে দিব্যজীবন।"
তারপর মৃত্যু এই শেষবার উত্তর দিল সাবিত্রীকে
"পরম সত্য এখানে তার ছায়া যদি অতিক্রম করে গিয়ে থাকে
পূর্ণজ্ঞান হতে, ঊর্ধ্বগামী বিপুল লোকসব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে
তবে কোন্ সেতু পার করে দিতে পারে এই যে গহ্বর সে রেখে গিয়েছে
তাঁর মধ্যে এবং তাঁর সৃষ্ট এই স্বপ্ন-জগতের মধ্যে?
আশা করা যায় কি তাঁকে নীচে নামিয়ে আনতে মানুষের কাছে,
তাকে সম্মত করান যায় কি এই রূঢ় পৃথিবীর পরে চলতে কতাক্ত পদভারে,
ছেড়ে দিয়ে তাঁর অনায়াস মহিমা আর আনন্দ,
তাঁর মহাদ্যুতি অপব্যয় করতে এই মলিন পার্থিব আকাশতলে?
তোমার কি সেই শক্তি আছে, হে শ্রীময়ী মানুষী তনু,
হে অন্তরাত্মা, যে উদ্যম আমার জাল পরিহার করবার জন্য?
কে তুমি তবে লুকিয়ে রয়েছ মানুষী ছদ্মবেশে?
তোমার কণ্ঠে বহন করে অনন্তের ধ্বনি,
পরমজ্ঞান তোমার সঙ্গে, তোমার বাক্যে ফুটে উঠেছে দিব্যসত্য
পরপারের বস্তুরাজির আলো দীপ্ত তোমার নয়নতলে।
কিন্তু কোথায় তোমার সে শক্তি জয় করবে যে মহাকাল আর মৃত্যু?
তুমি পেয়েছ কি ভগবানের শক্তি এখানে গড়ে তুলবে যে স্বর্গের মর্যাদা?
ফলত সত্য আর জ্ঞান হল আলেয়ার আলো
দিব্যজ্ঞান যদি শক্তি না নিয়ে আসে জগৎ পরিবর্তনের জন্য
আর শক্তি যদি না আসে সত্যকে তার অধিকার দেবার জন্য।
অন্ধ শক্তি এক, সত্য নয়, সৃষ্টি করেছে এই অজ্ঞান জগৎ,
অন্ধ শক্তি এক, সত্য নয়, চালিত করে মানুষের জীবন
মহাবল এক, জ্যোতি নয়, যার সহায়ে সমুচ্চ দেববৃন্দ জগৎ শাসন করে;
শক্তি হল ভগবানের বাহু, নিয়তির স্বাক্ষর।
হে মানবী, দাবি যার অমরত্বের,
প্রকাশ কর তোমার শক্তি, মুক্ত করে ধর তোমার অন্তরাত্মার সামর্থ্য,
তবে আমি ফিরে দেব তোমাকে তোমার সত্যবান।
অথবা বিশ্বজননী যদি তোমার সঙ্গে রয়ে থাকেন,
দেখাও তবে তাঁর মুখমণ্ডল আমাকে আমি যাতে পূজা করতে পারি;
মৃত্যুহীন নয়ন যেন চেয়ে দেখে মৃত্যুর নয়নের মধ্যে,
অবিনাশী মহাশক্তি এক স্পর্শ করে যেন পৃথিবীর জড়বস্তুসব
পৃথিবীর মৃত্যুকে যেন পরিণত করে অমর জীবনে।
তবে তো তোমার মৃতজন ফিরে যাবে তোমার কাছে জীবনযাপনের জন্য,

এই যে ভূলুণ্ঠিত পৃথিবী হয়তো তার দৃষ্টি উর্ধ্বে তুলে ধরবে
অনুভব করবে সন্নিকটে তার রয়েছে ভগবানেরই গুপ্ত দেহ,
প্রেম এসে, আনন্দ এসে পলায়মান মহাকালকে অধিকার করবে।"

সাবিত্রী একদৃষ্টিতে চেয়ে রয় মৃত্যুর পরে, উত্তর দেয় না কিছু।
মনে হয় প্রায় যেন তার প্রতীক আকার ধারণ ক'রে
জগতের অন্ধকার নতি স্বীকার করেছে স্বর্গীয় আলোকের কাছে,
ভগবানের কোন প্রয়োজন নাই আর নিশ্চেতনায় আবরণ।
বিপুল রূপান্তর এক নেমে এল সাবিত্রীর পরে।
অন্তর্যামী ভগবানের জ্যোতির্মণ্ডল,
দেবতার যে দীপ্তি সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল করেছিল
তার আভাকে আশ্রয় দিয়েছিল সাবিত্রীর শারীর গৃহতলে,
এখন তা পরিপ্লাবিত চারিদিকে, আকাশবাতাস হয়ে উঠেছে যেন জ্যোতির্ময় মহাসাগর,
পূর্ণ আবির্ভাবের হর্ষলগ্ন মুহূর্তে
অবতারী ভগবান খুলে ফেলে দেয় তার অবগুণ্ঠন।
ক্ষুদ্র মূর্তি এক অনন্তের কোলে
তবু দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হয় যেন সনাতনের আপন ভবন,
যেন বিশ্বের নাভিকেন্দ্র তার আপন অন্তরাত্মা
আর এই বিশাল ব্যোমতল চারিদিকে হল তার বাহ্য পরিধান।
সুদূর স্বর্গের প্রশান্ত শিখর বলয়িত হয়ে
অবতরণ করেছে পৃথিবীর আনত ভঙ্গিমায়,
তার ললাটপ্রসার ধারণ করে সর্বজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি আয়ত গম্বুজ যেন,
তার দুটি নয়ন যেন দুটি তারা বিশ্বের সাক্ষী।
মহাশক্তি সেই শাসন করে তার সত্তার চূড়া হতে,
মহাসান্নিধ্য সেই তার ঘর নিয়েছে কমলের গোপন অঙ্কে,
নেমে এসেছে, অধিকার করেছে তার ভ্রূমধ্য চক্রে
যেখানে মনোময় অধিপতি আসন গ্রহণ করেছেন তাঁর আজ্ঞাক্ষেত্রে ;
সেখানে সমাহিতির আপন প্রতিষ্ঠায় স্থাপিত হয়ে
খুলে ধরে সে মানুষের অলৌকিক তৃতীয় নয়ন,
সেই অদৃশ্যের চক্ষু চেয়ে যে দেখে অদৃশ্যকে,
জ্যোতি যখন মানুষের মস্তিষ্ক ভরে দেয় হিরণ্ময় উল্লাসে,
শাশ্বতের দিব্যজ্ঞান তার স্বেচ্ছাকে চালিত করে
আর চিরন্তন দিব্য-ইচ্ছা মর্ত্য-ইচ্ছাকে অধিকার করে।
হিল্লোলিত হয় তার সঙ্গীত-কণ্ঠের কমলদল,
বাক্যে তার স্পন্দিত হয় অমর বাক্,
জীবনে তার প্রতিধ্বনিত হয় বিশ্ব-পুরুষের পদক্ষেপ

চলেছে যে সার্বভৌম মানসের সঙ্গে সমতা রেখে।
ভগবানের সূর্য যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করে গিয়ে তার
রহস্যময় গুহাগর্ভে
যেখানে লুকিয়ে তার কিরণলেখা দেবতাদের অনুসরণ পরিহার করে,
মহাশক্তি ধীরে প্রবেশ করে গিয়ে তার হৃৎপদ্মের মধ্যে
জাগিয়ে তোলে সেখানে সেই মহাবল নিয়তিকে যে পরিবর্তন করে।
প্রবাহ তার প্রবেশ করে গিয়ে নাভিকমলের গভীরে,
আশ্রয় গ্রহণ করে নিম্ন প্রাণপ্রকৃতির ক্ষুদ্র গূঢ়কোণে,
দেহের আকাঙ্ক্ষারাজির আশ্রয়ে নন্দনের রক্তকুসুম ফুটে ওঠে
কামনা হয়ে ওঠে শুদ্ধ স্বর্গের অগ্নিশিখা।
দ্বার ভেঙে প্রবেশ করে সে অবশেষে সেই কন্দরে যেখানে বলয়িত কুলকুণ্ডলিনী প্রসুপ্ত
হানে আঘাত সহস্রশীর্ষ অহিশক্তির উপরে
প্রজ্বলিত হয়ে উঠে চলে ঊর্ধ্বে আলিঙ্গন করে গিয়ে পরমবিশ্বপুরুষকে,
বুক জড়কে যুক্ত করে দেয় চিন্ময়পুরুষের স্তব্ধতার সঙ্গে
আর পৃথিবীর কর্মাবলী সব তবে দেয় চিন্ময় পুরুষের নীরব সার্থক্য দিয়ে।
রূপান্তরিত সাবিত্রী অপেক্ষায় রয় আপন কণ্ঠে মহাবাক্যের আবির্ভাবতরে।
শাশ্বত একদৃষ্টিতে চেয়ে রয় মৃত্যুর নয়নের দিকে,
অন্ধকারের নয়নে জাগে ভগবানের জাগ্রত বস্তুসত্য।
তখন শোনা গেল কণ্ঠে এক মনে হয় যেন স্বয়ং স্তব্ধতা
অথবা অনন্তের মৃদুমন্দ প্রশান্ত বাচন
যখন সে কথা বলে নীরবতার সঙ্গে সৃষ্টির হৃৎকম্পরে।
"স্বাগত তোমায় হে মৃত্যু সর্বশক্তিময় ও সর্ববিজয়ী,
মহিমাময় তন্দ্রিা তুমি অনন্তের।
হে মহাশূন্য, তুমি পণ করে দাও সকলের জন্য মুক্তি হয়ে উঠতে,
বুভুক্ষা তুমি দন্তে তোমার ক্ষয় করে চল বিশ্বকে,
আত্মসাৎ করে ধর যত সূর্যের হিমশীতল উচ্ছিষ্ট
সমগ্র বিশ্ব গলাধঃকরণ কর তোমার বহ্নিমান কবলে,
যথেচ্ছ অপচয় করে চল সেই শক্তি তারকামণ্ডলী সৃষ্ট যেখান হতে,
তুমি হলে নিশ্চেতনা, চিন্তাবীজের বাহক তুমি,
নির্জ্ঞান তুমি সর্বজ্ঞান যার গর্ভে নিমজ্জিত সুপ্তিমগ্ন—
ধীরে ক্রম-উদ্ভব হয়েছে তার সেই রিক্ত বক্ষতলে
গ্রহণ করেছে উজ্জ্বল অজ্ঞানের মনোময় মুখোশ।
ছায়া তুমি আমার, আমার হাতের যন্ত্র।
আমিই তোমাকে দিয়েছি এই বিকট ভয়াবহ রূপ
দিয়েছি তোমাকে এই শাণিত তরবারি ভীতির, শোকের, বেদনার
মানুষের অন্তরাত্মা বাধ্য হয় যেন, চেষ্টা করে যেন আলোকের তরে

তার এই ক্ষণস্থায়ী অর্ধচেতন দিবসগুলির আশ্রয়ে।
তুমি হলে তার সেই অঙ্কুশ তার কর্নধারায় উঠে চলতে মহত্বের দিকে,
সেই কষাঘাত জাগে যাতে তার আস্পৃহা শাশ্বত সুখের তরে,
অমরত্বের অনুভব করে মর্মস্পর্শী তীব্র প্রয়োজন।
হে মৃত্যু, আরো কিছুকাল রয়ে যাও, আমার যন্ত্র হয়ে চল।
একদিন মানুষও জানবে তোমার অতল হৃদয়-রহস্য
বিরাজে যেখানে নীরবতা আর গহন রজনীর সমাধিত শান্তি,
মহান আনুগত্য তুমি শাশ্বত বিধানের,
তোমার দৃষ্টিতে বিরাজে প্রশান্ত অটল করুণা।
তবে এখন, হে কালাতীত মহাবল, সরে দাঁড়াও তুমি
আমার প্রমূর্ত শক্তির পথ ছেড়ে দাও।
জ্যোতির্ময় দেবতাকে মুক্ত করে দাও তোমার তামস অবগুণ্ঠন হতে;
মুক্ত করে দাও পৃথিবীর সেই জীবকে যার নাম সত্তাবান,
খুলে ধর তোমার মুষ্টি বেদনার আর অজ্ঞানের
সে যাতে উঠে আসে তার জীবনের আর নিয়তির অধীশ্বর হয়ে,
মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ভগবানের ভবনে,
প্রজ্ঞার সহচর, অর্ধাঙ্গী মহাজ্যোতির,
শাশ্বত জায়ার শাশ্বত পতি।"
সাবিত্রীর কথা হল শেষ মৃত্যু অবিশ্বাসী তবু বাধা দিতে চায়,
অন্তরে জানে সে তবুও চায় না জানতে,
অন্তরে দেখে সে তবুও দেখবে না সে।
অটল সে দাঁড়িয়ে আপন অধিকার দাবি করে।
অন্তঃপুরুষ তার অবনত; কিন্তু ইচ্ছাশক্তি মেনে চলে তার প্রকৃতির আপন ধর্ম
দেবতাদেরও যা মেনে চলতে হয়।
সেদুটিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল মুখোমুখি।
তার সত্তা হল অন্ধকারের বিপুল দুর্গ যেন উঠে চলে স্তম্ভের মত;
তাকে ঘিরে সাবিত্রীর জীবনধারা, মহাসাগরের অবরোধ যেন।
ক্ষণতরে ছায়ামূর্তি জীবন্ত রহে তুচ্ছ করি পরমের বিধান:
সম্মুখে সে আক্রমণ করে, দমিত করে উপর হতে,
সচেতন শক্তির নিরেট পুঞ্জ এক, সহ্য করে চলে সে
ভাগবত বাসনার পীড়ন।
অসহনীয় শক্তির তার
পীড়িত করে তার অনমিত শীর্ষ আর দৃঢ়দৃঢ় বক্ষতল;
জ্যোতির্লেখা সমিদ্ধ জিহ্বা এক লেহন করে নেয় সকল চিন্তা তার,
জ্যোতির্লেখা তপ্ত ক্লেশ হানে বক্ষতলে তার,
জ্যোতির্লেখা, প্রদীপ্ত যন্ত্রণা, বয়ে চলে তার স্নায়ুমণ্ডলীতে;

অন্ধকার তার অস্ফুট আরাবে মুছে যায় সাবিত্রীর প্রজ্বলন্ত আভায়।
সর্বক্ষম বাক্য তার অধিকার করে প্রতিটি অঙ্গ
অবকাশ রাখে নাই কোন ছায়ারাজের বিপুল ইচ্ছাশক্তির তরে
সে-শক্তি যেন দূরে বহিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে অসহায় এক আকাশের কোলে,
পুনঃপ্রবেশের পথ নাই তার, রেখে গেল তারে রিক্ত করে।
আহ্বান করে সে রাত্রিকে, রাত্রিদেবী পশ্চাৎপদ, ভয়ে কম্পমান,
আহ্বান করে সে নরকশক্তিকে, নিরুত্তরে ক্ষোভভরে সে ফিরে যায়:
দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে নিশ্চেতনার অভিমুখে সাহায্যের তরে
জন্ম দিয়েছিল যে তার, তারই আপন বৃহৎ বলপ্রদ সত্তা
সে কিন্তু মৃত্যুরাজকে নিয়ে গেল দূরে অসীম শূন্যতার মাঝে
নিজেই যেন গলাধঃকরণ করতে চায় নিজেকে।
ডাকে সে আপন সামর্থ্যকে, সে-সামর্থ্য দেয় না সাড়া।
আলো তার শরীরকে জারণ করে নিয়েছে, আত্মসাৎ করেছে তার অন্তশ্চেতনাকে,
অবশেষে বুঝল সে পরাজয় অনিবার্য তার,
ত্যাগ করে যায় ক্রমধ্বংসন্তূপ এই যে আকার এতদিন ছিল তার পরিধান,
আশা নাই তার আর মানুষের অন্তরাত্মাকে অধিকার করবে,
অমর আত্মাকে বাধ্য করবে নশ্বর জীব হতে।
দূরে পলাতক এখন সে, সাবিত্রীর ভীতিপূর্ণ স্পর্শ হতে সুদূরে,
আশ্রয় গ্রহণ করে অপসৃয়মান রাত্রিগর্ভে।
সেই প্রতীক জগতের স্বপ্নময় গোধূলিমাঝে
তন্দ্রাবহ সে বিশ্ব-ছায়ানৃতি অদৃশ্য হয়ে
লুপ্ত হয়ে গেল মহাশূন্যমাঝে যেখান হতে এসেছিল ও।
তার আদি উৎসের হেতু বিরহিত হয়ে
গোধূলি রাজ্য সরে গেল মুছে গেল তাদের অন্তরাত্মা হতে,
সত্যবান সাবিত্রী নিঃসঙ্গ এখন।
উভয়েই নিঃস্পন্দ উভয় মূর্তির মাঝখানে দাঁড়াল উঠে
এক নির্বাক অদৃশ্য স্বচ্ছ প্রাচীর।
সেই সুদীর্ঘ রিক্ত মুহূর্তের বিরামমাঝে নিঃস্পন্দ সব
অপেক্ষায় রয়েছে সব অজ্ঞাত অনির্দেশ্য ইচ্ছাশক্তির তরে।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত

দশম পর্ব সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১৫শ সূক্ত

১। বি পাজস্বা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অরীবাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেবহং সুহবস্য প্রণীতৌ ॥১॥

বি (+শোশুচানঃ)—চারিদিকে প্রজ্বলিত হয়ে
পাজস্বা—পুঞ্জীভূত শক্তি নিয়ে, তেজপুঞ্জ নিয়ে
পৃথুনা—বিপুল
শোশুচানঃ (বি+)—চারিদিকে প্রজ্বলিত হয়ে
বাধস্ব—প্রতিহত কর, নিরাকৃত কর
দ্বিষঃ—দ্বেষী আঘাতকারীদের
রক্ষসঃ—শত্রুদের, রাক্ষসদের
অরীবাঃ—আক্রমণকারীদের
সুশর্মণ—পরম প্রশান্তির
বৃহতঃ—বৃহতের
শর্মণি—প্রশান্তির মধ্যে
স্যাম্—যেন বাস করি
অগ্নে—হে অগ্নি
অহম্—আমি
সু-হবস্য—আমাদের আহ্বান যাঁর কাছে অবিলম্বে পৌঁছে যায়, তাঁর
প্র-নীতৌ—(তাঁর) নেতৃত্বে, পরিচালনায়

বিপুল তোমার তেজপুঞ্জ নিয়ে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ চারিদিকে, প্রতিহত কর সেইসব অপশক্তিদের যারা আসে আক্রমণ করতে আঘাত করতে; পরম প্রশান্তিময় বৃহতের প্রশান্তির মধ্যে আমি যেন প্রতিষ্ঠিত হই, হে অগ্নি, আমাদের আহ্বানে অবিলম্বে সাড়া দেন তিনি, পথে তিনি সুষ্ঠু দিশারী ॥১॥

২। ত্বং নো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ত্বং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত ॥২॥

ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
অস্যাঃ—এই
উষসঃ—উষার
বি-উষ্টৌ—উদয়ে

ত্বম্—তুমি
সূরে—সূর্য
উৎ-ইতে—উদিতে, উদিত হলে
বোধি—জাগ্রত হও, জেগে ওঠো
গোপাঃ—রক্ষক
জন্মেব (জন্ম-ইব)—জন্মে যেন
নিত্যম্—চিরন্তন, শাশ্বত
তনয়ম্—সন্তানকে
জুষস্ব—আনন্দ গ্রহণ কর, সুখভোগ কর
স্তোমম্—প্রতিষ্ঠাবন্ত্র
মে—আমার
অগ্নে—হে অগ্নি
তন্বা—শরীরে
সু-জাত—পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছে

তুমি আমাদের এই উষার উদয়ে, সূর্যের উদয়ে তুমি জাগ্রত হও রক্ষক হয়ে ; তোমার সন্তানে, তোমার চিরন্তন জনে যেন সুখী হও তুমি . আমার এই প্রতিষ্ঠাবন্ত্রকে গ্রহণ কর, হে অগ্নি, তোমার দেহে পূর্ণরূপে জন্ম নিয়েছে যে ॥২॥

৩। ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্বীঃ কৃষ্ণাস্বগ্নে অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ কৃধী নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ ॥৩॥

ত্বম্—তুমি
নৃচক্ষা—দেবচক্ষু
বৃষভ—হে পুরুষবর
অনু+পূর্বীঃ—পূর্বগামীনীদের মত
কৃষ্ণাসু—কৃষ্ণবর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন
অগ্নে—হে অগ্নি
অরুষঃ—প্রদীপ্ত
বি+ভাহি—উদ্ভাসিত হয়ে ওঠো
বসো—হে ঋদ্ধিময়
নেষি—নিয়ে চল (আমাদের)
চ—আর
পর্ষি—পার করে দাও
চ—আর, এক
অতি—অতিক্রম করে
অংহঃ—সকল পাপ
কৃধি—কর, গড়ে তোল

নঃ—আমাদের
রায়ে—সম্পদের জন্য
উশিজঃ—আকাঙ্ক্ষী (আমরা), অভীপ্সু
যবিষ্ঠ—হে যুবতম দেবতা

তুমি পুরুষবর, দেবচক্ষু তোমার, অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উদ্ভাসিত হও তুমি, হে অগ্নি, পূর্বগামীদের অনুসরণ করে : হে ঋদ্ধিময়, চালিয়ে নাও আমাদের, নিয়ে যাও পাপের ওপারে, হে যুবতম দেবতা, সম্পদের জন্য আমাদের অভীপ্সু করে তোল ॥৩॥

৪। অষাড়্হো অগ্নে বৃষভো দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সংজিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে ॥৪॥

অষাড়—অজেয়
অগ্নে—হে অগ্নি
বৃষভঃ—পুরুষবর
দিদীহি—দীপ্ত হয়ে ওঠ
পুরঃ—নগর যত
বিশ্বাঃ—সকল
সৌভগা—ভোগসুখ
সন্ + জিগীবান্—অধিকার করে
যজ্ঞস্য—যজ্ঞের
নেতা—নেতা, দিশারী
প্রথমস্য—সর্বপ্রথম
পায়োঃ—রক্ষক
জাতবেদঃ—হে জন্মজ্ঞানী
বৃহতঃ—বৃহৎ
সু-প্রণীতে—হে অভ্রান্ত পরিচালক

অজেয় পুরুষবর, হে অগ্নি, সকল নগর, সকল সুখভোগ অধিকার করে জ্বলে ওঠ তুমি ; রক্ষাকর্তা সুবৃহৎ সর্বপ্রথম যজ্ঞের নেতা তুমি, হে জন্মজ্ঞানী, হে অভ্রান্ত পরিচালক ॥৪॥

৫। অচ্ছিদ্রা শর্ম জরিতঃ পুরূণি দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজমগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে ॥৫॥

অচ্ছিদ্রা—নিশ্ছিদ্র, ছিদ্রশূন্য
শর্ম—প্রশান্তি
জরিতঃ—পূজার জন্য
পুরূণি—বহুল
দেবান্—দেবতাদের
অচ্ছ—অভিমুখে

দীদ্যানঃ—দীপ্ত হয়ে ওঠ
সু-মেধাঃ—মেধাবান
রথঃ—রথের মত
ন—যেন
সঙ্কিঃ—বিজয়ী, সর্বজয়ী
অতি—আমাদের দিকে
বক্ষি—বহন করে আন
বাজম্—প্রাচুর্য, পরিপূর্ণতা
অগ্নে—হে অগ্নি
ত্বম্—তুমি
রোদসী—দ্যুলোক-ভূলোক, লোকদ্বয়
নঃ—আমাদের
সু-বেকে—সুপ্রতিষ্ঠ

হে অগ্নি, পূজার জন্য তুমি, নিশ্ছিদ্র বহন প্রশান্তির আশ্রয়, পূর্ণ মেধাবান প্রজ্বলন্ত দেবতাদের অভিমুখে বিজয়ী রথের মত বয়ে নিয়ে এস প্রাচুর্য, হে অগ্নি, তুমি আমাদের জন্য উভয়লোককে সুপ্রতিষ্ঠ করেছ ॥৫॥

৬। প্র পীপয় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্তস্য দুর্মতিঃ পরিষ্ঠাৎ ॥৬॥

প্র+পীপয়—পরিপুষ্ট কর
বৃষভ—হে পুরুষবর
জিন্ব—প্রেরণ কর, অগ্রসর হও
বাজান্—সব প্রাচুর্য সহ
অগ্নে—হে অগ্নি
ত্বম্—তুমি
রোদসী—দ্যুলোক-ভূলোক, লোকদ্বয়
নঃ—আমাদের
সুদোঘে—সুদুগ্ধবতী গাভী
দেবেভিঃ—দেবতাদের সহ
দেব—দেবতা
সু-রুচা—পূর্ণ দীপ্তিতে
রুচানঃ—প্রদীপ্ত
মা—যেন না (নেতিবাচক)
নঃ—আমাদের

মর্তস্য—মর্ত্যের
দুঃ-মতিঃ—দুর্মতি
পরি + স্তাৎ—ঘিরে ধরে

হে পুরুষবর, আমাদের পরিপুষ্ট কর, আমাদের দিকে নিয়ে এস প্রাচুর্য যত, হে অগ্নি, লোকত্রয়কে তুমি আমাদের জন্য সুদুগ্ধবতী গাভী করে তোল। হে দেবতা, তোমার দীপ্তিতে প্রদীপ্ত দেবতাদের সঙ্গে এস তুমি, মর্ত্যের দুর্মতি আমাদের যেন ঘিরে না ধরে ॥৬॥

৭। (সপ্তম সূক্তে একাদশ ঋক দ্রষ্টব্য)

মায়ের আলাপ

(Les Bases du Yoga, pp. 93-95, ed. Ashram)

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫.

প্রশ্ন : মা, মানুষ ত আদিম কাল থেকেই খেয়ে আসছে, কারণ বাঁচতে গেলে খাবার দরকার হয়। তাহলে খাদ্যের আস্বাদনের কথাটা এল কেন? তার যেটা ভাল লাগে সেটা খায়, যেটা ভাল না লাগে সেটা সে খায় না।

শ্রীমা আমার বিশ্বাস তখনকার আদিম মানুষ প্রায় পশুরই কাছাকাছি ছিল। সে বেশীর ভাগই নিজের সহজাত প্রবৃত্তির বশে জীবন যাপন করত, বুদ্ধি খরচ করে ততটা নয়। তার যখন ক্ষিদে পেত সে খেত, কোন রকম নিয়ম কানুন ছিল না। হয়ত তার মধ্যে আস্বাদনের এবং পছন্দ-অপছন্দর বোধও ছিল। সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে এটা নিশ্চিত যে সে তখন ঢের বেশী স্থূল ভাবেই বাস করত, এখন যেমন মনের এবং প্রাণের চেতনাতে বাস করে তেমনটা বিশেষ করত না।

আদিম মানুষ যে ছিল খুবই স্থূল প্রকৃতির, প্রায় পশুর মতোই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারপর যত শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে লাগল তত প্রথমে একটু একটু করে, ক্রমশ বেশী বেশী তার মধ্যে মনের এবং প্রাণের বিকাশ হতে শুরু করল। আর যত বেশী করে সে মনের এবং প্রাণের মানুষ হয়ে উঠতে লাগল ততই স্বাভাবিক ভাবে তার মধ্যে মার্জিত ভাবের বিকাশ সম্ভব হল এবং বিচারবুদ্ধিও বাড়তে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিকৃতির সম্ভাবনাও দেখা দিতে থাকল। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ-গুলোকে সুশিক্ষিত করে তোলা, যেমন ধর, নানা রকমের সূক্ষ্ম মার্জিত রুচির এবং সামর্থ্যের বিকাশ, বুদ্ধির উৎকর্ষ, রসবোধ, আস্বাদন প্রভৃতির নানা রকম সম্ভবনা, এ সবই হল তার চেতনার যথার্থ বিকাশের এবং উন্নতির লক্ষণ। তেমনি আবার অন্যদিকে হল, নিছক আসক্তি বা পেটুকতা। এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে বইকি।

ধর, খাদ্যবস্তুর আস্বাদন সম্পর্কেই, মানুষ খুব তলিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারে, নানা রকম খাবারের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ আছে,তাছাড়া আস্বাদনের সঙ্গে মন দিয়ে গড়া ধারণার সম্পর্ক রয়েছে। এইসব নিয়ে সে পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যাতে যথার্থ আস্বাদনের অনুভূতি জেগে ওঠে, আর সেটা যে নিছক প্রাণেরই ভাল বা মন্দ লাগার অনুভূতি, তা নয়। এটার সঙ্গে, শুধু লোভে পড়ে খাওয়ার এবং সারাক্ষণ খাদ্য-বিষয় নিয়ে চিন্তা করার একটা আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। পেটুকদের কাছে খাওয়াটাই হল সবচেয়ে বড় কথা, তাদের সমগ্র চিন্তা তাই নিয়েই। তাদের খাওয়াটা খাবার দরকার আছে বলে নয়, তারা খায় বাসনার বশে লোভে পড়ে পেটুকের মত।

সত্যিই যারা নিজেদের আস্বাদনের সামর্থ্যকে বিকাশ করে মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন করতে অভ্যাস করে, তাদের মধ্যে প্রায় কারুরই খাদ্যের প্রতি কোন রকম লোভ থাকে না। কারণ খাবার লোভে পড়ে তারা আস্বাদনের পরীক্ষার কাজ করে না, করে তাদের সূক্ষ্ম রুচির বিকাশের জন্যে, আর সেটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এ যেন ঠিক শিল্পী মতন। যথার্থ শিল্পী

যে, সে তার দৃষ্টিশক্তিকে মার্জিত সূক্ষ্ম করে তোলার সাধনা করে, যাতে বাহ্য প্রকৃতিতে যে সব রঙ, রূপ, রেখা, বস্তুর রচনা কৌশল এবং সামঞ্জস্য পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সে সব দেখে তাদের মর্ম গ্রহণ করতে পারে। কোন বাসনার বশে সে এ কাজ করে না। সে তার সুরুচিবোধের দ্বারা, তার শিক্ষাসংস্কৃতির দ্বারা, তার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তির দ্বারা আর সৌন্দর্য উপভোগের সামর্থ্যের দ্বারা এ কাজ করে। সাধারণত শিল্পীরা, যারা সত্যিকারের শিল্পী, শিল্পকে ভালবাসে, কারণ সৌন্দর্য উপলব্ধিই তাদের জীবনের ব্রত, তারা সৌন্দর্যের চর্চা করে, তেমন লোকেদের সাধারণত বড় বেশী কামনা থাকে না। তাদের জীবন কেবল দৃষ্টিশক্তির বিকাশের জন্যেই নয়, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করাই তাদের জীবনের ব্রত। এই ধরণের লোকের জীবন আর যারা আবেগ উত্তেজনা এবং কামনা বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের জীবনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

সাধারণত সকল শিক্ষা সব সংস্কৃতি সভ্যতার এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির সকল সূক্ষ্ম বোধ, এ সবই হল মানুষের যত সহজ প্রবৃত্তিকে, তার যত কামনা বাসনা এবং আবেগ উত্তেজনাকে আরোগ্য করবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ও সবকে উচ্ছেদ করলেই ব্যাধি মুক্ত হওয়া যায় না। ওদের ভাল করে অনুশীলন করা, বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করা, মার্জিত রুচি সম্পন্ন করা, এই হল ব্যাধিমুক্ত হবার অব্যর্থ উপায়। উন্নতিলাভের এবং বেড়ে ওঠার জন্যে যতদূর সম্ভব বিকাশের সুযোগ দান করা, একটা বিশেষ রকমের সুসঙ্গতি বোধ এবং নিখুঁত দৃষ্টি অর্জন করা, এ হল সভ্যতার সংস্কৃতির এবং শিক্ষার একটা অঙ্গ। তাই যে সব লোক তাদের বুদ্ধির চর্চা করে, শিক্ষালাভ করে, প্রচুর পড়াশুনো করে, চিন্তা করে, বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা করে, অভিনিবিষ্ট হয়ে অনুশীলন করে, তাদের মনের প্রসার বাড়ে, অশিক্ষিতদের চেয়ে তারা ঢের বেশী ব্যাপক হয় আর তাদের বোঝবার উপলব্ধি করবার শক্তি বাড়ে। মন যাদের শিক্ষার সুযোগ পায়নি তারা কয়েকটি ক্ষুদ্র ধারণাকে অবলম্বন করেই জীবন ধারণ করে, যার দরুণ কোন কোন সময় এমন কি তাদের নিজেদের অন্তরেই বিবেকে বাধে, অথচ সেইগুলিই তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ পরিচালিত করে, কারণ ওইগুলিই তাদের একমাত্র সম্বল। আর তারা ভাবে যে, ওইগুলিই হল একমাত্র সত্য ধারণা ওইগুলিকে ধরেই চলা উচিত। ওই সব লোকের প্রকৃতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত গণ্ডীবদ্ধ। অপরপক্ষে যাদের বুদ্ধির উৎকর্ষ হয়েছে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের অন্তত মনের প্রসার বেড়ে যায়, তারা দেখতে শেখে, মতামতগুলোকে যাচাই করতে শেখে এবং তারা বোঝে যে, পৃথিবীতে সকল মতামতেরই স্থান আছে। তাই কয়েকটা সীমাবদ্ধ ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং কেবল সেগুলোকেই সত্যের অদ্বিতীয় প্রকাশরূপ বলে চালাতে যাওয়ার মানে, সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতার এবং হাস্যকরতার পরিচয় দেওয়া।

চেতনাকে আরও উর্ধ্বের বিকাশের জন্যে তৈরী করবার পক্ষে শিক্ষা হল অবশ্যই একটি উৎকৃষ্ট উপায়। অনেকে আছে যাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অপরিণত, অত্যন্ত সাদাসিদে। তাদের হৃদয়ের অভীপ্সা হয়ত খুব বড় রকমের হতে পারে এবং তারা বেশ খানিকটা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভও করতে পারে, কিন্তু ভিত্তিটা তাদের সর্বদাই নিম্নস্তরের থেকে যাবে, আর যেই তারা সাধারণ চেতনাতে নেমে আসে, অমনি তাদের নানা বাধা-

বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, কারণ তাদের আবরণটি অত্যন্ত পাতলা, আর উর্ধ্বের কোন শক্তির অবতরণকে ধারণ করতে পারার মতো তাদের প্রাণে এবং স্থূল চেতনাতে যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান নেই।

লোভে পড়ে এবং পেটুকের মতন খাওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। কিন্তু বিভিন্ন রকমের খাদ্যবস্তুর আস্বাদন পরীক্ষা করা এবং তাদের তুলনা করতে শেখা, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা মেলে তা বোঝা এবং গুণাগুণ উপলব্ধি করা, হল আর এক জিনিস।

আর কোন প্রশ্ন? না, নেই?

প্রশ্ন: মা, আস্বাদনের প্রবৃত্তি কোথা থেকে আসে?

শ্রীমা ও হল ইন্দ্রিয়ের অনুভব করবার শক্তিগুলোর মধ্যে একটি। লোকে বলে, ও হল জিভের অনুভব শক্তি। আমি ঠিক জানিনা। ও হল আস্বাদনের অনুভব শক্তি, যেমন আছে স্পর্শের অনুভব শক্তি। কেমন করে আমরা কোন কোন জিনিস আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করতে পারি? ওখানে যে সব স্নায়ু আছে তাদের কাজ, স্নায়ু আর চেতনা। আস্বাদনের বেলাতেও তেমনি, স্নায়ু আর চেতনা—যা রয়েছে জিভে এবং তালুতে, অর্থাৎ টাকরার মধ্যে।

প্রশ্ন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের জন্যে ত আবার অন্য রকম সব রুচি আছে?

শ্রীমা ওটা কেবল শব্দ প্রয়োগের ব্যাপার...লোকেরা স্পষ্ট করে কিছু বলবার জন্যে শব্দ প্রয়োগ করে, আবার ঘুরিয়ে আলঙ্কারিক অর্থে বলবার জন্যেও করে। খাদ্যবস্তু নয় এমন কোন কোন বিষয়েও বলা হয় লোকটার রুচিবোধ আছে। ও হল আলঙ্কারিক অর্থে বলার ধরন। ওর মানে জিভের রুচি নয়, ওর মানে হল, লোকটা বেশ পরিষ্কার করে এবং বিচক্ষণ ভাবে তাস্বিক করতে জানে, জিভ্ দিয়ে তাস্বিক করে না।

প্রশ্ন উপবাসের দ্বারা কি করে মানুষ গ্রহণ সামর্থ্য লাভ করে?

শ্রীমা ইঁা, তার কারণ, সাধারণত মানুষের প্রাণময় সত্তা দেহের উপর বড় বেশী কেন্দ্রীভূত। তাই দেহটা যখন বেশ ভাল করে খাওয়াদাওয়া করেছে, তখন তার প্রাণ সেই খাদ্যবস্তু থেকে তার শক্তি আহরণ করে, অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে দিয়ে নিজের সক্রিয় শক্তিকে সংগ্রহ করে। এ হল এক রকমের উপায়...স্পষ্টই এটিই প্রায় একমাত্র উপায়, যদিও ঠিক তা নয়, তবে জীবনের বর্তমান অবস্থাতে সব চেয়ে বেশী জরুরী।...কিন্তু এ-হল শক্তিকে শুধে আত্মভূত করে নেওয়ার অতি তামসিক উপায়।

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। যে-প্রাণশক্তি গাছপালার মধ্যে আছে অথবা পশুপক্ষী মধ্যে রয়েছে, এও তাই অর্থাৎ যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে মানুষের ভিতরে যে প্রাণ-শক্তি থাকার কথা এটা তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের বস্তু। কারণ ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ একটু উচ্চ পর্যায়ের জীব। তাই তুমি যদি নিচের দিক থেকে শক্তিকে সংগ্রহ কর, তাহলে সেই সঙ্গে নিচে যে অচেতনতা রয়েছে সেটাকেও তুমি নিতে বাধ্য হও। যখন তুমি খাচ্ছ, তখন তার সঙ্গে বেশ খানকিটা অচেতনাকে আত্মসাৎ না করে তোমার উপায় নেই। সেটাই

তোমার দেহে ভারবোধ আনে, তুমি মোটা, স্থূল হতে থাক। তার উপর যদি আবার খুব বেশী করে খাবার অভ্যাস কর, তাহলে যেটা পেটের মধ্যে গেল তাকে হজম করে দেহের অঙ্গীভূত করতে তোমার অনেকখানি চেতনাই খরচ হয়ে যায়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, যদি না খাও তাহলে তোমার মধ্যে ওই অতখানি অচেতনা হজম করতে এবং রূপান্তরিত করতে আর দরকার হবে না। তাতে করে তোমার বেশ খানিকটা প্রাণশক্তি বেঁচে যাবে। তাছাড়া লুপ্ত জীবনীশক্তিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে সত্তার মধ্যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে বলে, তুমি যদি খাদ্যের ভিতর থেকে সেটাকে সংগ্রহ না কর, অর্থাৎ নিচের দিক থেকে যদি পূরণ না কর, তাহলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তুমি বিশ্ব-প্রাণশক্তিদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে এক করে দিয়ে, তাদের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে, কারণ তারা হল অবাধযুক্ত। আর তাদের যদি আত্মসাৎ করবার কৌশল তোমার জানা থাকে, তাহলে সরাসরি তুমি তাদের টেনে নিতে পারবে, আর যত চাও তত পাবে। কারণ ওখানে তা অপরিমেয়।

এ তোমার দেহের পরিপাক যন্ত্রের কাজ নয়, যে কেবল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যই হজম করতে পারে, কাজে কাজেই তুমি তার চেয়ে বেশী জীবনীশক্তি সংগ্রহ করতে পারনা। আর যে খাদ্য তুমি খাও তা কেবল যৎসামান্য প্রাণশক্তিই যোগান দিতে পারে। বুঝতেই পারছ, খাদ্যবস্তু গলধঃকরণ করা, তারপর পাকস্থলীতে তাকে জীর্ণ করা প্রভৃতি এতসব কাজের পর, কতটুকুই বা জীবনীশক্তি তোমার জন্যে বাকী থাকে? বিশেষ কিছুই নয়। অথচ তুমি যদি এইভাবে নিতে শেখ...আর এ-ও হল একরকমের সহজাতবৃত্তি, তুমি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিশ্বশক্তির ভাণ্ডার থেকে জীবনীশক্তিকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারবে। বিশ্ব-ময় পরিব্যাপ্ত যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি রয়েছে, তুমি তাকে অবাধে সংগ্রহ করতে পারবে... যতক্ষণ তোমার সামর্থ্যে কুলোয় তুমি সে শক্তিকে আকর্ষণ করে নিজের মধ্যে ভরে নিতে পারবে।—যেই নিচের দিক থেকে আর রসদ মিলছে না, খাদ্যবস্তুর মধ্যে দিয়ে যেটা আসত সেটা আর তুমি পাচ্ছ না, তখন বাইরে থেকে সে শক্তিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তুমি প্রয়োজনমত ক্রিয়া শুরু করে দাও, আর তোমার সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটা, কখন বা তার চেয়েও বেশী তুমি টেনে নিতে পার, তখন তুমি বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠ। সে সময়ে তোমার দেহটি যদি খুব মজবুত হয় আর যদি কিছুদিন ধরে খাবার না খেয়েও তুমি কোন রকম অসুবিধা বোধ না কর, তাহলে তুমি দেহের সাম্য অবস্থা বজায় রাখতে পারবে এবং ওই শক্তিগুলিকে তখন নানা রকমের কাজে প্রয়োগ করতে পারবে, যেমন ধর, উন্নতি লাভের ব্যাপারে আরও বেশী করে সচেতন হতে পারবে, তোমার প্রকৃতিকে বদলাতে পারবে, ইত্যাদি। কিন্তু তোমার দেহে যদি জীবনীশক্তির সম্বল প্রচুর না থাকে, আর যদি উপবাসের দরুণ দেহটি রীতিমতো দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু দেহের সাম্য অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। বিশ্বশক্তি থেকে তুমি যেটা টেনে নিচ্ছ, তার প্রচণ্ড বেগকে ধারণ করতে পারা তোমার দেহের সামর্থ্যে কুলবে না। তার দরুণ তোমার মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তুমি তোমার ভারসাম্য অবস্থা হারিয়ে ফেলবে, এবং সকল শক্তির সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যাবে, আর তেমন অবস্থায় তোমার কত কি দুর্যোগ ঘটতে পারে। যে ভাবেই হোক, তুমি নিজের উপর অনেকখানি কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে, আর সাধারণত তেমন অবস্থায় তুমি একটুতেই বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকবে এবং সেই উত্তেজনাকে খুব একটা উচ্চ অবস্থা

বলে ধরে নেবে। কিন্তু আসলে ওটা প্রায়ই ভিতরকার একটা চলতির অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ এর দ্বারা তোমার গ্রহণ সামর্থ্য খুব বেড়ে যাবে। যেমন ধর, তুমি যদি উপবাস কর এবং তার দরুণ নিচের দিক থেকে আর শক্তি সংগ্রহ না কর, তখন যদি একটা সুগন্ধি ফুলের ঘ্রাণ নাও, সেটাই তোমাকে পুষ্টি দান করবে। সুগন্ধ তোমাকে পুষ্ট করে, তোমাকে প্রচুর জীবনীশক্তি দান করে, অথচ ওই অবস্থায় না হলে তুমি তা বুঝতেই পার না।

ও অবস্থায় কতকগুলো কর্মদক্ষতা খুব তীব্রভাবে বেড়ে যায়, আর মানুষ সেটাকে আধ্যাত্মিক পরিণতি বলে ধরে নেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তার বিশেষ কোনই সম্বন্ধ নেই। কেবল এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, যেমন অনেকে আছে যারা প্রচুর খায়, এবং খাদ্য ব্যাপার নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামায় যে তাতেই তারা মশ্‌গুল, তারপর যখন পরিতোষ সহকারে উদরপূর্তি করেছে তখন, যে কথা তোমাদের এইমাত্র বললাম, সেটা তাদের হজম করতে হবে ত, তখন তাদের সমগ্র শক্তিই ওইখানে কেন্দ্রীভূত হয় খাদ্য পরিপাক করবার জন্যে—ওই সব লোক মনের দিক থেকে বড়ই তামসিক, আর সেটা তাদের বড় বেশী নিচের দিকে টানে। তাই তারা যদি খাওয়া বন্ধ করে আর সেই সঙ্গে ও বিষয়ে চিন্তা না করে... কারণ এখানে আবার একটি ব্যাপার আছে, কেউ যদি উপবাস করে আর সারাক্ষণ ভাবতে থাকে তার কিদে পেয়েছে, সে খেতে পেলে খুশি হবে, তাহলে সেটা হবে দশগুণ বেশী ক্ষতিকারক, তার চেয়ে খাওয়া ভাল, কিন্তু যথার্থই কেউ যদি উপবাস করতে পারে, কারণ সে অন্য বিষয় চিন্তা করে, অন্য কাজ করে, খাবার ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ নেই, তেমনটা হলে, সেটা তোমাকে চেতনার আর এক ধাপ উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করতে পারে, ব্যবহারিক স্থূল যত জিনিসের প্রতি দাসত্ব থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু উপবাসে যাদের বিশ্বাস আছে, উপবাস করাটা বিশেষ করে তাদের পক্ষেই লাভজনক—যেমন সকল কিছুর বেলাতেই তাই। যদি বিশ্বাস থাকে যে উপবাসের দ্বারা তুমি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, তুমি তক্ষি লাভ করবে, তাহলে উপবাস করলে তোমার ভালই হবে। কিন্তু যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে উপবাস করে বিশেষ কিছুই হবে না, বরং রোগা হয়ে যাবে।

বোধহয় "মেটারলিঙ্ক"-ই (Materlink) তোমরা মেটারলিঙ্কের কোন বইয়ের নাম শুনেছ? হয়ত তোমরা পড়েও থাকবে, তাঁর "নীলপাখি" (l'Oiscau bleu) প্রভৃতি বই সব। ভদ্রলোক দেখতে বেশ একটু গোলগাল, নাদুস্-নুদুস ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল সত্যিকারের সৌন্দর্যবোধ। তাই অতখানি মেদবহুল হওয়াতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন তিনি ঠিক করলেন, সপ্তাহে একদিন করে উপবাস দেবেন। সেই থেকে সপ্তাহে একদিন তিনি খেতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাকে বলে, তাই খাবার কথা তিনি মনেই আনতেন না এবং ওই দিনটাতে খুব করে লেখাপড়ার কাজ করতেন। ফলে, তাঁর চেহারা দিব্যি বানানসই এবং সুন্দর হয়ে উঠল। সেদিক থেকে দেখলে, তাঁর বেলাতে উপবাসের দ্বারা তিনি খুবই উপকৃত হয়েছিলেন।

কেউ যদি না খায়, সে রোগা হয়ে যায়, এ একেবারে সুনিশ্চিত। তাই যে ভীষণ মোটা সে যদি রোগা হতে চায় তার পক্ষে এটা খুব ভাল উপায়। কিন্তু তাই বলে সারাদিন খাবার

কথা ভেবে কাটানো চলবে না। কারণ তা হলে, যেই উপবাস ভঙ্গ করবে, অমনি সে খেতে ছুটবে, আর এত বেশী খাবে যে, না খেয়ে যেটা হারিয়েছিল সেটা আবার পুষিয়ে নেবে। যথার্থত সব চেয়ে ভাল হবে, ও-সম্বন্ধে চিন্তা না করা। এমনভাবে কাজকর্মের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে জীবনের সব কিছুই আপনা থেকে কলের মতন হয়ে চলবে, খাবার বিষয় ভাবতেই হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে খাবে, ঠিক যতটা দরকার ততটা খাবে, যখন খাচ্ছ তখন ও বিষয়ে চিন্তা করারই দরকার নেই। খুব শান্তভাবে খাবে, মাত্র এইটুকুই মনে রাখবে, বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবে নিবিষ্টচিত্তে খাবে, আর যখন খাবার সময় নয়, তখন ও সম্বন্ধে কখন চিন্তা করবে না। কখন বেশী খাবে না, কারণ তাহলে আবার হজম করবার কথা ভাবতে হবে। সেটা তোমার পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার হবে, আর তাতে তোমার প্রচুর সময় নষ্ট হবে। ঠিক যেটুকু দরকার কেবল সেইটুকুই খাবে...খাবার প্রতি কোন রকম লোভ যেন না থাকে, প্রাণের যত রকমের খেয়াল, বিশেষ কোন রকমের আকর্ষণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। কারণ, যখন দেহের প্রয়োজন আছে বলেই খাচ্ছ, তখন দেহই তোমাকে একেবারে নিখুঁতভাবে ঠিকঠিক বলে দেবে, "আর দরকার নেই।" যখন প্রাণের বাসনা অথবা মনের ধারণার দ্বারা পরিচালিত না হও, তখন দেহের নির্দেশ একেবারে নির্ভুল ভাবে ধরতে পারবে। দেহ ঠিক বলবে, "এইবার যথেষ্ট হয়েছে, আর চাই না।" ঠিক তখনই থামতে হবে। যেই তোমার মধ্যে কতকগুলো ধারণা বা প্রাণের যত সব বাসনা সক্রিয় হয়ে উঠবে, যেমন ধর, বিশেষ কোন একটা জিনিস তোমার খেতে খুব ভাল লাগে...আর ভাল লাগে বলেই, তুমি তিনগুণ বেশী খেয়ে ফেললে...অবশ্য ওভাবে কতকটা পরিমাণে তোমার লোভ মেরে যেতে পারে, কারণ তোমার হজম-শক্তি যদি দস্তুর মতো জোরালো না হয়, তাহলে অতখানি খাবার পরে তোমার বদহজম হবে, তারপর থেকে ও জিনিসটার প্রতি তোমার বিতৃষ্ণার ভাব এসে যাবে, কারণ ওটাতেই ত তোমার পেটখারাপ করেছিল। যাই হোক, ওগুলো হল একটু কঠোর পন্থা। ওসবের সাহায্য না নিয়েও মানুষ উন্নতির পথে এগুতে পারে। শ্রেষ্ঠ উপায় হল, ও বিষয় একেবারেই চিন্তা না করা।

অবশ্য একথা সত্যি যে কেউ কেউ আছে যারা নিজেদের এবং অন্যদের জন্যে রান্না করে। তাই ও বিষয়ে তাদের চিন্তা না করে উপায় নেই। কিন্তু সেটাকে যতদূর সম্ভব কম করা যায়। রান্না করতে করতে ঢের বেশী উপভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারা যায়। সে যাই হোক, ও বিষয়ে যত কম ভাববে তত ভাল হবে। আর যখন ও সম্বন্ধে একেবারেই মাথা ঘামাবে না, না মন দিয়ে না প্রাণ দিয়ে, তখন দেহ সব চেয়ে ভাল নির্দেশ দিতে পারে। যখন তার খিদে পাবে, সে তোমাকে বলবে, যখন একটা বিশেষ কিছু তৈরী করে খাবার দরকার হবে, সে তোমাকে জানাবে। যখন খাওয়া শেষ হবে, আর দরকার নেই, তখন সে-কথা তোমাকে জানাবে। আর যখন একেবারেই খাবার দরকার নেই, তখন সে ওবিষয়ে চিন্তাই করবে না। তখন সে অন্য বিষয় ভাবে। কেবল মানুষের মস্তিষ্কটিই যত নষ্টের গোড়া। যথার্থত মস্তিষ্কই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে, কারণ মানুষ মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে জানে না। জানলে মস্তিষ্কও সুসামঞ্জস্য গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু একটা জিনিস সত্যিই বড় বিস্ময়কর, তা হচ্ছে লোকেরা তাদের কল্পনাশক্তিকে সর্বদা ব্যবহার করে, কেবল যেটা অন্তত শুধু সেই জন্যে। কোন ভাল কিছুর জন্যে লোকেরা তাদের

কল্পনাকে প্রয়োগ করছে—তেমনটা অতিশয় বিরল। কোথায় ভাল কিছু অনুকূল কিছু যেগুলো তোমাকে সাম্য অবস্থা বজায় রাখতে সামঞ্জস্য বিধান করতে সাহায্য করবে, সে গুলোর সম্বন্ধে চিন্তা করবে, তা না করে মানুষ সর্বদাই যত রকমের সম্ভব দুর্যোগের আর আর বিড়ম্বনার কথাই ভাববে। স্বভাবতই সেটার দ্বারা তার সত্তার সাম্য অবস্থা বিগড়ে যায়, তার উপরে আবার যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তার ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে ত কথাই নেই, সে যে সব দুর্যোগকে ভয় করে সেইগুলোকেই ডেকে আনে।

যাক, তাহলে এই শেষ? আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই ত?

বেশ, তাহলে এস আজ, বাছাধনরা।

আত্ম-সংসিদ্ধি

অরবিন্দ বসু

শ্রীঅরবিন্দের 'যোগসমন্বয়' গ্রন্থের একটি অংশ হলো 'আত্ম-সংসিদ্ধির যোগ'। কোনও মানুষের যদি কোনও লক্ষ্য থাকে, তা পাবার জন্য সে প্রচেষ্টা করে, ও তা পেলে বলা হয় যে সে সিদ্ধিলাভ করেছে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হলে সিদ্ধি হ'ল। সংসিদ্ধি হবে সম্যক সিদ্ধি, সম্পূর্ণ সিদ্ধি। যারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁরা আত্মা কি,—সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে সেই জ্ঞান লাভ করলে জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হলেন। ভক্ত ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভক্তি লাভ করবার জন্য সাধনা করেন আত্মসমর্পণের। সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলে, ভগবানের সঙ্গে মিলন হলে, তিনি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হলেন। চরাচর বিশ্বের প্রভু, যাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জগৎ পরিচালিত, কর্মযোগীর সাধনার লক্ষ্য। কর্মযোগী ফলের কামনা ত্যাগ করে ও তা ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে, ক্রমশঃ তার আত্মা যে কর্তা নয়, প্রকৃতি সব কর্মের কর্ত্রী, তা জেনে ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র হয়ে নিঃস্বার্থ কর্ম করেন। যখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আশ্রিত হয়ে প্রভুর ইচ্ছা সম্পূর্ণ করার জন্যই কর্ম করেন, তখন তিনি হ'য়ে ওঠেন সিদ্ধ কর্মযোগী।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা কর্মযোগের শাস্ত্র। সেই মহান গ্রন্থে দেখান হয়েছে যে বাস্তবিক যোগ একটি অখণ্ড পন্থা, গীতার যোগে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সেই সুবিস্তৃত পন্থার অন্তর্গত। এই যোগ এক হিসাবে সমন্বয়ের যোগ যার সিদ্ধি সংসিদ্ধি বলে বর্ণিত হবার যোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনার একটি নূতন লক্ষ্য সাধকের কাছে উপস্থিত করেছেন। গীতার যোগকে সমন্বয়াত্মক বলেও শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে গীতার মধ্যে মানুষের অবরসত্তার,—তার শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক প্রকৃতির,—রূপান্তরের আদর্শ নেই। অপরাপ্রকৃতি যে পরাপ্রকৃতির ছাঁচে গড়ে উঠতে পারে, শরীর, প্রাণ, মন যে আত্মাকে আচ্ছন্ন না রেখে, এখন যেমন অবস্থা আছে তার আমূল পরিবর্তন করে আত্মাকে সম্পূর্ণ প্রকট করতে পারে, এই নূতন লক্ষ্য শ্রীঅরবিন্দ জগতে প্রচার করেছেন। এইভাবে আত্মাকে প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত করতে হ'লে চাই শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন প্রকৃতির রূপান্তর। শ্রীঅরবিন্দ যে আত্ম-সংসিদ্ধির যোগের কথা বলেন, তার তাৎপর্য হল শুধু আত্মার মুক্তি নয় বা ভগবদ্-লাভ নয়, কিন্তু প্রকৃতির পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর।

প্রশ্ন হ'লো, সংসিদ্ধি কার? শ্রীঅরবিন্দ যাকে জীবাত্মা বলেন, সংসিদ্ধি তার প্রয়োজন নয়, কারণ জীবাত্মা স্বভাবতঃই সর্বদা সংসিদ্ধ। অহঙ্কার সংসিদ্ধির অধিকারী নয়। কারণ অহঙ্কার হলো নিম্ন প্রকৃতির একটি যন্ত্র ও আত্মার মুক্তিলাভ হলে তার আর অস্তিত্বই থাকেনা। তাহলে সংসিদ্ধি কার? শ্রীঅরবিন্দের উত্তর—প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তনশীল গতির মধ্যে অভিব্যক্ত আত্মার,* যা মূল স্বভাবে দিব্য কিন্তু এখন প্রকৃতির জালে বদ্ধ ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অদিব্য।

---

* The divine manifested in the movements of nature. *The Hour of God*, 1973, p. 20.

মানুষের সত্তা খুবই জটিল। প্রাচীন পরিভাষা অনুসরণ করে আমরা মানুষের সত্তাকে দুটি প্রধান তত্ত্বে ভাগ করতে পারি। তাদের নাম হল পুরুষ ও প্রকৃতি। মোটামুটি বলা যায় পুরুষ হলো আমাদের মধ্যে চৈতন্য আর প্রকৃতি হ'ল অচৈতন্য সক্রিয় শক্তি। একথা বলে রাখা ভাল যে শ্রীঅরবিন্দ পুরুষ ও প্রকৃতির এই অন্তিম ভেদ স্বীকার করেন না। যদিও একটা স্তরে এই ভেদ আছে, তবুও মানুষের চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায় ও দেখা যায় প্রকৃতি পুরুষের বিরোধী তত্ত্ব নয়, বরং পুরুষের নিজেরই চৈতন্যময়ী শক্তি। কিন্তু সে আলোচনা পরে হবে। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের লেখা কিছু পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে শ্রীঅরবিন্দ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অবতরণের কথা বলেছেন। অবতরণ মানে আর কিছুই নয়, তা হলো চৈতন্যের নিজেকে ক্রমশঃ ঢেলে ফেলে জড়রূপে প্রতিভাত হওয়া। কিন্তু এই জড়ের মধ্যে চৈতন্য লুকিয়ে আছে ও তার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করছে। দার্শনিক ভাষায় এর নাম হলো চৈতন্যের উত্তরণ। এই উত্তরণের বা চেতনার ফুটে ওঠার ক্রমে যে-চেতনা জড়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, তার যেন একটা বিন্দু বা আকার গড়ে ওঠে। এইটি যখন এক বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছায় তখন তাকে বলা চলে দিব্য আত্মা বা পুরুষ বটে কিন্তু প্রকৃতিতে গতির অধীন। তার সার বা মূল স্বভাব এসেছে ভগবানের থেকে কিন্তু সে সবল নয়, প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নিজের স্বরূপ রক্ষা করতে সমর্থ নয়। প্রথমতঃ তাকে উপলব্ধি করতে হবে তার আত্মজ্ঞান, পরমতত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধের সাক্ষাৎবোধ বা ভগবদ্-উপলব্ধি। এটি হবে প্রকৃতির থেকে পুরুষের নিজেকে আলাদা করে নেওয়া। ফলে, এখন আর তার সত্তা প্রকৃতির অধীন নয় কিন্তু স্বাধীন। অবশ্যই সে পরমাত্মার সঙ্গে তার অভেদত্ব উপলব্ধি করতে পারে। অথবা পরমাত্মার আরেকটি দিক, যাকে শ্রীঅরবিন্দ পরমেশ্বর বা ভগবান বলেন, তার সঙ্গে নিবিড় ঐক্য অনুভব করতে পারে। আবার সর্বলোক মহেশ্বরের ভাগবতী ইচ্ছার যন্ত্র হয়ে এই বিশ্বে তাঁর বিহিত 'কর্তব্যকর্ম' করতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির থেকে মুক্ত পুরুষের বা আত্মার পরমতত্ত্বের সঙ্গে নানারকম সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। 'স্থাপন করা যায়' বলা যায় সাধনার অবস্থায়। আসলে এই সম্বন্ধগুলি নিত্যসিদ্ধ ও সাধকের উপলব্ধির গভীরতা ও বিস্তৃতির ফলে অনুভূত হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান আত্মা, যা তার স্বরূপে দিব্য বলা হয়েছে কিন্তু যা জগতে নানারকম সীমার দ্বারা বদ্ধ হয়ে অদিব্য হয়ে রয়েছে, মানুষের প্রকৃতির নানা তত্ত্বের যে কোনও একটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে নিজেকে তাই বলে বোধ করতে পারে; শরীর, প্রাণ, মন বা অহঙ্কারের সঙ্গে আত্মা নিজেকে এক করে নেয়। বলা বাহুল্য, এ হলো অজ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃতির গতির মধ্যে যে আত্মা এসেছে ও রয়েছে তার নিজের স্বরূপ ফিরে পাওয়ার অভিযানের এই হল কার্যক্রম। এখানে বলা ভাল যে এই প্রসঙ্গে আমরা আত্মা শব্দটি মুক্ত আত্মার অর্থে ব্যবহার করছি না, এই শব্দটির উপযোগ আমরা করছি চৈতন্য এই অর্থে। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যই স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বা পরমতত্ত্ব, চৈতন্যই বা চিৎ-ই সৎ। কিন্তু চৈতন্য স্বরূপে যা আর প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ চৈতন্য যা, সে দুটি এক হ'য়েও এক নয়। স্বরূপে চৈতন্য শুদ্ধ ও মুক্ত, প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্য অশুদ্ধ ও বদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্য ক্রমশঃ শুদ্ধ হচ্ছে, হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে মুক্ত। প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ চৈতন্যেরই

প্রয়োজন আত্মসংসিদ্ধি। প্রথম প্রয়োজন প্রকৃতির থেকে মুক্ত হওয়া। তার মানে প্রকৃতির কোনও তত্ত্বের সঙ্গে—শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এদের সঙ্গে—চৈতন্যের ভ্রান্ত একত্বের বোধ অতিক্রম করে চৈতন্যের নিজেকে চৈতন্য বলে জানা। অন্য কথায় বলা যায় যে ব্যষ্টি আত্মার নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ আত্মস্বরূপের সঙ্গে মিলনের রস আস্বাদন করার জন্য পরম এক বিশ্বে বহু হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—"We may...say in a sense, that it is to have this joy of union as the ultimate crown of all the varied experiences of spiritual rélation between the individual soul and God that the One became many in the universe.*

বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে ব্যষ্টিআত্মা চরমে যে-অনুভূতি লাভ করে তা হলো ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতা। তার ফলে সমস্ত প্রপঞ্চ মিথ্যা বলে প্রতীত হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন জ্ঞানযোগে এই ফল অনিবার্য নয়। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার অনুভব হবার পরে জগতের সমস্ত বস্তুতেই এই একই ব্রহ্মের অনুভব হতে পারে, শুধু নিজের সত্তায় নয়, সকল জীবনের মধ্যেই একই মূল পরমসত্তার উপলব্ধি প্রাপ্য। দেখা যেতে পারে যে প্রপঞ্চ দিব্যচেতনার লীলা, তার স্বভাবের বিরোধী নয়। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর অনুভব লাভ করা যায়, দেখা যেতে পারে যে সমস্ত ক্রিয়াই, এমন কি যা সবচেয়ে ইহলৌকিক বলে মনে হয় তাও দিব্যচেতনারই কর্ম, সেই ক্রিয়াবলীর উপযোগ করা যায় সকল জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্যকে, ব্রহ্মকে, তার নিজের স্বরূপে আর এই বিশ্বে তার সকল প্রতীকের মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভব করার জন্য। জ্ঞানযোগের এই বিস্তৃততর প্রণালী মানুষের জ্ঞানৈষণাকে একটা উচ্চতর দিব্যস্তরে উন্নীত করতে পারে।

ভক্তিযোগের লক্ষ্য ভগবানকে পরমপ্রেমাস্পদরূপে ভক্তি করা ও ভালবাসা ও তার ফলে দিব্যপ্রেম ও দিব্যআনন্দের আস্বাদন করা। এখানে ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তির সত্তামাত্র নয়, তিনি পরমপুরুষরূপে ভক্তের কাছে ধরা দেন। মানুষের হৃদয়ের সব ভাব ও আবেগকে আত্মিক প্রেমের একমাত্র পাত্র ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের যত রকম সম্বন্ধ হ'তে পারে,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি—তার সবগুলিই শুদ্ধ করা ও এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হ'ল ভক্তিযোগের প্রাণ। শেষপর্যন্ত ভক্তিযোগ ভক্ত ভগবান এই দুজনের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়, এ জগতের ওপরে ভাগবতধামে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই যত অনুভূতি ভক্তিযোগের অনিবার্য ফল নয়। তিনি বলেন যে ভক্তিযোগের মধ্যেই এই সীমিত ঝোঁকের সংশোধন আছে। পরমপ্রিয়কে সকল জীবের মধ্যে প্রেমাস্পদরূপে অনুভব করা, শুধু ভগবানের মধ্যেই নয় কিন্তু ভক্তদের সকলের মধ্যে ভক্তির প্রাকৃতিক বিস্তার করে সমবেতভাবে দিব্যপ্রেম ও আনন্দের আস্বাদন পাওয়া ভক্তিযোগের ফল হতে পারে। ভক্তি-যোগের সাধনার এই বিস্তৃতির ফলে মানুষের সমস্ত ভাব ও আবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সৌন্দর্য-

* The Synthesis of Yoga, Chap. The Mystery of Love, p. 572. Sri Aurobindo Ashram, May 1971.

বোধকে একটি উচ্চতর দিব্যস্তরে উন্নীত করা যায়, বিশ্বে প্রেম ও আনন্দের জন্য যে-এষণা আছে তা আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারে।

কর্মযোগ নির্ভর করে দিব্যশক্তির কাছে মানুষের সকল কর্ম উৎসর্গ করে দেওয়ার ওপর। নিবেদিত কর্ম হয়ে ওঠে প্রপঞ্চ থেকে আত্মার মুক্তির উপায়। কিন্তু এখানেও বিশ্ব অতিক্রম করে পরমের যে স্বরূপ আছে, তারই সঙ্গে মিলন হ'ল পরমপুরুষার্থ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই পরিণতি অনিবার্য নয়। কর্মযোগের ফল হতে পারে জগতের সকল কর্মের মধ্যে দিব্যশক্তির অনুভব ও বিশ্বের সকল কর্মে যুক্ত ব্যষ্টি আত্মার সচেতন যোগদান। এইভাবে অভ্যাস করলে মানুষের ও তার সকল ক্রিয়া একটা উচ্চতর দিব্যস্তরে উন্নীত হতে পারে, এই বিশ্বে মানুষের সত্তার মধ্যে মুক্তির শক্তি ও সংসিদ্ধির যে-এষণা আছে তাকে আধ্যাত্মিক রূপ দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে প্রকৃতির থেকে স্বাধীন হওয়াও যথেষ্ট নয়। পরমতত্ত্বের সঙ্গে ক্রমশঃ বা যুগপৎ নানাবিধ সম্বন্ধের উপলব্ধি করাও চরমসিদ্ধি নয়। যে-প্রকৃতির থেকে মুক্ত হয়েছে পুরুষ, তাকেও নিজের অধীনে আনতে হবে, হতে হবে তার সম্রাট। তার মানে হল প্রকৃতিকেই চৈতন্যময়ী করে তোলা। প্রকৃতির বিকাশের ক্রমেই অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। 'আমি' বোধ আমাদের সহজাত। সাধকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'লো, আমাদের সত্তার কোন অংশকে 'আমি' বলে বোধ করা হয়। 'আমি' বলতে সাধক বোঝেন কি—শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি বা চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ? যে-সত্তাটি এই নানাতত্ত্বের কোনও একটির সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে রাখে বা এক ব'লে বোধ করে, তা হল প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ অথচ ক্রমশঃ মুক্ত হচ্ছে দিব্যআত্মা যার কথা আগে বলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভগবানের 'আমি'র সঙ্গে যখন সাধকের শুদ্ধ 'আমি' মিলিত হয়, তখন তার স্বরূপের উপলব্ধি। কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে ভগবান যখন জড় হয়েছেন, তাঁর চৈতন্যশক্তি যখন অচৈতন্য প্রকৃতির রূপ নিয়েছেন, তখন শুধু ভগবদ্-উপলব্ধি নয়, যে প্রকৃতিকে অচৈতন্য বলে মনে হয় ভাগবতী শক্তি দিয়ে তাকে পূর্ণভাবে চৈতন্যময়ী করে তোলা হল এই জগতের মধ্যে দিব্য আত্মার সংসিদ্ধির সোপান।

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে চৈত্যপুরুষের, চৈত্যসত্তার প্রসঙ্গ আছে। এই চৈত্যসত্তা চেতনার ক্রমবিকাশের ফল। প্রকৃতিতে বদ্ধ ছিল কিন্তু মুক্ত হচ্ছে যে দিব্যআত্মা, সে তার সংসিদ্ধির পথে চৈত্যপুরুষের সঙ্গে নিজের একাত্মতা বোধ করতে পারে। আবার চৈত্য-কেন্দ্র থেকে উপরের দিকে, বিশ্বের বাইরে ভগবানের দিকে উঠে যেতে পারে। এই ঊর্ধ্বগতির পথে চেতনার অনেকগুলি স্তর আছে—মানুষের সাধারণ মন থেকে আরম্ভ করে অতিমানস পর্যন্ত। বর্তমান দিব্যআত্মার প্রকৃত স্থিতি বিশ্লেষণ পরায়ণ ও যুক্তিমূলক মানুষী মনের উপরে। চিন্তার প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশঃ বেশি মুক্ত আত্মা শুদ্ধ চেতনার বিভিন্ন-স্তরে ভাগবত সত্যের স্পর্শ পেতে পারে, তার চেয়েও নিবিড় ঐক্যে সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। চৈত্যপুরুষ ব্যষ্টিগত, কিন্তু সাধকের প্রয়োজন বিশ্বাত্মক আত্মার উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি হতে পারে উচ্চতর মন থেকে অতিমানস পর্যন্ত যে কোনও স্তরে। যদি অতি-মানস স্তরে উপলব্ধি হয়, তাহলে ব্রহ্মের যে তিনটি দিক প্রধান বলে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—আত্মা, পুরুষ ও ঈশ্বর—সেই তিনটি দিকের যুগপৎ উপলব্ধি হতে পারে। আর লাভ হয়

দিব্যজ্ঞান—যা অখণ্ড ও সম্পূর্ণ—ও দিব্যইচ্ছা—যার সঙ্কল্প ও ক্রিয়া অব্যর্থ, তাদেরও উপলব্ধি নিম্ন প্রকৃতিতে। মন, প্রাণ ও শরীরে অতিমানস জ্ঞান-ইচ্ছা প্রয়োগ করলে তাদের মধ্যে আনা যেতে পারে সম্পূর্ণ রূপান্তর। উপর থেকে অতিমানস চেতনাশক্তিকে নামিয়ে আনা যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক মন, প্রাণ ও দেহে যে অতিমানস লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে তাকে সক্রিয় করা। মানুষের আধারে সুপ্ত নিষ্ক্রিয় অতিমানসকে জাগ্রত ও সক্রিয় করার জন্যে বিজ্ঞানের নিজের ভূমি থেকে তাকে নামিয়ে আনা দরকার। পূর্ণযোগ চেতনার উত্তরণ ও অবতরণ দুয়েরই ওপর নির্ভর করে। এই রূপান্তরের বিষয়টি বিশাল। সংক্ষেপে বলা যায় যে মনের সামর্থ্য জন্মাবে দিব্যসত্যকে অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত করার, সত্যের সমস্ত দিক স্বীকার করার, প্রাণের মধ্যে থাকবে না চাঞ্চল্য, উপশান্ত হবে বাসনার বেগ। সেইরকম প্রাণের মধ্যে জন্মাবে শুদ্ধভোগের সামর্থ্য, শরীরের জড়তার হবে অবসান, তার মূলধাতু পরিণত হবে দিব্যসত্তায়, তার ক্রিয়াবলী পরিচালিত হবে চিৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা। দেহ অতিক্রম করবে জরার, জীর্ণতার ও মৃত্যুর অমোঘ নিয়ম, এখন পর্যন্ত যা তার অনিবার্য নিয়তি।

সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির ভিত্তিতে, আত্মার বিজ্ঞানময়ী অতিমানস শক্তির দ্বারা প্রকৃতির রূপান্তর সম্পন্ন করা হ'ল এই জগতে দিব্য-আত্মার সংসিদ্ধি।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীমায়ের ভাষ্যসহ

৫—মানুষ যদি পলকের জন্য দেখতে পায় কি অসীম ভোগ, কত পূর্ণ সিদ্ধশক্তি, কত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের জ্যোতির্ময় প্রসার আমাদের সত্তার কত বৃহৎ প্রশান্তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে এক নিভৃত লোকে, পশু-প্রকৃতির বিবর্তনে এখনো তাদের জন্ম হয়নি—তাহলে মানুষ সব দূরে ফেলে দেবে, শান্ত হয়ে থাকবে না, যতদিন এইসব সম্পদ সে অধিকার না করে। কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ, দুয়ার খুলে ধরাও কঠিন, ভয় সংশয় অবিশ্বাস রয়েছে পথে—প্রকৃতির প্রহরী, গতানুগতিক ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবার অন্তরায় যত।

শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছেন এবং যার অনুবাদ করা হয়েছে "পলকের জন্য দেখা" কথাটির সহায়ে, তার অর্থ হল "সমগ্রভাবে দেখা, তবে পলকের তরে শুধু"। স্পষ্টত সমগ্র সৌন্দর্যের নিরন্তর দর্শন আপনা থেকেই তোমায় বাধ্য করে পথটি গ্রহণ করতে। এও ঠিক যে ক্ষণেকের তরে খণ্ডদৃষ্টিও যথেষ্ট নয়; তার চাপ এত বেশি নয় যে তোমায় পথটি অনুসরণ করতে বাধ্য করবে।

তবে যত স্বল্প সময়ের জন্যেই হোক না, যদি এক অখণ্ডদৃষ্টি লাভ করা যায়, তাহলে সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়াস করবার লোভ আর সম্বরণ করা যায় না। কিন্তু বস্তুত, এই অখণ্ড দৃষ্টিই হল বিরল। সেইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলছেন "মানুষ যদি শুধু মাত্র..."।

সত্য বলতে কি, যারা প্রস্তুত, যারা এই সিদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে নিয়তিনির্দিষ্ট, তাদের জীবনে কোন এক মুহূর্ত, কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও, এই সিদ্ধি যে কি তার অনুভূতি তারা লাভ করবে না, সে-সম্ভাবনা খুবই বিরল।

কিন্তু এই যাদের নিশ্চিত নিয়তি তাদেরও নিদারুণ সনির্বন্ধ সংগ্রাম করতে হবে সেই "কিন্তু"র বিরুদ্ধে যা মনে হয় আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করে ফেলি সেই ভয়, সেই শঙ্কা শেষ পর্যন্ত কি হবে। আর, তা কতই-না অর্থহীন, কারণ, শেষ পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় যে সবার নিয়তিই এক জন্ম, জীবনধারণ—কমবেশি ভালভাবে—তারপর মৃত্যু তারপর কমবেশি কিছুকাল অপেক্ষার পর আবার শুরু হয় জন্ম নেওয়া, জীবনধারণ—কম-বেশি ভালভাবে—আর তারপর সেই মৃত্যু, আর এইভাবে চলে অনির্দিষ্টকাল, যে পর্যন্ত না তা যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

ভয় কিসের? গণ্ডির বাইরে আসার ভয়? মুক্ত হবার ভয়? আর বন্দী থাকব না, এই ভয়?

আর তারপর, যখন সেসব কাটিয়ে ওঠবার মত যথেষ্ট সাহস তোমার হয়েছে, তুমি বল: "যা ঘটে ঘটুক। আর যাই হোক, ক্ষতি তো বিশেষ কিছু নেই" তখন অবিশ্বাস আসে, তুমি ভাব এটা যুক্তিযুক্ত হল তো, এটা সত্যি তো, এসব মোহ নয়তো, মস্তিষ্কের কল্পনা নয়তো,

এ সত্যিই একটা কিছু তো...। আর মনে রেখো, এই অবিশ্বাস যদিও আপাতভাবে মুখ-জনোচিত, তবু সব থেকে বুদ্ধিমানের মধ্যেও তা দেখা যায়, এমনকি যাদের বার বার নিশ্চিত অনুভূতি হয়েছে তাদের মধ্যেও—আমি বলি, ওটা এমন জিনিস যে তুমি তা খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর শ্বাসপ্রশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে সংস্পর্শে আর তাই বলা যেতে পারে যে "প্রকৃতির প্রহরী" রয়েছে সর্বত্র, অক্টোপাসের মত, সবকিছুর মধ্যে গলিয়ে দেয় তার শুঁড়, আর তোমায় আঁকড়ে ধরে, এবং শেষে বেঁধে ফেলে।

এ দুটি বাধাও যখন কাটিয়ে ওঠা গেল, যখন অনুভূতি সব এত প্রবল যে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, সন্দেহ করা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে (তা যেন নিজের অস্তিত্বকেই সন্দেহ করার মত), তখনও থেকে যায় সেই বীভৎস, হীন নীরস, তীব্র জিনিস : সংশয়। মানুষের আত্মগর্বের উপরে তার প্রতিষ্ঠা, তাই তা এত দীর্ঘকাল টিকে থাকে। তুমি ভাবতে চাও যেন তুমি সেসব জিনিসের উর্ধ্বে : "আমি। আমি ওসব ফাঁদে পড়বার মত নই। আমি একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সব জিনিস দেখি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ; আমায় ঠকানো অত সোজা নয়।" কি ভয়ঙ্কর। কি ক্লিনুবলিন! কিন্তু এ হল বিপজ্জনক।

এমনকি প্রবলতম উৎসাহের সময়ও যখন তুমি অনুপম অপরূপ সব অনুভূতিতে ভরে রয়েছ তখনও তা উঠে আসে অধস্তন তল হতে—সেই কুৎসিত, আঠাল, ঘৃণ্য জিনিস। তবু উঠে আসে তা আর সবকিছু পণ্ড করে দেয়।

তাকে জয় করতে হলে হতে হবে মহাপরাক্রমী যোদ্ধা। সংগ্রাম করতে হবে প্রকৃতির যত অন্ধকার, যত ছলাকলা, যত প্রলোভন সেসবের বিরুদ্ধে।

কিন্তু কেন সে এমন করে? এ যেন মনে হয় সে তার আপন লক্ষ্য হতেই দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আগেই বহুবার এ বিষয়ে তোমাদের বুঝিয়ে বলেছি? প্রকৃতি খুব ভালভাবেই জানে সে কোথায় চলেছে এবং তার পরিণামই-বা কি। সে তা-ই চায় তবে... আপন মতে ও পথে। সে মনে করে না যে সময়ের কিছু অপচয় হল। অনন্ত কাল তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। সে তার আপন পথে চলতে চায় আপন খুশিতে, যতখানি খুশি এঁকেবেঁকে গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে চলতে, বারবার পিছনে ফিরে এসে, সোজা পথ পরিষ্কার ক'রে, বারবার একই জিনিস নূতন করে আরম্ভ করে দেখতে চায় তার ফল কি হয়। আর এইসব হৈ-হল্লোড় করা জ্যোতিষ্মানের দল যারা চায় এইক্ষণেই পৌঁছে যেতে, যত শীঘ্র সম্ভব, যারা তৃষিত সত্য, জ্যোতি, সৌন্দর্য ও সুসাম্যের জন্য...তারা তাকে উত্যক্ত করে, তাড়া লাগায়, তাকে বলে—সে তার সময় নষ্ট করছে। তার সময়। সে সর্বদাই উত্তর দেয় কিন্তু অনন্ত কাল আমার সম্মুখে পড়ে রয়েছে, তাড়া আছে কি আমার? তোমাদেরই-বা এত তাড়া কিসের?" তারপর হেসে আরও বলে : "তোমাদের তাড়া মানুষী সত্তার পরিমাপে ; নিজেদের প্রসারিত করে ধর, হয়ে ওঠ অসীম, শাশ্বত, তাহলে আর তোমাদের তাড়া থাকবে না।"

তার পক্ষে চলার পথে রয়েছে কত না রঙ্গ—কিন্তু সবার পক্ষে তা নয়।

যখন জিনিস সব দেখা হয় অনেক উর্ধ্বে থেকে, অনেক দূর থেকে, যখন সেসবকে দেখা হয় খুবই বিপুল, প্রায় অনন্ত, তখন যা ঘটে তা হল এই : যা-কিছু মানুষী জীবকে বিব্রত করে, যন্ত্রণা দেয়, সবকিছু মিলিয়ে যায় ; আর তাই, যাঁরা পরমপ্রাজ্ঞ এবং যাঁরা এক

সমুচ্চ প্রজ্ঞার জন্য জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বলে "কেন কষ্ট পাও? ও থেকে বেরিয়ে এস, তাহলেই আর কষ্টভোগ করবে না!" ব্যষ্টিগতভাবে তা খুবই ভাল বটে, তবে যদি অন্যদের কথা ভাবা যায়, তখন এই ইচ্ছা হবে যে এই করুণরসাশ্রিত মিলনান্ত নাটক যত তাড়াতাড়ি হয় সমাপ্ত হোক। আর এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়বে চারণভূমিতে পশুর মত এই জীবন যাপনে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে একফালি ঘাসজমি থেকে আর-একটিতে চরে বেড়িয়ে, যা গলাধঃকরণ করা হয়েছে এক কোণায় বসে তা রোমন্থন করে চলায়, ক্লান্ত হয়ে পড়বে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করে জীবনের সকল ঐশ্বর্যদ্যুতি থেকে বঞ্চিত হয়ে।

প্রকৃতি হয়তো মজা পায় যে আমরা এরকম হয়েই থাকি, কিন্তু আমাদের কথা বলতে গেলে, এ আমাদের যথেষ্টই হয়েছে, আমরা অন্যরকম হতে চাই।

ঠিক তাই, যখন তোমার মনে হবে যথেষ্ট হয়েছে, চাইবে জিনিসের অন্যরকম হোক, তখনই তোমার সাহস আসবে, শক্তি আসবে, আসবে সেই তিনটি ভয়ঙ্কর শত্রু শঙ্কা, সন্দেহ ও সংশয়ের বিরুদ্ধে বিজয়লাভের সম্ভাবনা। তবে আবার বলছি, একদিন বসে নিজেকে দেখা এবং এইসব জিনিসের সঙ্গে একবারের মত যুদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়, এসব থেকে নিশ্চিত-ভাবে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে গেলে তা বারবার আবার করে চলতে হবে অবিরাম, যেন তার শেষ নেই। সত্যি বলতে কি, সম্পূর্ণ মুক্ত বোধহয় কখনই হওয়া যায় না, তবে একটা সময় আসে যখন তোমার আন্তর সত্তায় তুমি এতই ভিন্নপ্রকৃতির হয়ে যাও যে এসব আর তোমায় স্পর্শ করতে পারে না। তাদের দেখতে পাব, তবে তাদের দেখ তখন সহাস্যে আর সামান্য তাড়নাতেই তারা চলে যায়, ফিরে যায় যেখান থেকে এসেছিল তারা—হয়তো তাদের একটু পরিবর্তন আসে, হয়তো তাদের বলও কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়, দুর্দমনীয় এবং নাছোড়বান্দা ভাবও কিছুটা কমে যায়—যে পর্যন্ত না জ্যোতি এতটাই প্রবল হয়েছে যাতে সকল অন্ধকার গেছে মিলিয়ে।

আর এই যেসব অপরূপ জিনিসের কথা শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলছেন, সেসবের বর্ণনা না দেওয়াই ভাল, কারণ প্রত্যেকে তার নিজস্ব ধরনে সেসবকে অনুভব করে, পরীক্ষা করে, সেসবের অভিজ্ঞতালাভ করে—আর প্রত্যেকের পক্ষে সেটাই সর্বোত্তম। অন্যের ধরনে চলতে যাওয়া কখনই উচিত নয়, প্রত্যেকের উচিত তার স্বকীয় ধরনে চলা, আর তখনই অনুভূতির থাকে পূর্ণ মূল্য, তা হয়ে ওঠে অমূল্য।

শেষ করার আগে, আমার কল্যাণেচ্ছা জানাই যাতে তোমরা সবাই এইসব অনুভূতি লাভ করতে পার। আর তার জন্য চাই শ্রদ্ধা, আস্থা, যথেষ্ট বিনম্রতা আর এক মহান শুভ ইচ্ছা।

খুলে ধর নিজেকে, হও অতীপ্সু, আর...প্রতীক্ষায় থাক। তা নিশ্চয়ই আসবে। ভগবৎপ্রসাদ রয়েছে, তা চায় শুধু যাতে সকলের জন্য কাজ করতে পারে।

অক্টোবর ১০, ১৯৩৮

---

* Pensées et Aphorismes থেকে অনূদিত। অনুবাদক : শতদল

সাহিত্য-সংস্কার*

শ্রীবিড়ানন্দ নকলনবীশ

(১)

বাঙ্গালার সাহিত্যিক-ধুরন্ধরেরা যখন "সতীর" উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, "বেহুলা"কে তেলা-সমেত জলে ডুবাইতে উদ্যত, "শান্তি-নিকেতনে" অবিশ্রান্ত লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন স্বর্গের সাহিত্যরথিগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেব-রাজ ইন্দ্রের আহ্বানে নন্দন-কাননের square field-এ একটি সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইল; ও তথায় অনবরত সাহিত্যিকবৃন্দ বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংস্কার সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য, দেবর্ষি নারদ উক্ত সভায় বীণাবাদন করিয়াছিলেন এবং opening ও closing song গাহিয়া সভার মর্য্যাদা সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন)। সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, স্বর্গবাসী যে-কোন চারি-জন সাহিত্য-সেবী বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিতে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু কে কে আসিবেন, এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ, কালী-প্রসন্ন, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কেহই সম্মত নহেন। কি জানি কি একটা নিগূঢ় কারণে সকলেই সশঙ্ক। বঙ্কিম ও হেমচন্দ্রের ত বিশেষ আপত্তি। পূর্ব্ববঙ্গের দীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে তাঁরা বাঙ্গালার সংকটাপন্ন অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইয়া অবধি বাঙ্গালার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না।

বিষম গণ্ডগোল কিছুতেই ইহার মীমাংসা হয় না। অবশেষে মাইকেল lotteryর প্রস্তাব করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ইহাতেও আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু "ভোটে" তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। যথাকালে lottery-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় নাম উঠিল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের। সভা ভঙ্গ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত পা চলে-চলে চলে না। আতঙ্কিত ছাত্রের পরীক্ষামন্দিরে প্রথম পাদক্ষেপের মত পা চলে-চলে চলে না; কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, শৃঙ্খলপদ রাজনৈতিক বন্দীর মত পা চলে-চলে চলে না; 'কালাচাঁদ'-প্রেমোন্মত্ত, ঈষন্নুদ্রিত-নয়ন, কালিম-মণ্ডিত-বদন কংকালসারের গঙ্গাস্নান-গমনের মত পা চলে-চলে চলে না। হেমচন্দ্রের temperature 97-এ গিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজেন্দ্রলাল ত স্পষ্টই মুখ ফুটিয়া বলিলেন—

একটা ভীষণ বিপদ বিভীষিকার মত হাঁ করে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ, হিংসার চেয়েও ক্রূর, নরকের চেয়েও নির্ম্মম। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, এঁরা আমাদের এই চারজনকে মরবাঙ্গালায় পাঠিয়ে কি কাজই বা

---

* ১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকা হইতে লেখক কর্ত্তৃক ঈষৎ পরিবর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত।

করাবেন, যে চারজনের ফের্বার আশাও খুব কম। এ যেন একটা উৎপীড়ন, একটা নিষ্পেষণ, একটা অত্যাচার!

দ্বিজেন্দ্রলালের কথাগুলি শুনিয়া হেমচন্দ্রের কথঞ্চিৎ জীবনী-সঞ্চার হইল। তিনি নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—

ধিক্ দীনবন্ধু, ধিক্ হে নবীন,
ধিক্ ইন্দ্রনাথ, হে জ্ঞানপ্রবীণ,
নিজেদের রাখি শান্তি-নিরাপদে,
মোদেরে ঠেলিছ বিষম বিপদে,
ইহা তোমাদের শক্রতা শুধু।
প্রয়োজন হলে হেলায় মরিব,
কভু না ফিরিব, কারে না ডরিব,
কাপুরুষপ্রায় কুটিল বা ঋজু,
না বাছিব পথ, চল ভাই দ্বিজু,
এস হে বঙ্কিম, ওঠ না মধু?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মধুসূদন তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—

সত্য যা কহিলে বন্ধু, কিন্তু কি কুক্ষণে
হায়, প্রস্তাবিনু হেন, ভবিষ্য না ভাবি
তিল! লটারিয়া যদি ঘটিবে সংকট
হেন, সে প্রবাদ সাধি হানি কি কুঠার
আপনা হইতে কভু আপনার পদে
সুতীক্ষ্ণ? কি করিনু, উঃ, আপনি মজিনু
হায় সবে মজাইনু। হায়রে যেমতি
মজিলা কর্ব্বুরকুল অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে
নৈকষেয় অপরাধে একদা অকালে।

কবিবর ভারতচন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া তাঁহার সদ্যপ্রসূত "উর্ব্বশী-সুন্দরী" কাব্যখানিকে কোন্ মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষের শ্রীকরে সমর্পণ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বঙ্গদেশ-যাত্রার আদেশপ্রাপ্ত কবিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে আসিলেন। বলিলেন—

বল ক্রন্দন ভাই কিসের তরে,
চলি যাহ সুখে সব গর্ব্বভরে।
অতি তুচ্ছ ভয়ে ছিছি মূর্ছিত হে,
সব সাহস-বঞ্চিত কুঞ্চিত হে!
জগবন্দন ভারত-নন্দন রে,
ধন ক্রন্দন, নাহিক স্পন্দন রে!

আরও জনে জনে নানা উৎসাহ-বাণীতে সকলকে বুঝাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বসিয়া-বসিয়া এতক্ষণ শুক্লাম্বরা সর্ব্বসন্তাপ-সংহারিণী শিক্ষকা-ধ্যাপক-উৎসিত-জন-চিত্তবিকারবিনাশিনী সিগারেট-দেবীর সেবায় তন্ময় হইয়াছিলেন।

কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি তাহার স্বর্ণ-মনীষ-সঞ্জাত শুষ্কগুচ্ছে লুক্কায়িত থাকিয়া বরেণ্যগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল।

(২)

যথাকালে তাঁহাদিগকে বরণ করিবার জন্য মন্দাকিনী-তীরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। আজ আর অন্যান্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির কাহারও আসিতে বাকী নাই। এই বিদায় সম্বর্ধনা সভায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমোদনে ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদায়কালে জলদ-নির্ঘোষে যাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

সহোদর-চতুষ্টয়! শুধু বাঙ্গালা বলে নয়, সমগ্র ভারতটাই উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। সাহিত্যে বিষম আবর্জনা জন্মেছে; সমালোচকরা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। আপনারা অতি মহৎ ব্রত নিয়ে বাঙ্গালায় যাচ্ছেন। অনেক কবি আগাছার মত সাহিত্য-ক্ষেত্রকে ছেয়ে ফেলেছে, আপনারা সে সব বেছে-বেছে বের করবেন। ঢুকবেন মুদি-মাদ্রার দোকানে, গোলা-গঞ্জ-বাজারে, পাট-তেজ-কল-কারখানায় কুঠরীতে কুঠরীতে; ঢুকবেন—রাজার বাধা পদদলিত করে গবর্নমেন্ট অফিসের চেম্বারে-চেম্বারে ঢুকবেন স্কুল-কলেজের মেসে-মেসে, হোষ্টেলে-হোষ্টেলে। ঢুকে এক-একটা রোদে-পাকা, টেঁসো কবি ও সাহিত্যিক টেনে-টেনে বের করবেন। জানবেন—এ শুধু সাহিত্য-সংস্কার নয়, মা ভারতীকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করা। যখন এই মহৎ ব্রত নিয়ে যাচ্ছেন, তখন গৌরবের সঙ্গে এর উদ্‌যাপন করতে হবে। যখন যাচ্ছেন, তখন একটা দাগ রেখে আসবেন।

(৩)

সমগ্র বাঙ্গালায় চলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্গের সাহিত্যিক-চতুষ্টয় কলিকাতায় আসিতেছেন। এই শুভ সমাচার লোকে-লোকে, মুখে-মুখে, তারে-তারে খানে-খানে, কার্ডে-কার্ডে, দিকে-দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। স্কুলের ছাত্ররা শিক্ষকের বেত্রাঘাতকে তুচ্ছ করিল, কলেজের ছাত্ররা percentageকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল, অফিসের বাবুরা বিলাতী বিনামার অনুভূতি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। শ্ব-ক্লেষ-সেবায় যাঁহারা এতদিন মাতোয়ারা ছিলেন, তাঁহারাও এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কেবলমাত্র উকিলেরা কাছারীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না আর চামারেরা রাস্তার "মোড়ে-মোড়ে" বসিয়া থাকিয়া অধোবদনে পথিকগণের পাদুকার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এদিকে ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে সভা-মণ্ডপ তৈয়ারী হইতে লাগিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা মজুর দ্বারা কোনও কার্য্য করিতে দিতেছে না। নিজেরাই বুকের রক্ত দিয়া, বাহুর শক্তি দিয়া, উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। সভার কর্তৃপক্ষেরও মজুরের খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে। কেবল "কাঁচি" মার্কা সিগারেটে যাহা কিছু খরচ হইতেছে মাত্র।

Bengal Literary Society এই উদ্যোগ-আয়োজনের বিশেষ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আগামী কল্য সভা। সুতরাং অদ্যই মফঃস্বলের কবিকুল দলে-দলে, পালে-পালে, যূথে-যূথে, কাতারে-কাতারে উপনীত হইলেন। এক-এক জন কবির এক-এক রকম ভাব। কাহারও উদাস-দৃষ্টি ঊর্ধ্বে উত্থিত, কাহারও ললাট চিন্তার প্রাবল্যে ত্রিরেখায় কুঞ্চিত, কেহ-বা চক্ষু দুইটিকে 'উপ-নয়নে' আবৃত রাখিয়া আদি-রসের plot খুঁজিতেছেন ও শিস দিতেছেন। অধিকাংশ কবিরই চাঁচর চিকুর তরঙ্গায়িত। আগামী কল্যকার সভায় পাঠ করিবার জন্য কবিবৃন্দ আপন-আপন কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কবিতা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য সকলেই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিলেন। কালরাত্রি প্রভাত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র সকলে সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। সকলেই ঊর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। যেই গগন-মণ্ডলে সূর্য্যদেব প্রথম দেখা দিয়াছেন, তখনই জনৈক দূরবীক্ষণ-লগ্নাক্ষ বাবু সোৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ পুষ্পক রথ।" অমনি অযুত কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" ও "Hip Hip Hurrah" ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পুষ্পক-রথখানি যখন সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন উহা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রায় দুই মাইল উত্তরদিকে হেলিতে-দুলিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র সহস্র-সহস্র কবি ও সাহিত্যিক সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া, ছিন্নসূত্র ঘুড়ীর পশ্চাতে বালকবৃন্দের মত, "পুষ্পক" লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। "পুষ্পক" ব্যোমপথে হেলিতে-দুলিতে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতার রাজবর্ত্মে অসংখ্য ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে তুরঙ্গ-গতিতে ছুটিতে লাগিল। "পুষ্পক" যখন হেদোর উপর দিয়া বীডন স্কোয়ারের উপরে, বিরাট জনমণ্ডলী তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া কেহ-বা বলরাম দে ষ্ট্রীট দিয়া short-cut করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিডন ষ্ট্রীট দিয়া ঘুরপাক খাইতে-খাইতে চলিলেন, কেহ-কেহ সোজা মানিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া দৌড়িতে লাগিলেন; পরিশ্রান্ত বৃদ্ধেরা হেদোর ধারেই বসিয়া পড়িলেন।

"পুষ্পক" নিমেষের মধ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উপনীত হইল। স্বর্গবাসী সাহিত্যিক-চতুষ্টয় অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সভামণ্ডপ জনশূন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাকার ব্যাপার সন্দর্শনজনিত একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, হেমচন্দ্র "আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে" বসিয়া পড়িলেন, মধুসূদন "নিশার স্বপন সম" ব্যাপার দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ত স্থাণুর মত নিশ্চল, মৃতের মত নিস্পন্দ, পুত্তলিকের মত নির্ব্বাক্।

ক্রমশ লোক জুটিতে আরম্ভ করিল। কেহ ট্রামে, কেহ মোটরে, কেহ সাইকেলে ক্রমে-ক্রমে সকলেই আসিলেন। সমাগত সাহিত্যিক-চতুষ্টয়কে নব্য কবিকুল পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন।

(৪)

যথারীতি সভা আরম্ভ হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অশেষ-মণিমণ্ডিত-হারমধ্যস্থ-কৌস্তুভবৎ সভাপতির সিংহাসন সমলংকৃত করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইল। সভাপতির দক্ষিণে হেমচন্দ্র ও মধুসূদন এবং

বাবে দ্বিজেন্দ্রলাল। সভান্তরে আমাদের বর্তমান বাঙ্গালার জনৈক শ্রেষ্ঠ কবির সাগ্নেদ রচিত একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল—

(গান)

কোন্ অচিন দেশের আলোক থেকে
এলে মোদের মাঝখানে।
ভরিয়ে দিলে পরাণ মোদের
কী যে মধুর তানে।
ওগো, কত কালের চেনা,
আজি লুকিয়ে দেব দেনা,
আজি নিবিড় হোয়ে উঠ্‌ছে পুলক
আলোক-ছোঁয়া প্রাণে।
কী যে মধুর তানে।
আজি তোমার এল সাগর-বুকে,
পাগল হাওয়া বইলো রুখে'
আবেগভরে কইলে কথা
তটের কানে-কানে।
কী যে মধুর তানে।
আজি বিজলীঘন বাদল রাতে,
জাগিয়ে দিলে মূর্ছনাতে,
রাঙিয়ে দিলে অসীম-পটে
কোমল তুলির টানে।
কী যে মধুর তানে।

গান থামিল। চতুর্দিকে করতালি ও আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। যাঁহারা অনুপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের টেলিগ্রাম ও পত্র পঠিত হইল।

এইবার জনৈক উদীয়মান সাহিত্যিক "বাঙ্গালা সাহিত্যের অধোগতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি মহা আস্ফালনপূর্বক ইতস্ততঃ তর্জনী-সঞ্চালন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

Gentlemen,

Bengali আমাদের mother-language, Bengal আমাদের mother-land। কিন্তু কি unfortunate আমরা, আমাদের এই জননী জন্মভূমির প্রতি for a moment দৃক্‌পাত করিনে। Moreover, Gentlemen, moreover আমরা তাঁর উপর একটা lawless conduct দেখিয়ে আস্‌ছি। সহজ কথায় বলতে গেলে, Gentlemen, আমরা যেন murder case-এর accused হয়ে পড়েছি। সকল পাপের একটা expiation আছে, কিন্তু—কিন্তু Gentlemen, it is too gross an offence to be atoned for. To speak the truth আমাদের এই mother-language-এর প্রতি বড়ই oppression আরম্ভ হয়ে পড়েছে।

Sanskrit হাজার হ'লেও আমাদের monther-language নয়, সে কেন Gentlemen, এই পবিত্র মন্দিরে tressपass করবে? মুসলমান ভ্রাতাদেরও mother-language বাঙ্গালা, তাঁরাই বা Persianকে কোন্ law অনুসারে allow করেন।

হঠাৎ সভাপতি মহাশয় বক্তা মহাশয়কে এক টুকরা কাগজ দিয়া পাঠাইলেন। উহা পাঠ করিয়া তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায়, ক্ষুণ্ণ-মনে স্বস্থানে উপবেশন করিলেন।

এইবার কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

থাম্ রে ভেরী, থাম্ এই রবে,
পূরিয়াছে ধরা সাহিত্য-গৌরবে,
সবাই শীতল সে মহা সৌরভে
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
আরবী, পারসী, ইংরাজী, লাতিন,
তারাও প্রধান, তারাও স্বাধীন,
হিব্রু, গুজরাটি, মারাঠি, উড়িয়া,
ফেলেছে জড়তা সুদূরে ছুঁড়িয়া,
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
ধিক্ বঙ্গবাসী, ধিক বঙ্গকবি,
জাগে না কি প্রাণে অতীতের ছবি,
উদিবে না কি রে সে গৌরব-রবি
সে কি রে অলীক স্বপন-কথা?
ভুলিয়াছে সব চণ্ডীদাস গান,
ঈশ্বরচন্দ্রের নাহি রে সন্ধান,
কাশী কৃত্তিবাস হয়েছে অতীত,
মুদি পসারীর দোকান ব্যতীত
কহিতে উপজে হৃদয়ে ব্যথা!
নবীনের কোথা সেই তীব্র ভাষ,
"কুরুক্ষেত্র" আর "পলাশী" "প্রভাস"
কোথা "অমিতাভ" কোথা "রৈবতক"
গিরিশের কোথা সে মহানাটক
কভু কি ফিরিয়া পাব না আর?
"দীনবন্ধুর" সে সুললিত ছাঁদ,
সে "নীলদর্পণ" সেই "নিমচাঁদ"
ভাঙ্গিয়াছে যেই সুকণ্ঠের বাঁধ,
তুলনা খুঁজিলে বিরল যার।
"এখন তোরা যে শত কোটি তার"
পাদুকা-পীড়িত যত অফিসার,

পারিস ত খুব কলম পিষিতে,
খাইতে ঔষধ শিশিতে শিশিতে,
হিমাদ্রি অবধি কুমারী হইতে,
বদলী হইয়া চাকরী বহিতে,
বারেক তাহাতে হয় না ভুল।

এমন সময়ে শ্রোতৃবন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—shame sname। কেহ বলিলেন—hear hear। বক্তৃতা চলিতে লাগিল—

তেমতি কবিতা ভাবছন্দোযুত,
বিশীর্ণ গোলাম-লেখনী-প্রসূত,
কবির দেহটি ম্যালেরিয়া ভরা,
কবিতায় তাই বিরিয়াছে জরা,
কাটিলে শিকড় ফুটে কি ফুল?
ছিল বটে আগে উপদেশ-ফলে,
হইত কবিরা তৈয়ার সকলে,
কবিতা ব্যাখ্যায় আসিত সদলে
শান্ত শিষ্ট সমালোচকগণ।
"এখন সে দিন নাহিক যে আর"
শিষ্ট মিষ্ট বোলে সাহিত্য-সংস্কার
"হবে না হবে না খোল তরবার"
এসব কবিরা নহে তেমন।

হেমচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হইলে কতিপয় কবি পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

এইবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নবীন সেবক বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"খেয়া-ঘাটের ওপার থেকে যে চারজন আমাদের এই ভাঙা-ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচেন, তাঁদেরকে আমরা বরণ কোরে তুলে নিচ্চি। কোনো-কিছু যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়ে, তখনি তাকে অসীমের রাজ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়। তাই, আমাদের ভাষা-মায়ের উপর এই যে অত্যাচার যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়লো, তখন ঈশ্বর পাঠিয়ে দিলেন অসীমের রাজ্য থেকে এই চার জন দেবদূত।

"কবিত্ব সেইখেনে নয়, যেইখেনে কবি শুধু শব্দসাগরের বেলায় বোসে-বোসে উপলখণ্ড সংগ্রহ করচেন। কবিত্ব যখন উর্ম্মিমালার ফেনার মুকুট পোরে আমাদের সাম্নে এসে হাজির হয়, তখন আমরা কবির বাহাদুরী বুঝতে পারি। এইটে আমাদের দুর্ভাগা দেশের সমালোচকেরা বোঝবার যন্ত্রটার মধ্যে ভালো কোরে ধর্‌তে পারেন না।

"কবিতা হচ্চে সাহিত্যের এসেন্স। বিলাসকে সন্ন্যাসীর বিভূতির মত গায়ে মেখে যাঁরা জীবন-মরণের যাত্রা-পথে টিকেট কোরে চলেছেন, তাঁরাও ভেতরকার রুমালখানায় দুফোঁটা মাখিয়ে নিয়েছেন। এমনি কোরে কবিতা-অপ্সরী গন্ধ ও অনুভূতি বিলিয়ে দিতে-দিতে

কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে ডানা মেলে চলেছেন। এইটে সকলকে বুঝে নিতেই হবে কবিতা নিয়ে আলোচনা করবার আগেকার মুহূর্তে।

"আমাদের দেশের কবিরা বড়ই নিরীহ, তাই সমালোচকদের অত্যাচার চোখ বুঁজে স'য়ে আসচেন। এঁরা তরল খুব, কিন্তু সোডা ওয়াটারের মতো অতুল শক্তি বুকে কোরে এঁদের দেশ-মাতার কোলের বোতলে বোসে আছেন। এঁরা মায়ের কোলে বোসে আছেন, তাই কেয়ার করচেন না নিন্দুকদের এই ব্যবসা-চালানো বুলি। কিন্তু সবারি একটা সীমা আছে; যখন এই স'য়ে-যাওয়াটা সীমা অতিক্রম করচে, তখন এঁরা বেরিয়ে পড়চেন যে দিকে খুশী সেদিক দিয়ে। আর তখনি এঁরা এঁদের শক্তির পরিচয় দিচ্চেন, যখন আঘাত পড়চে এঁদের মাথার উপরে।

"আরেক কথা বল্‌তে হোতো বাংলা ব্যাকরণের অত্যাচার সম্বন্ধে। কিন্তু সভাপতি মহাশয় স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েচেন, তাইতে আমি বোস্‌তে বাধ্য হলুম।"

টিফিনের জন্য আপাততঃ সভা বন্ধ হইল। বক্তৃবৃন্দ ও শ্রোতৃবর্গ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

অপরাহ্ণে স্বল্পক্ষণের জন্য সভার অধিবেশন। কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বর্গীয় সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ ছিল। পরিষদ পরিদর্শনের পর তাঁহাদের পানাহারের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত কয়েকজন সাহিত্যিক ছাড়া বেশি লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার বলেন—"পানাহারের চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কর্তারা। যেমন আহার্য তেমনি পানীয়। পানীয় ছিল দুরকমের, জলকে ধরিলে তিন রকম।"

* * *

পানাহারে বসিয়াছেন স্বর্গের সাহিত্যিকেরা। মর্ত্যের পানীয় ও আহার্য দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। টেবিলের উপরে একটি হুইস্কির বোতল দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে কাব্যরস নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি বোতলটির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া বলিলেন—

নমি তব পদাম্বুজে দেবী সুরেশ্বরি,
প্রতীচ্য-প্রদেশ-জাত দ্রাক্ষারসধারা
নিবসে স্ফটিকাধারে। হায় রে যেমতি
মলয়া অম্বরে তারা, কিংবা ইরম্মদ
বিরাজিত জলদের পক্ষজ-পিঞ্জরে
প্রদীপ্ত। স্বাগত অয়ি দেবী সুরেশ্বরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেরিত কলিমুদ্দি মিয়া কর্তৃক রন্ধনীকৃত ব্যঞ্জনগুলি টেবিলের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সকলেই আহার্য বস্তুর যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিতেছেন।

হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রামকমল সিংহ ফোন ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একখানা বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের অফিস হইতে একজন বাঙালী সহযোগী সম্পাদক বলিলেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন—লালবাজার পুলিস বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। ইঁহাদের বিরুদ্ধে নাকি বহুকাল পূর্ব হইতেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলবৎ ছিল।

সংবাদটি শুনিবামাত্র স্বর্গের সাহিত্যিকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তারা তাঁহাদের নিজ নিজ আবাসে পাঠাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন।

গাড়ি প্রস্তুত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতস্তত পাদচারণা করিতে করিতে বলিলেন তিনি পরে যাইবেন।

স্বর্গের সাহিত্যিকদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য যাঁহারা পরিষদের অভ্যন্তরে ছিলেন, তাঁহারা তো আসিলেনই, পথচারী লোকেরাও সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি চলিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গাড়িতে যান নাই। তাঁহার গন্তব্যস্থানে তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ ভিড়ের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া গেল, বঙ্কিমবাবুর হদিস মিলিল না। পরিষদের সকলেই দুশ্চিন্তায় পড়িলেন কোথায় গেলেন বঙ্কিমচন্দ্র!

পরদিন সকালবেলায় খবরের কাগজের Stop Press-এ অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ—"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ্রেপ্তার।"

পুলিশ সারা শহর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, প্রতাপ চাটুজ্জের গলির ঘর-ঘর খানা-তল্লাসী চালাইয়াছে, নৈহাটিতে গিয়া কাঁঠালপাড়ায় সন্ধান করিয়াছে কোথাও পাওয়া যায় নাই বঙ্কিমচন্দ্রকে। একখানি সান্ধ্য দৈনিকে এই সব সংবাদ বাহির হইয়াছে। তবু পুলিশ চেষ্টা ছাড়ে নাই। গোয়েন্দা বিভাগ বহু ইনফরমার পাড়ায় পাড়ায় নিযুক্ত করিয়াছে।

পরদিন সকালকার সংবাদপত্রে মোটামোটা বড় বড় হরফে শিরোনামা দিয়া খবর বাহির হইল—"একটি স্ত্রীলোকের কুটিরে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রেপ্তার"।

বিশদ বিবরণে প্রকাশ—বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের অদূরে একটি স্ত্রীলোকের কুটির হইতে স্ত্রীলোকটি সহ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

যথাবিধি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং স্ত্রীলোকটিকে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। আসামীদের উপরে অভিযোগ রাজদ্রোহের। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। একজন রাজদ্রোহীকে নিজের ঘরে স্থান দিয়া স্ত্রীলোকটিও আইনের কবলে পড়িয়াছে।

বিচারক প্রথমে হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এই দুইজনের প্রশ্নোত্তর শেষ হইবার পর স্ত্রীলোকটির জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

সরকারী উকিল স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"
"প্রসন্ন"।
উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পেশা কি?"
স্ত্রীলোকটিকে নিরুত্তর দেখিয়া উকিল বলিলেন—"তোমার খাওয়া-পরা চলে কি উপায়ে?"
"দুধ-দই বিক্রি ক'রে। আমার গরু আছে।"
উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বঙ্কিম চাটুজ্জেকে ঘরে রেখেছিলে কেন?"
"কে বঙ্কিম চাটুজ্জে?"
উকিল বঙ্কিমবাবুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিলেন—"ইনিই বঙ্কিম চাটুজ্জো।"
স্ত্রীলোকটি নথ নাড়া দিয়া বলিল—"ধুৎ! উনি তো কবলাকান্ত চক্রবর্তী।"
টিকিনের জন্য শুনানি স্থগিত হইল।

(৬)

পরদিন দেখা গেল "পুষ্পকে"র নিকট মাইকেল একাকী বসিয়া উচৈচঃস্বরে রোদন করিতেছেন—

"ছিল আশা ভ্রাতৃগণ, আসিয়া হেথায়
বন্ধুচতুষ্টয় মোরা, সংস্কারিয়া নব
বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্র, সংস্কারিয়া দেশ
চলি যাব মহাসুখে। সাহিত্য-কানন
ধরি শোভা অনুপম সদা উজলিবে
জন্মভূমি, প্রস্ফুটিবে কবিতা-কুসুম
বিতরি সুবাস দেশে; 'গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'
কিন্তু বৃথা আশা! চলি গেলা বন্ধুত্রয়
কোথা কোন অন্ধকারে, হায় রে যেমতি
পড়ি গেলা ক্রৌঞ্চকুল নিষাদের শরে
নিমেষে। শুনিবে যবে স্বর্গবাসী সব,
সান্ত্বনিব কোন ভাষে, হায় রে কেমনে?
"কোথা সিন্ধু, কোথা হেম, কোথায় বঙ্কিম"
সঘনে শুধাবে যবে অমর-নিকর
কি ক'য়ে বুঝাব সবে, হায় রে কি ক'য়ে?
হা মিত্র, হা বীরশ্রেষ্ঠ, চিরজয়ী রণে,
হা মাতঃ, সাহিত্য-লক্ষ্মী, কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া, দারুণ বিধি, অভাগার ভালে?"

মানুষের রয়েছে মন,
মন রয়েছে পাষাণেরও অন্তরে
কিন্তু সকল মনের মনন যে
সে সর্বাসীন ভাস্কর একক।

গাছের রয়েছে প্রাণ
প্রাণ রয়েছে মাটির তলায়
তবে সকল প্রাণের প্রাণ যে
তাকেই মানুষ বলে ভগবান।

পশুর রয়েছে হৃদয়
স্বর্গবাসীরও হৃদয় রয়েছে
সকল হৃদয়ের হৃদয় যে
সে স্পন্দিত হয়ে চলে চিরকাল একান্তে।

প্রিয়জনের দেহ
নিহতজনেরও দেহ।
দুটি দেহই তবু তাদের বেদনায়
একই অনন্যের তনু।

অনুবাদিকা অণিমা মজুমদার

সিদ্ক

পীয়ের কর্ণেই

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দন রোদ্রিগ, এলভির

এলভির। রোদ্রিগ, করেছ কী? এখানে এসেছ কেন?

দন রোদ্রিগ। বিনষ্ট নিয়তির পথ ধরে চলেছি আমি।

এলভির। তোমার স্পর্ধা হয় তোমার কর্মের শোক দিয়ে ভরা
এই এখানে আসতে?
এখানে এসেছ কী সাহসে মৃত কাউন্টের বাড়িতে?
তাকে তুমি হত্যা কর নি?

দন রোদ্রিগ। তাঁর জীবন হতে পারত আমার অপমানের পরিবর্তে;
আমার পিতৃবংশের দাবিতে তাঁর মৃত্যু।

এলভির। কিন্তু তোমার হাতে নিহতের ঘরে এলে কেন?
কোন্ খুনী কবে এমন আশ্রয় যেচেছে?

দন রোদ্রিগ। আমি এসেছি আমার বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।
আর অবাক হয়ে তাকিও না আমার দিকে,
এক মৃত্যুর জন্য প্রায়শ্চিত্তে আমি চাই আমার মরণ।
আমার প্রিয়াই আমার বিচারক,
আমার বিচারক একমাত্র শিমেন।
তার ঘৃণা জেনেছি মৃত্যুর চেয়েও ক্ষুরধার;
তা-ই আমার প্রাপ্য,
তার মুখ থেকেই শুনব সেই দণ্ডাদেশ,
তার হাত থেকে নেব মৃত্যুর আঘাত।

এলভির। না, বরং পালিয়ে যাও তার দৃষ্টির বাইরে,
তার আবেগাচ্ছন্ন শক্তির আওতা থেকে দূরে,

তার সঙ্গ হতাশার এলাকা ছেড়ে যাও।
পালাও।
তার নব যন্ত্রণার উল্লেখ করতে যেও না
তা শুধু তার অনুভূতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

ডন রোদ্রিগ। আমার হৃদয়ের প্রিয়তম লক্ষ্য
রাগে নিষ্করুণ হয়ে আমাকে অমন তিরস্কার করবে না;
সে-শাস্তি আমার প্রাপ্যই।
তার হাত থেকে মৃত্যু নিতে
আর সব কঠিনতর শাস্তি এড়াতে প্রস্তুত আমি।

এলভির। শিমেন এখন রাজবাড়িতে, শোকাচ্ছন্ন,
রাজার কাছ থেকে রক্ষীপরিবৃত হয়ে ফিরবে।
পালাও, রোদ্রিগ, পালাও।
আমার কাছেও বাড়িও না।
তোমাকে এখানে দেখে ফেললে লোকে কী বলবে।
তুমি কি চাও পিতৃহত্যাকারীকে লুকিয়ে রেখেছে
এই কলঙ্ক যুক্ত হোক তার দুঃখের সঙ্গে?
সে এল বলে! ওই। ওই। সে আসছে, এই এসে পড়লে বলে।
লুকিয়ে পড়, তাহলে তারই স্বার্থে
রোদ্রিগ, লুকাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডন সাঞ্চো, শিমেন, এলভির

ডন সাঞ্চো। ঠিক বলেছেন, এরকমভাবে রক্তই ঋণ শোধ করে;
আপনার রাগ ন্যায়সঙ্গত,
অশ্রুপাতও অনর্থক নয়।
দুর্বল ও মূঢ় বাক্যে আপনার রাগ উপশম বা দুঃখ শান্ত করতে যাবেনা।
তবে যদি আপনার সেবার উপযুক্ত হই
ওই আমার তরোয়াল আপনার আদেশের অপেক্ষায়;
আমার ভালোবাসা আপনাকে দিলাম আপনার পিতার হত্যার
প্রতিশোধ নিতে;
আপনার সেবায় বাহু আমার তার কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে যাবে।

শিমেন। হায়, হতভাগিনী আমি!

দন সাঞ্চো। গ্রহণ করুন আমার তরবারি।

শিমেন। রাজাকে অবজ্ঞা করা হবে তাতে—
তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিরুদ্ধ ন্যায়বিচারে।

দন সাঞ্চো। ন্যায়ের পদক্ষেপ এত মন্থর
যে বীর শম্বুকপ্রায়কে অপরাধ ছুঁতেই পারে না।
তার নিত্য অনিশ্চিত পন্থা অশ্রু আর বেদনাই এনে দেয়।
এই বীরকে দিন আপনার হয়ে শোধ নিক তার তরবারি দিয়ে;
এপথ নিশ্চিত, শাস্তিও অবিলম্বিত।

শিমেন। তা হবে শেষ উপায়।
তেমন যদি ঘটতেই হয়,
আর তখনো আমার বেদনা আপনাকে বিচলিত করে
আমার ক্ষতের প্রতিশোধ নিতে স্বাধীনতা থাকবে আপনার।

দন সাঞ্চো। সেই সুখের আশায় হৃদয় আমার উন্মুখ,
এই আশা নিয়ে পরিতৃপ্ত আমি বিদায় নিলাম।

তৃতীয় দৃশ্য

শিমেন, এলভির

শিমেন। এতক্ষণে বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে
তোমার কাছে মর্মযাতনা আমার উজাড় করে দিতে পারি,
তাদায় বলতে পারি আর্ত দীর্ঘশ্বাস যত,
হৃদয়কে তার সব করুণ কাহিনী খুলে জানাতে।
এলভির, পিতা আমার মৃত;
রোদ্রিগের তরবারির প্রখর আঘাত ছিন্ন করেছে তার প্রাণসূত্র।
নয়ন আমার, ঢালো ঢালো অশ্রু, অশ্রুতে অশ্রুতে গলে যাও;
আমার এক অর্ধেক আর এক অর্ধেককে কবরস্থ করেছে,
এই প্রাণঘাতী আঘাতের জন্য
আমার প্রেমময় হৃদয় যে আর নেই তার হয়ে
প্রতিশোধ নেবেই।

এলভির। মহাশয়া, শান্ত হোন, বিশ্রাম নিন।

শিবেন। না, কথা দিয়ে ছল ফুটিও না।
এমন দুর্দশায় বিশ্রামের কথা বলা!
আমার দুঃখের কী করে শান্তি হবে
যতক্ষণে না আমার দুঃখের মূল হাতটি ধৃণা করছি।
কী করে যাতনা থেকে নিস্তার পাই
যখন প্রেম ও ঘৃণা উভয়েই অনুসরণ করছে দোষীকে!

এলভির। এখনো আপনি তাকে ভালোবাসতে পারেন
যে আপনার পিতাকে হত্যাকে করেছে?

শিবেন। ভালোবাসি বললে খুবই কম বলা হবে, এলভির
তাকে আমি পূজা করি;
অন্তরে আমার অনুরাগ আমার অনুভবের বিরোধী
আর আমার শত উষ্মা সত্বেও
রোদ্রিগ আমার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী
তার আক্রমণ অবরোধ পশ্চাদপসরণ আর আত্মরক্ষা
কখনো সবল কখনো দুর্বল কখনো বিজয়ী,
এই ক্রোধানলের সংগ্রামে হৃদয় আমার ক্ষতবিক্ষত,
কিন্তু অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন না করেই;
যদিও আমি অন্তরে জানি আমার উপর প্রেমের শক্তি,
তবু দ্বিধা করিনা কর্তব্য সাধন করার ব্রতে।
আমি হিসাব না করে ইতস্ততঃ না করে ছুটি
আমার সম্মান যেখানে ছোটায়।
রোদ্রিগ আমার আপন প্রিয়;
তার স্বার্থে আমি ভুগে মরি;
হৃদয় আমার তার হয়ে মিনতি করে;
কিন্তু হায় তার প্রয়াস সত্বেও আমি কে আমি আর পিতা আমার মৃত।

এলভির। আপনি কি এপথে আরো এগিয়ে যাবেন?

শিবেন। মর্মান্তিক ভাবনা।
কে-পথে চলতে বাধ্য হয়েছি তাও নিষ্ঠুর।
তার প্রাণবলি চাই অথচ সে-উদ্দেশ্য সাধনে ভয় আছে;
তার মৃত্যুতে আমারও মৃত্যু,
তবু শাস্তি তার চাই-ই।

এলভির। দেবী, ছেড়ে দিন এসকল করুণ মতলব,
নিজের ওপর এমন কঠিন নিয়ম চাপাবেন না।

শিমেন। কি। পিতা আমার যখন মৃত—প্রায় আমার বাহুডোরের মধ্যে,
তাঁর প্রিয় রক্তের প্রতিশোধ ক্রন্দন তখন কি অশ্রুত থাকবে?
মোহাচ্ছন্ন মুহূর্তের প্রভাবে আমার দুর্বল হৃদয়
সেই মর্যাদার ঋণ শোধ করবে শুধু অশ্রু দিয়ে?
চতুর প্রেম বিশ্বাসঘাতকতা করবে কন্যার কর্তব্যের প্রতি,
তার কণ্ঠরোধ করবে লজ্জাকর নীরবতা?

শিমেন। দেবী, বিশ্বাস করুন, আপনার পক্ষে প্রেমিকজনের প্রতি
একটু কম উত্তাপ দেখালে দূষণীয় হবে না,
সে প্রেমিক আবার কত আপন;
আপনি রাজার কাছেই আবেদন করেছেন,
এই অদ্ভুত ও বিষাদজনক লক্ষ্যকে পেতে অতি পিড়াপিড়ি করবেন না।

শিমেন। প্রতিশোধ নেব কথা দিয়েছি; আমার উত্থানে পতন তার চাই;
প্রেম তার ছলাকলা দিয়ে আমাদের ভোলায়।
কিন্তু মহৎ জনের কাছে যে-কোনো ছুতো লজ্জাকর।

এলভির। আপনি যদি রোদ্রিগকে ভালোবাসেন,
তাহলে সে আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না।

শিমেন। তা সত্যি!

এলভির। তাহলে, মোটকথা, কী করবেন আপনি?

শিমেন। বজায় রাখব আমার মানমর্যাদা, শেষ করব আমার দুঃখ;
তার অনুসরণ করব, ধ্বংস করব,
তারপর নিজেও মরব।

চতুর্থ দৃশ্য
দন রোদ্রিগ, শিমেন, এলভির

দন রোদ্রিগ। না, দেবী পশ্চাদ্ধাবনের কষ্ট ছাড়া অন্য এক সহজ পথ বের করুন;
রাখে আপনার মানমর্যাদা নিশ্চিত আমার মৃত্যুতে।

LIS 69

শিমেন। এলভির, এ কোথায় আমরা ?
এ কী দেখছি ?
এ কি আমারই গৃহে রোদ্রিগ। আমারই চোখের সামনে।

দন রোদ্রিগ। এই আমার প্রাণ আপনি নিন ;
যদৃচ্ছা আমার মৃত্যু এবং আপনার প্রতিশোধের মধু আস্বাদ করতে পারে না।

শিমেন। সর্বনাশ !

দন রোদ্রিগ। দয়া করে শুনুন আমার কথা।

শিমেন। না, সরে যাচ্ছি আমি।

দন রোদ্রিগ। এক মুহূর্ত !

শিমেন। যান, মরতে দিন আমাকে।

দন রোদ্রিগ। মাত্র চারটি কথা বলব।
তারপরে আপনি আমার বুকে বসিয়ে দিন তরবারি।

শিমেন। কি ! আমার পিতার রক্তে রাঙা তরবারি ?

দন রোদ্রিগ। শিমেন আমার

শিমেন। আমার চোখের সামনে থেকে বদখত বস্তুটা সরিয়ে ফেলুন।
ওটা দেখলেই আপনার দোষ মনে হয়
আর প্রাণদণ্ডের দাবি জাগে।

দন রোদ্রিগ। না, ভালো করে এটা দেখ ;
তোমার রাগ ও ঘৃণা তা আরো চাগিয়ে তুলবে ;
আমার শেষ ত্বরান্বিত করবে।

শিমেন। ওতে লেগে আছে আমার নিজেরই রক্ত।

দন রোদ্রিগ। আমার রক্তে তা ডুবিয়ে দাও।
তোমার যে রক্ত ওতে
আমার রক্তে তা ধুয়েমুছে যাক।

শিবেন। হায় নিষ্ঠুর ইস্পাত,
একই দুদিনে পিতার ও কন্যার প্রাণ নিতে পারে ও।
জীবন্তে একে দেখতে পারি না!
সরিয়ে নিয়ে যান এটা।
আপনি চান যে শুনি আপনার কথা
আর তার পরে বরণাপন্ন করলেন আমাকে।

দন রোদ্রিগ। আমি তোমার আদেশ পালন করছি,
কিন্তু তবু চাইছি তোমার হাতেই এই হতভাগ্য জীবনের শেষ হোক।
তোমার প্রতি প্রেমও ন্যায়সঙ্গত কাজের জন্য
আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে না।
ক্রোধের মারাত্মক উত্তপ্ত ও দ্রুত পরিণতি
আমার পিতার শুভ্রের শিরে দিয়েছিল অপমানের ভার।
সে অবমাননার আঘাত কোন হৃদয় সহ্য করতে পারে?
সে লাঞ্ছনা আমার,
আমিই তার নায়িককে তৎক্ষণাৎ খুঁজে বের করি
আর আমার পিতার অপমানের প্রতিবিধান করি।
দরকার হলে আবারও তাই করব।
তবে অনিবার্য কর্তব্যের বিরুদ্ধে
আমার প্রেম তার আধিপত্যের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়েছে।
কতটা সে আমার হৃদয় নিয়েছে বুঝবে—
এমন ক্রোধের মধ্যেও আমি থামতে পেরেছি,
আমার বংশ, পিতা, আমার ভালোবাসা নিয়ে দ্বিধা করেছি
তোমার হৃদয়ে আঘাত হানা কিম্বা আত্মনিগ্রহের বাধাবাধকতা সত্ত্বে।
নিজেকেই হঠকারিতার দোষ দিয়েছি,
অপমান বোধের অত্যুগ্র স্পর্শকাতরতা থাকার।
তোমার সৌন্দর্য তবু ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারত,
কিন্তু সেই ভাবনায় তা হল না—
অবমানিত মানুষের তোমাকে দেবার কিছু নেই,
আর মহত্ত্ব যদি কলঙ্কে ডুবে যায়
তাতে তোমার হৃদয়ও আমার স্বার্থে কথা বলবে না।
প্রেমে প্রশ্রয় দেওয়া, তার কণ্ঠ শোনাতে
আমাকে তোমার ভালোবাসার অযোগ্য করে তুলেছে।
দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তোমাকে বার বার বলছি,
আর অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গেও বলব
নিষ্ঠুর হাতে তোমাকে আমি আঘাত দিয়েছি,

কিন্তু আর কিছুই আমার কলঙ্ক মোচন
এবং আমাকে তোমার যোগ্য করে তুলতে পারত না।
এখন মানরক্ষা এবং পিতাকে তৃপ্ত ক'রে
এসেছি তোমার কাছে—আমার শেষ ঋণ পরিশোধ করতে ;
তোমার কাছে এসেছি আমার প্রাণ দিতে।
অন্য কর্তব্য শেষে এটাই শুধু বাকি।
বলতে হবে না তোমার পিতার নিধনই তোমাকে আমার বিরুদ্ধে তুলেছে—
এই দেখ সম্মুখে তোমার বধ্য !
যে তোমার পিতার রক্ত বইয়েছে এবং সেজন্যে অনুতাপ জানে না
তার রক্তপাতে দ্বিধা ক'রো না।

শিমেন। উঃ ! রোড্রিগ, কি আশ্চর্যভাবে আমার অস্থির হৃদয়
যে নিজের পিতার মান রক্ষা করেছে তাকে সমর্থন করছে।
আমার আকুল মন যদি নিষ্ঠুর ভেবে থাকো
তবে তা তোমার দোষের জন্য নয়, হতাশায়।
সমুচ্চ ও অটল চিত্তের যে ব্যগ্রতা অপমান সয় না তাকে বেশ জানি।
তা তোমার কর্তব্যের শিক্ষা, কিন্তু হায়।
তোমার কর্তব্য পালন শিখিয়েছে আমার কর্তব্য।
তোমার কর্মের ভীষণতা ঠেলে চলে আমাকে ;
তুমি যেমন পিতৃমর্যাদা উদ্ধার করেছ
আমাকেও তেমনি পিতা বলছেন প্রতিশোধ নিতে।
কিন্তু, উঃ ! তোমার প্রতি প্রেমে আমি পাগল হয়ে যাই।
অন্যদিকে পিতার অবর্তমানতা
দিয়েছে তোমার সান্নিধ্য ও প্রেমের শান্তি
কষ্টের মধ্যে মধুর সান্ত্বনা।
দুঃখেও আমি জেনেছি তোমার সহানুভূতি,
যে-হাত আমার অশ্রু মুছে দিয়েছে তাকেও ভালোবাসতাম।
তখন তাঁকে হারিয়ে তোমাকেও হারাতে চলেছি ;
তাঁর যশ চায় আমার প্রেমের পরাজয়,
আর কর্তব্য খুনীর মুখোশ পরে তোমার ও আমার ধ্বংসে নিয়ে চলে।
তোমার বেলা যেমন তেমনি আমার হৃদয়ও
প্রেমের স্বপ্ন ছেড়ে কর্তব্যের দাস হতে হবে,
আমার শক্তি তোমার সমান হওয়া চাই।
তোমার আক্রোশে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছ।
তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে আমি প্রমাণ দেব তোমার প্রেমের যোগ্য আমি।

ডন রোড্রিগ। কর্তব্যে আর দেরী ক'রো না।
তার দাবি আমার বাধা—এই নাও তাকে
তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধের ভক্ষ্য সে।
দণ্ডাজ্ঞাকে স্বাগত জানাচ্ছি,
ডাকছি সেই আঘাতকে;
ন্যায়বিচারের মন্থর গতি তোমার গরিমা ও আমার শান্তি
বিলম্বিত করছে।
তোমার আদরের হাতে মরণ তো অভীপ্সিত নিয়তি।

সিমেন। না, তোমার ঘাতক নই
ঢেলে দেওয়া ও-জীবন নাশ আমার কাজ নয়,
আমার আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা তোমার কাজ।
আর কোনো হাত আমার ইচ্ছা পূরণ করবে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি চালাব, কিন্তু শাস্তিদান কদাপি নয়!

ডন রোড্রিগ। তুমি বললে আমার জন্য প্রেম যতই তোমাকে রাশ টেনে রাখুক
তোমার অন্তর হতে হবে আমার সমান;
তাহলে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হাতিয়ার ধার করবে?
না, সিমেন আমার, প্রতিশোধ ব্যর্থ হয় তাহলে।
আমারই হাত বধ করেছে তোমার পিতাকে;
তোমার হাতই আমাকে দিক শাস্তি।

সিমেন। কি নিষ্ঠুরতা, এমন অবস্থায় পড়া।
তুমি আমার সাহায্য নাও নি, আমারও তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই।
তোমার দৃষ্টান্ত দেখে চলি,
আমার অন্তর তার মহাকার্যে তোমার সহযোগিতা কখনো নেবেনা,
আমার পিতৃযশ আর আমি
তোমার প্রেমের কাছে কিছুমাত্র অনুগত থাকব না,
তোমার বর্তমান হতাশার কাছেও না।

ডন রোড্রিগ। মান-সম্মানের প্রশ্নে দাঁড়িয়েছ তুমিই।
তোমার হাত থেকে এই দয়া কখনো পাব না?
তোমার মৃত পিতার স্বার্থে, আমাদের প্রেমের খাতিরে,
শত্রুতায় বা অনুকম্পায় বধ করো আমাকে এখানে।
তোমার প্রেমিক তোমার আঘাতের চেয়ে
জীবন্তে তোমার ঘৃণা পেয়ে যন্ত্রণায় জ্বলবে।

শিবেন। ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে ঘৃণা করিনা আমি।

দনরোত্রিগ। করা তো উচিত।

শিবেন। তা পারি না আমি।

দন রোত্রিগ। যখন সকলে জানবে আমার কর্ম,
যখন লোকে বলবে তবু নেভেনি তোমার প্রেমের আগুন,
তখন তাদের নিন্দা ও হিংসার কটুকথাকে ভয় পাওয়া?
তাদের স্তব্ধ করে দাও।
আমাকে মশালয়ে পাঠিয়ে তোমার সুনাম বাঁচাও।

শিবেন। তোমার জীবনের জন্যই আমার যশ আলো হয়ে ছড়াবে।
নিকশ নিন্দা আমার মর্যাদাকে তুলে ধরবে আকাশে,
আমার দুঃখে দুঃখ জানাবে,
এই বুঝে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি
এবং চাই তোমার প্রাণ।
যাও, আমার বেচারা বিব্রত হৃদয়কে আর বিরক্ত করো না
যাকে ভালোবাসি এবং হারাই তা সামনে ধরে।
লুকিয়ে যাও রাত্রির অন্ধকারে,
তোমাকে কেউ দেখতে পেলে কলঙ্ক লাগবে আমার গায়ে,
নিন্দার একমাত্র ছুতো হবে
আমার ঘরে তোমাকে স্থান দিয়েছি।
দেখো যাতে আমার সুনাম রাখতে পারো,
বিদায় হও।

দন রোত্রিগ। উঃ, মরতে দাও আমাকে।

শিবেন। চলে যাও।

দন রোত্রিগ। কী করবে তুমি?

শিবেন। ক্রোধের আগুন জ্বলছে প্রেমের শিখার সঙ্গে।
পিতার মৃত্যু চায় আমার যথাসাধ্য উদ্যম;
কর্তব্য অঙ্কুশ মেরে চালাচ্ছে আমাকে,
আমার একান্ত ইচ্ছা—কিছুই না হোক।

ডন রোড্রিগ। ওগো প্রেমের যাদু!

সিমেন। ওগো দুঃখের দুর্ভার!

ডন রোড্রিগ। আমরা আমাদের পিতৃগণ দুঃখে শোধ দিচ্ছি।

সিমেন। রোড্রিগ, কে ভাবতে পেরেছিল

ডন রোড্রিগ। কিম্বা স্বপ্নেও আনতে পেরেছিল—

সিমেন। যে আনন্দ এত কাছে এসে ফসকে যাবে?

ডন রোড্রিগ। একেবারে বন্দরের কাছে পৌঁছে যাওয়া আমাদের সব আশাকে
হঠাৎ ঝড় তছনছ করে দেবে?

সিমেন। হায়, ভঙ্গুর দুঃখ!

ডন রোড্রিগ। অনুশোচনা যার কোনো মূল্য নেই।

সিমেন। দয়া করে ছেড়ে যাও আমাকে;
আর ভাবতে পারি না।

ডন রোড্রিগ। যাই, টেনে চলি মৃতকল্প জীবন,
যতদিন না তোমার হুকুমে এর শেষ হয়।

সিমেন। আমার দুর্ভাগ্য যদি কখনো সেদিন আনে
তাহলে দু'জনার প্রাণ একসঙ্গে যাবে।
বিদায়! কারো চোখ যেন তোমাকে দেখে না ফেলে।

এলভিরা। মহাশয়া, দয়ালু ঈশ্বর যা ঘটালেন আনুন না—

সিমেন। বিরক্ত করো না;
দয়া ক'রে নিজের দুঃখ নিয়ে থাকতে দাও আমাকে।
আমি তৃষার্ত রজনীর ঘনকৃষ্ণ নীরবতার জন্য,
অশ্রুর জন্য।

বারোয়ারি মাঠ

পঞ্চম দৃশ্য

ডন দিয়েগ

ডন দিয়েগ। পরিপূর্ণ সুখ আমাদের বরাতে কখনো নয়।
চরম সাফল্যেও থাকে তিক্ততার বিন্দু;
প্রত্যেক ঘটনায়, যাই হোক তার সম্ভাবনা,
শান্তির ধারার সঙ্গে লেগে থাকে দুর্গ্রহ।

নিজের নাম উদ্ধারের আনন্দেও
শঙ্কা ছেয়ে ফেলছে আমার অন্তর।
যে-কাউন্টের হাত আমাকে দেনেছিল সে এখন মৃত।
কিন্তু এবার আমি আমার উদ্ধারকর্তাকে
বৃথাই আর্ত আমি এখানে ওখানে খুঁজছি সহর ভরে :
বার্দ্ধক্যের দান অল্প শক্তি ফুরায় তারই বিফল সন্ধানে।
সর্বদা সর্বত্র শুনি তার কণ্ঠ,
তার চেহারা দেখি—যেন রাত্রির ছায়ামূর্তি।
তাকে আলিঙ্গন করতে যাই আর দেখি সে নেই :
প্রবঞ্চিত প্রেম ভয়ে সন্দেহে কাঠ।
হঠাৎ অন্তর্ধানের কোনো চিহ্নও দেখিনা,
আর কাউন্টের সেবক প্রবল দলবল
নানা বিপদের সংকেত দেয়।
রোড্রিগ জীবিত থাকলে বোধহয় এখন গুপ্তঘরে।
হায় ভগবান! নিজেকে কি বঞ্চনা করছি আবার?
কিম্বা শেষে দেখছি আমার আশা আমার পুত্রকে?
ওই তো সে! আর সন্দেহ নেই, আমার প্রার্থনা পৌঁছেছে;
ভয় আমার দূরীভূত, উদ্বিগ্ন প্রত্যাশার অবসান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দন দিয়েগ, দন রোড্রিগ

দন দিয়েগ। অবশেষে রোড্রিগ ঈশ্বর তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে।

দন রোড্রিগ। হায়!

দন দিয়েগ। আমার নব আনন্দ দীর্ঘশ্বাসে বিষিয়ো না।
আমাকে যথোচিত তোমার প্রশংসা করতে দাও;
আমার বীরত্ব তোমার মধ্যে অবীরত্বের কিছু পায় না,
বরং সেখানে অনেক মিল;
তোমার অন্তরে জাগুক তোমার বংশের মহা মহা রথী।
তাঁরা তোমার পূর্বপুরুষ, পুত্র তুমি আমার।
তোমার প্রথম অস্ত্রাঘাত আমার সমস্তের সমান;
তোমার অশিক্ষিত যৌবন আবেগপ্রবুদ্ধ হয়ে
এই এক প্রয়াসে আমার সুনাম ছুঁয়েছে।
বার্দ্ধক্যের নির্ভর এবং আমার সৌভাগ্যের চূড়া
তুমি এবার তোমার সার্থক হাতে স্পর্শ করো আমার ভরকেশ;

এস, এই গালে এঁকে দাও চুম্বন
সেখানে এখনো দেখতে পাবে লাঞ্ছনার দাগ যার জন্য সার্থক লড়েছ তুমি।

ডন রোদ্রিগ। সম্মান আপনার প্রাপ্য ও না করে আমার উপায় ছিল না,
দায়ী আমার মধ্যে আপনার রক্ত
এবং আমার অস্ত্রশিক্ষায় আপনার যত্ন।
পরম সুখী আমি যে আমার প্রথম আঘাত
আমার জন্মদাতার অযোগ্য হয় নি।
তবে আপনার তৃপ্তিতে অরাজী হবেন না
আমার অন্তরের দাবি মিটাতে।
আপনার কথা বহুকাল আমার হতাশাকে মূক রেখেছে,
এখন তা নানা দুঃখের ভাবনায় ফেটে পড়ছে।
আপনার সেবায় কম দুঃখ পাই নি;
যে দাম তার জন্য দিয়েছি তা কি আপনি আমাকে দিতে পারেন?
আপনার জন্য আমার এই বাহু তুলেছি প্রিয়ার বিরুদ্ধে,
আর সেই এক আঘাতে সব আমার ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।
আর নয়, আর নয়; আপনার কাছ থেকে জীবন পেয়েছিলাম
যা পেয়েছিলাম তা ফেরত দিয়েছি আপনার উদ্দেশ্যে সিক্ত।

ডন দিয়েগ। না, বিজয়ের সাফল্যে আনন্দ কর;
তোমাকে জীবন দিয়েছি,
জীবনে আনন্দের জন্য দায়ী তুমি।
আমাদের মতো লোকের কাছে
তোমার কাছ থেকে ফিরে পাওয়া জীবনের চেয়ে মান অনেক বেশি
তোমার সৈনিকের বক্ষ থেকে সরিয়ে দাও এই দুর্বলতা
প্রেম দুর্বলতাকে যখন খুশি ডেকে নিতে পারে;
তোমার অন্তরতমের যথার্থ প্রভু তোমার সম্মান।

ডন রোদ্রিগ। এ কী বলছেন আপনি?

ডন দিয়েগ। তোমার যা জানা উচিত।

ডন রোদ্রিগ। আমার লাঞ্ছিত সম্মান আমারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে,
আর আপনি নির্লজ্জভাবে উপদেশ দিচ্ছেন বিশ্বাসঘাতকতার—
যাকে ভালোবাসি তাকে বিশ্বাসঘাতকতা।
নীচতা একই—কাপুরুষ নাইটে হোক কিম্বা কপট প্রেমিকে।

সন্দেহের নিঃশ্বাসে আমার বিশ্বস্ততাকে আবিল করবেন না।
আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ওরকমে ভাঙা যায় না,
প্রতিশ্রুতি অমর, আশা চিরতরে লুপ্ত হলেও।
সিমেনকে আমি ছাড়তেও পারি না, পেতেও পারি না,
মৃত্যুতেই আমার শান্তি ও বেদনা।

দন দিয়েগ। মৃত্যুর সন্ধান করার সময় তোমার নয়।
তোমার দেশ ও তোমার যুবরাজ চান তোমার বাহু।
ভয়ঙ্কর বিদেশী জাহাজওলা আমাদের যত নগর
অকস্মাৎ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত।
মুরদের আক্রমণ—রাত্রির জোয়ার
তাদের তরীবাহিনী ভাসিয়ে আনবে আমাদের প্রাচীরের গায়ে।
রাজসভা শঙ্কিত জনগণ কম্পিত;
চারদিকে ভয় আর অশ্রু;
আমার সৌভাগ্য যে এই প্রয়োজনের মুহূর্তে
সশস্ত্র চারশত সহচর আমার ডাকনা শুনে প্রতিশোধে প্রস্তুত!
তাদের উৎসাহ তুমি জ্বেলেছ;
এখন তারা ন্যূর সর্দারদের রক্তে রঞ্জিত করবে হাত।
যাও, তাদের পুরোভাগে দাঁড়াও—
নাও তোমার যোগ্য স্থান।
এই বীরবৃন্দ চায় তোমাকে নেতা হিসাবে;
পুরানো শত্রুদের উপর আক্রমণে সামনে থাকো
যদি মরতেই হয় তবে তা হয় যেন সুন্দর মরণ,
নাও সুযোগ তা এসেছে যখন,
রাজার সেবায় নিজের স্বার্থ বলি দাও।
না, বরং ফিরে এস জয়ের গৌরবে,
শুধু শত্রুতায় নিজের সুনাম সংকীর্ণ না করে,
রাজ্যের দৃঢ় সংরক্ষায় তা প্রশস্ত করে।
জিতে নাও সিমেনের নীরবতা ও রাজার দাক্ষিণ্য।
তারপরেও যদি তার কুমারী হৃদয় লাভের বাসনা থাকে
তবে জেনো বিজয়ী বীরের কাছেই তা নত হবে।
বৃথা কথায় তোমার সময় নষ্ট করছি।
এস আমার সঙ্গে;
সোজা রণক্ষেত্রে—
দেখব তোমার রাজা কাউন্টকে হারিয়ে তোমাকে কী পেয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta-25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাবার চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য : ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য : ৮·০০